শ্রীশ্রীচৈতন্য কথা।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, এম-এ, বি-এল,

প্রণীত।

সন ১৩২২ সাল।

সংরক্ষিত]

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

প্রকাশক

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

বাঁকিপুর, পাটনা।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,

প্রিণ্টার—শ্রীঅধরচন্দ্র দাস।

৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উৎসর্গ

পরমারাধ্যা

৺ ব্রজাঙ্গনা দেবী

মাতাঠাকুরাণীর

স্বর্গীয়

কর-কমলে

এই গ্রন্থ

প্রদত্ত হইল

ভূমিকা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যকথার প্রথম ভাগ লিখিতে লিখিতে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখিতে আরম্ভ করিলাম। পাণ্ডিত্যের গহনকাননে দিক্ হারাইলাম। অভিমানের রাজ্যে আসিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবকে হারাইলাম। অনধিকারের চর্চ্চা করিতে গিয়া অধিকারশূন্য হইলাম। শুষ্ক জ্ঞানের মধ্যে ভক্তিকে বিসর্জ্জন দিলাম। তাই গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত করিলাম। আবার নিজস্বরে দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ করিলাম। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে প্রথম ভাগ একবারে ছাড়িয়া দিতে পারেন।

প্রথম ভাগ সমস্তই 'পন্থায়' প্রকাশিত হইয়াছিল। কেবল শেষের অধ্যায় যোগ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগ 'ব্রহ্মবিদ্যায়' প্রকাশিত হইয়াছে।

বাঁকিপুর।
৮ অগ্রহায়ণ,
১৩২২ সাল।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

সূচীপত্র।

প্রথম খণ্ড।

বিষয় — পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় খণ্ড।

চৈতন্য কথা।

—— ০:*:০ ——

প্রথম খণ্ড।

প্রস্তাবনা।

চতুর্যুগান্তে কালেন গ্রস্তান্ শ্রুতিগণান্ যথা।
তপসা ঋষয়োঽপশ্যন্ যতো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

ভা, পু, ৮-১৪-৪।

চারি যুগের অবসানে বেদ সকল বিলুপ্ত হয়। সত্যযুগের আরম্ভে আবার নূতন করিয়া বেদের পত্তন করিতে হয়। নূতন মনুষ্যজাতিকে আবার ক, খ, শিখাইতে হয়। তখন মনুষ্য নিতান্ত শিশু। এই শৈশব ভাব যাইতে যাইতে ত্রেতাযুগ আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন বেদের কিয়দংশ মনুষ্য বুঝিতে পারে। যেমন যেমন মনুষ্যজাতির বুদ্ধি বিকশিত হইতে থাকে, তেমন তেমন বেদেরও আবির্ভাব হয়। যাঁহারা তপস্যা দ্বারা, পূর্ব্বজন্মের সংস্কার দ্বারা, বিশেষ উদ্যম দ্বারা মনুষ্যজাতির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন, সেই সকল ঋষিগণ হৃদয়ের গভীর আবেগে পবিত্রতার পূতনয়নে বেদের দর্শন লাভ করেন। আমাদেরও চতুর্যুগে তাহাই হইয়াছিল। কালের প্রবাহে একে একে তিন কাণ্ড বেদ প্রকটিত হয়।

তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বেদের ভাগনির্ণয় ও সঙ্কলন করেন এবং বেদের সমগ্র অর্থ পঞ্চম বেদরূপ মহাভারতে সন্নিবেশিত করেন। এই সময়ে নারায়ণরূপী শ্রীকৃষ্ণ নররূপী অর্জ্জুনকে বেদের সমগ্র তাৎপর্য বুঝাইয়া দেন।

বেদে যাহা আরম্ভ হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষায় তাহা সম্পূর্ণ হয়। বেদের আবির্ভাব হইতে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মশিক্ষার এক মহা অভিনয়, ধর্ম্মজগতের এক মহাযুগ। আর্য্যশিশু সরলহৃদয়ে দেবতা-দিগকে ঘরের কথা সব বলিতেন। তাঁহাদের লুকাইবার কিছুই ছিল না। সেই সরল শিশুদিগকে দেবতারা হাতে হাতে করিয়া শিক্ষা দিতেন, তাহাদিগকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিতেন। শিশুগুলি যেমন যেমন বড় হইতে লাগিল, অমনি ঋষিগণ জ্ঞানের কথা বলিতে লাগিলেন। কি জানি কোথা হইতে জ্ঞানের স্রোত বিচারের বিচিত্রতা সহিত হু হু শব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের সংগঠন, কর্ত্তব্যের ত্যাগময় অনুশীলন যেমন হওয়া উচিত তাহা হইল না। স্বয়ং রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া এ বিষয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। নি... ধর্ম্ম, কর্ত্তব্যের পূর্ণ অনুষ্ঠান, ঈশ্বরজ্ঞানের বিকাশ ও ভক্তির প্রবল উ... একবারে ধর্ম্ম জগৎকে তোল পাড় করিল।

কিছুদিন লালনের কার্য্য বন্ধ থাকিল। দেবতাগণ, ঋষিগণ অবতারগণ দেখিতে লাগিলেন, বিনা সাহায্যে, বিনা প্রেরণায়, বিনা দৈববলে, বিনা ঐশ্বরিক উত্তেজনায় তাঁহাদের আদরের আর্য্যজাতি কতদূর যাইতে পারে। জ্ঞানের স্বতন্ত্রধারা বহিতে লাগিল; ভিন্ন ভিন্ন পথে, ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের পথিক চলিতে লাগিল। সকলেই দম্ভের সহিত আপন আপন পথের গুণগান করিতে লাগিলেন। সকলেই নূতন পন্থার আবিষ্কার করিতে চাহেন। যাঁহার প্রবর্ত্তিত কোন একটা নূতন পথ

নাই, তিনি মুনির মধ্যে গণ্যই নহেন। "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।" মনুষ্যের সাধ্য নয় এই ভেদের সমন্বয় করে। এক ঈশ্বরেই সকল ভেদের সমাধান হয়। যাহারা ঈশ্বর-বিমুখ তাহারা জ্ঞানগর্ব্বিত হইলেও ভেদের ঝঞ্ঝাবাতে বিক্ষিপ্ত ও অহঙ্কারের আবরণ দ্বারা তাহাদের জ্ঞান সঙ্কীর্ণ। যাহারা ঈশ্বর-প্রমুখ, তাহারা ঐশ্বরিক আলোকে জ্ঞানের সমন্বয় ও একতা দেখিতে পায়। দুই পক্ষের বিষম বিরোধ। বেদব্যাস শাস্ত্র-বিচার দ্বারা শাস্ত্র-সমন্বয় করিলেন, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সেই ব্রহ্মের জ্ঞানে সকল জ্ঞান কেন্দ্রময় করিলেন। কিন্তু যাহারা বিচার চায় না, যাহারা মিথ্যা জ্ঞানের দোহাই দিয়া দম্ভ ও প্রবলপ্রতাপে নিজ মতের আধিপত্য রাখিতে চায়, যাহারা নিজ নিজ ভুজবলে পৃথিবীর অধিকারী হইয়া আসুরিক ভাবে পৃথিবী তোল পাড় করিতে চায়, সেই সকল মানবরূপধারী অসুরগণের আধিপত্য ও উদাহরণ কিরূপে বিলুপ্ত হইবে? রাজ্যহীন, ধনহীন, বন্ধুহীন, বনবাসী পাণ্ডবগণ কাহার সাহায্যে অধর্ম্মের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবে? কিরূপে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ধর্ম্মের সংস্থাপন হইবে! তাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া কুরুক্ষেত্রের প্রবল ঝঞ্ঝার আরম্ভে অর্জ্জুনকে ধর্ম্মসমন্বয়ের শিক্ষা দিলেন এবং যাহাতে সেই ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা হয় সেজন্য যথাবিহিত দুষ্টের দমন করিলেন। অতি গোপনে, অন্যত্র ভেদময় জগতের অন্তরালে, ধর্ম্মের আর একটী মধুর চিত্র রাখিয়া দিলেন। অভিনয়ের সমাপ্তি হইল। বেদের পবিত্র সঙ্গীতে যে অভিনয় আরম্ভ হইয়াছিল, সেই অভিনয়ের রোধপট পড়িয়া গেল। দেবগণ ঋষিগণ অবতারগণ গা ঢাকা দিলেন।

এদিকে কলি আসিয়া উপস্থিত হইল। গভীর অন্ধকারে জগৎ আবৃত হইল। এমন সময়ে আর্য্য জাতিকে নিজের ব্যবস্থা নিজে করিতে হইল। মনুষ্যজাতি! দেখি তোমাদের নিজবল কতদূর। ঘোর তমসাচ্ছন্ন ধর্ম্ম-

জগতে অতীত শাস্ত্রের আলোকে কেবলমাত্র আলো-আঁধারি হইতে লাগিল। বরং আঁধার ভাল, "আলো-আঁধারি" অত্যন্ত ভয়াবহ। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নিত্য অশাস্ত্রীয় কাজ হইতে লাগিল। বেদের নামে জীবহিংসা প্রচলিত হইল। ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইল। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্রচার হইতে লাগিল। নীতির মস্তকে নিত্য পদাঘাত হইতে লাগিল।

এ ধর্ম্ম থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল। এ বেদ জানা অপেক্ষা না জানাই শ্রেয়স্কর। ফেলে দেও বেদধর্ম্ম! সরল সদাচার ও নৈতিক ধর্ম্মের অবলম্বন কর। আগে হিংসা, দ্বেষ, দম্ভ পরিত্যাগ কর। সর্ব্ব-জীবে দয়া করিতে শিখ। মিথ্যাচার কপট ধর্ম্মভাণ ছাড়িয়া দাও। এ কথা কে বলিবে? আর্য্যজাতির অগ্রণী কে আছ? কে বুদ্ধির পরা-কাষ্ঠা লাভ করিয়াছ? কে মনুষ্যত্বের সীমা ছাড়াইয়া, অবতার পদবী লাভের অধিকার পাইয়া, মনুষ্যজাতির জন্য করুণ হৃদয়ে রোদন করিতেছ? কে কপিলাবস্তুর রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া দীন-ভাবে জগতের দুঃখে ব্যথিত হৃদয় হইয়া বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে অনশনব্রতে বিচরণ করিতেছ? তুমি নইলে আজ সাহস করিয়া কে বলিতে পারে— ফেলে দেও বেদ-ধর্ম্ম। কে হুঙ্কার করিয়া বলিতে পারে—আবার সকলে নূতন করিয়া আরম্ভ কর। সর্ব্বাগ্রে নৈতিক ধর্ম্মের আশ্রয় কর, ভাল মন্দের বিচার কর। ধর্ম্মের ভাণ্ডার এখন দেখিবার প্রয়োজন নাই। অমনি স্বর্গে দুন্দুভিনাদ হইল। ধর্ম্মজগতে নূতন অভিনয়ের আরম্ভ হইল। দেবতারা ঊর্দ্ধগ্রীব হইয়া দেখিতে লাগিলেন, এ অভিনয় কত দূরে যায়।

গৌতম বুদ্ধ অন্তর্হিত হইলেন। নূতনত্ব চলিয়া গেল। কতক লোক তাঁহার মতাবলম্বী হইল। অন্যে ভাবিতে লাগিল, শাস্ত্রই বা ছাড়িব কেন? বাস্তবিক শাস্ত্র ছাড়িলে ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির থাকিল কি? শাস্ত্র

যে বুঝে না, তাহারই দোষ। যে শাস্ত্রকে অহঙ্কার দ্বারা সসীম করিতে চায়, তাহারই দোষ। শাস্ত্রের দোষ কি? এখন শাস্ত্রের দোষ হউক না হউক, ভারতের আর্য্যজাতি শাস্ত্র ছাড়িতে পারিল না। আবার যজ্ঞাদি ধর্ম্মের প্রচার হইতে লাগিল। আবার ভেদের ছায়া ধর্ম্মজগৎ আবৃত করিল। ঘন হুঙ্কার দিয়া শঙ্করাচার্য্য সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। শাস্ত্র, শাস্ত্র করিতেছ? এস শাস্ত্র দ্বারা শাস্ত্রের খণ্ডন করি। দেখ অবশিষ্ট কি থাকে। বাস্তবিক কিছুই অবশিষ্ট থাকিল না। বেদও গেল। বেদের ঈশ্বরও গেল। এক মায়ার জালে সমগ্র ভেদ আবৃত হইয়া দূরে অপসারিত হইল। হুলস্থূল পড়িয়া গেল। অভিনয় গড়াইয়া পড়িল। আর কেহই স্থির থাকিতে পারিল না। এক "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য লইয়া সকলের মাথা ঘুরিয়া গেল। জীব ও ঈশ্বর কি বাস্তবিক এক? জীব ঈশ্বরের ভেদ কি কল্পিত ভেদ? এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। তবে ধর্ম্ম থাকে কোথায়? তবে আমি, তুমি যাই কোথায়? যদি আচার্য্য মহাবাক্যের যথার্থ অর্থ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিষম ধর্ম্ম বিভ্রাট্ হয়।

এ কথার মীমাংসা করিবার জন্য এক মহাপ্রয়াস পড়িয়া গেল। মনুষ্য নিজ শক্তির উপরে নির্ভর করিয়া গভীর গবেষণা করিতে লাগিল। শঙ্করাচার্য্যের তুক্ লাগিয়া গেল।

রামানুজস্বামী সিদ্ধান্ত করিলেন,—

ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থত্রিতয়ং হরিঃ।
ঈশ্বরশ্চিতইত্যুক্তো জীবো দৃশ্যমচিৎ পুনঃ॥

'পদার্থ ত্রিবিধ। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। চিৎ জীবসংজ্ঞক। দৃশ্যজগৎ অচিৎ।' "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যে জীব ও ঈশ্বরের যে তদাত্মতা কথিত হইয়াছে, সে যেমন শরীর ও শরীরীর তদাত্মতা, সেইরূপ। "জীব পরমাত্মনোঃ শরীরাত্মভাবেন তাদাত্ম্যং ন বিরুদ্ধম্।"

মধ্বাচার্য্য সিদ্ধান্ত করিলেন, তত্ত্ব দুই প্রকার, স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র।

স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রঞ্চ দ্বিবিধং তত্ত্বমিষ্যতে।
স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণু র্নির্দোষোঽশেষসদ্‌গুণঃ॥

'তৎ' ও 'ত্বং' এক হইতে পারে না।

আহ নিত্যপরোক্ষন্তু তচ্ছব্দোহ্যবিশেষিতঃ।
ত্বং-শব্দশ্চাপরোক্ষার্থং তয়োরৈক্যং কথং ভবেৎ॥

এদিকে তন্ত্রশাস্ত্রের বিবিধ আচার প্রকটিত হইল। পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র লইয়া নানাবিধ ভেদের অবতারণ হইল। কেহ শৈব, কেহ শাক্ত, কেহ গাণপত্য, কেহ সৌর, কেহ বৈষ্ণব। পুরাতন দর্শন-শাস্ত্রের স্থানে অভিনব দর্শন-শাস্ত্রের উদ্ভব হইল। অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত মতাবলম্বীরা আপন আপন মত লইয়া তর্কজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। কূটতর্কে জগৎ ব্যাপিল। ধর্ম্মের রস শুকাইয়া গেল।

এইবার আবার ধর্ম্মসমন্বয়ের কাল উপস্থিত হইল। বুদ্ধদেব যে অভিনয়ের অবতরণ করিয়াছিলেন, আজ তাহার পরিসমাপ্তির কাল। এক অভিনয়ের শেষ পট স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ উত্তোলন করিয়াছিলেন। এই নূতন অভিনয়ের শেষ অধিনায়ক কে হইবে? কে বিরোধের বিরোধী হইবে? কে ভায়ে ভায়ে মিলাইয়া দিবে? কে হিন্দু মুসলমানকে একত্র করিবে? কে মহাভাবে জগৎ উদ্ভাবিত করিবে? কে প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিবে? কে মধুর রসে সমগ্র জীবকে মধুর করিবে? কে মধুর হইতে মধুর মানবকে ঈশ্বরের প্রিয় সহচর ও প্রিয়সহচরী করিতে প্রয়াস করিবে?

যখন শ্রীকৃষ্ণ অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন ত কলির সন্ধ্যা মাত্র। এখন যে ঘোর কলি। যাহা অসম্ভব তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে?

বুদ্ধদেব।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইতে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব পর্য্যন্ত যে প্রকাণ্ড ধর্ম্ম-অভিনয় হয়, তাহার প্রতি অঙ্ক ঘটনাপূর্ণ, প্রতি অঙ্ক পরস্পর সাপেক্ষ। প্রতি অঙ্কের নায়ক একজন অসাধারণ ধর্ম্মবীর। তবে উপক্রম ও উপ-সংহারের নায়ক দুইজন তাঁহাদের ভক্তদিগের নিকট অবতার। বুদ্ধদেবের সমকালীন লোক তাঁহাকে অবতার বলিয়া সম্বোধন করে নাই। তিনি "বুদ্ধ" বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেন; তাঁহার ভক্তগণও বুদ্ধ বলিয়াই তাঁহাকে বিশ্বাস করিত। অন্যে তাঁহাকে একজন শ্রমণমাত্র বলিয়া জানিত। কিন্তু তাঁহার মহানির্ব্বাণের পর হিন্দুমাত্রেই তাঁহাকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিত। চৈতন্যদেবকে তাঁহার ভক্তগণ অবতার বলিয়া জানিত। তিনিও ভক্তগণকে নিজের ভগবত্তার অনেক পরিচয় দিতেন। কিন্তু তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর ব্যাসদেব আর পুরাণ রচনা করেন নাই। তাই কোন পুরাণ গ্রন্থে অবতার বলিয়া তাঁহার উল্লেখ নাই।

বুদ্ধদেব মনুষ্যশক্তির অবতার। চৈতন্যদেব ভগবৎশক্তির অবতার। মনুষ্য শক্তির বিকাশ না হইলে ভগবৎশক্তির বিকাশ হইতে পারে না। বুদ্ধদেবের অনুসরণ না করিলে, চৈতন্যদেবের অনুসরণ করিতে পারা যায় না। মহাশ্রমণ গোতম বুদ্ধ! তোমায় অবহেলা করিয়া কি মহাপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছিলাম। ধিক্ আমার বৈষ্ণব অভিমান! ধিক্ আমার সনাতন ধর্ম্মজ্ঞান! নিষ্কাম কার্য্যদ্বারা চিত্তবলের নাশ, সে কেবলমাত্র বৃথা বাক্যা-লাপ। ভক্তি, উপাসনা রিপুর পোষক কি শোষক তাহা জানি না। ত্রিপুরারি মহাদেবের জ্বলন্ত ললাট কতবার ধ্যান করিয়াছি। কই, একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গও ত কামের গাত্রদাহ করে নাই। আর সখা কৃষ্ণ—তাঁর ত

কথাই নাই। সখা আমার মনটি না পাইলে কথা কন্ না। মনটি তাঁর কাছে ধরিয়া দিলে, তবে তিনি চুরি করেন। এমন চোরও দেখি নাই, এমন সাধুও দেখি নাই।

মনে মনে করিতাম, স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেই হল। মনে মনে করিতাম, আমায় 'তিনি' বুঝি এখনি টানিয়া লইবেন। এতদিনে জানিলাম, সেটা বড় ভুল। এতদিনে জানিলাম পায়ে হেঁটে যেতে হবে।

ভক্ত! ভক্তির ঢেউ দেখে ভুলে যেওনা। ভাই, অনেকে ত গা ঢেলে দিয়াছে; কিন্তু ভেবে দেখ তাহারা প্রায় যেখানে ছিল সেইখানেই আছে। স্থিরজলে গা ঢেলে লাভ কি? বড় জোর, ভাসতে থাক্‌বে। যখন স্রোতে পড়্‌বে, তখন আগিয়ে যাবে। কিন্তু কতকদূর, সাঁতরে যেতেই হবে? হাবুডুবু খেতেই হবে।

ভাব্‌লে কি হবে! "তাঁর" বৃথা অনুযোগ কর্‌লে কি হবে? নিজের কর্ম্মদোষ দিলেই বা কি হবে!

যে কিছুই কর, হাত পা নেড়ে সন্তরণে পারদর্শী হতেই হবে। তবে মনে মনে বুদ্ধদেবকে গুরু বলে স্বীকার কর। সেই দেবতা জানি না, ঈশ্বর জানি না, জানি কেবল আত্মবল, জানি কেবল যোগবল,—সেই গরবে উড্ডীয়মান ব্রহ্মাণ্ডভেদী মনুষ্যপক্ষীকে একবার স্মরণ কর। যিনি শঙ্করাচার্য্যে প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিত হইয়া, পাইথাগোরাস্‌কে গ্রীসে পাঠাইয়া, তিব্বতে ও চীনে শিষ্যপরম্পরা রাখিয়া, বৈশাখী পূর্ণিমায় নিজপ্রভাব বিস্তার করিয়া জগদ্‌গুরু হইয়া আছেন, সেই মনুষ্যগুরু, দেবগুরু, বুদ্ধ অবতারের প্রবল মহিমা ধ্যান কর। তিনি না থাকিয়াও আছেন। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের পারে গমন করিয়াও করুণার রসে ব্রহ্মাণ্ড সিক্ত করিতেছেন, যোগের বলে ঋষিদিগকে দৃঢ় করিতেছেন ও জ্ঞানের আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছেন। একবার তাঁহাকে স্মরণ করিয়া দেখ। একবার

ধর্ম্মপদ পাঠ করিয়া দেখ। সূক্তগুলির শিক্ষা একবার বিচার করিয়া দেখ। দেখিবে কাম দূরে পলায়ন করিবে। দেখিবে মনুষ্যত্বের প্রবলস্রোত হৃদয় অধিকার করিবে। হৃদয়বল, যোগবলের অঙ্কুর সহজে বুঝিতে পারিবে। আমি বুদ্ধদেবের নিকট অত্যন্ত অপরাধী। আমার স্বদেশও সেইরূপ অপরাধী। তাই একবার মন ভরিয়া বুদ্ধদেবের যশঃ কীর্ত্তন করিব। অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিব!

ভগবান্ বুদ্ধদেবের বর্ণনা করা মনুষ্যের সাধ্য নয়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যোগীর যে আদর্শ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ দেখা যায়।

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥
কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥

গীতা, পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনোবন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥

বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া ভগবান্ গোতমদেব মগধ হইতে বারাণসী গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে একজন ব্রহ্মচারী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কাহার শিষ্য? কিরূপে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন?" উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছিলেন—

"আমি নিজ হইতে নিজ দ্বারা অষ্টাঙ্গ মার্গ লাভ করিয়াছি। আর নাশ করিবার এখন কিছুই নাই; আমাকে অপবিত্র করিতে পারে এমন আর কিছুই নাই। পার্থিব অনুরাগের অবধি হইয়াছে। কামজাল আমি নাশ করিয়াছি। কোন গুরুর অপেক্ষা করি নাই। আমি নিজ হইতে এই অবস্থা লাভ করিয়াছি। আর এখন আমার রক্ষক কি অভিভাবকের প্রয়োজন নাই। আমি একক, আমার সহকারী কেহই নাই; এই এক মাত্র লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া, আমি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছি। এই একমাত্র লক্ষ্য দ্বারা আমি পরম পবিত্রতা লাভ করিয়াছি।" *

বাস্তবিক গোতম বুদ্ধের সহায়ক কেহই ছিল না। দেবতারা পর্য্যন্ত তাঁহার বল পরীক্ষার জন্য প্রতিকূল আচরণ করিয়াছিলেন। গোতম বুদ্ধও দেবতা, কি ঈশ্বর, কি শাস্ত্র, কি বেদ এ সকলের নামও লন্ নাই। কেবল চরিত্র সংগঠনের উপর লক্ষ্য রাখিয়া, কাম ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া, আত্মজ্যোতির অনুসরণ করিয়া তিনি "বোধি"রূপ অপূর্ব্ব আলোক লাভ করিয়াছিলেন। সেই আলোকের বলে দুঃখের হেতু তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন, ব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থই তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। এবং যে ধর্ম্ম নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, করুণার অবতার বুদ্ধদেব জগৎকে

---

* Beale's Texts from the Buddhist Canon (The Theosophical Publishing Society) Page 131.

সেই ধর্ম্ম শিখাইবার জন্য জগতের গুরু হইয়াছিলেন। সে ধর্ম্ম তাঁহার নিজের প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম। তাঁহার দেখিতে সময় হয় নাই, জানিতে ইচ্ছা হয় নাই, যে সে ধর্ম্মের প্রতিধ্বনি শাস্ত্রে আছে কিনা। তাই প্রচলিত শাস্ত্রীয় শব্দ তিনি ব্যবহার করেন নাই। এই জন্যই শঙ্করাচার্য্যের দেহে তাঁহাকে পুনরায় অবতরণ করিতে হইয়াছিল।

যে কালে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কালে সনাতন ধর্ম্মের ছায়ামাত্র ভারতবর্ষে ছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পার্থিবলীলা সংবরণ করিলে গভীর অন্ধকার আসিয়া ধর্ম্মজগৎ আচ্ছাদিত করিল। অত্যুজ্জ্বল প্রদীপ্ত আলোক নির্ব্বাপিত হইলে অন্ধকার যেমন অধিকতর অন্ধকারময় হয়, ভারতের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। সে চিন্তাশীলতা, সে স্বাধীনতা, সে উদারতা যেন একেবারে লোপ পাইয়াছিল। দর্শনের সঙ্কীর্ণতা, ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িকতা, চিন্তার শৃঙ্খলবদ্ধতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। বেদ বুঝিবার শক্তি থাকিল না, কিন্তু বেদের দোহাই উচ্চ হইতে উচ্চতর হইল, দর্শন কেবল গোঁড়ামীতে পরিণত হইল।

বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অনুগামী ব্রাহ্মণগণ "ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণ" শব্দে অভিহিত হইতেন এবং দর্শনের অনুগামী সন্ন্যাসীদিগকে বহুকাল হইতে শ্রমণ বলিত। বাল্মীকিকৃত রামায়ণেও শ্রমণের উল্লেখ আছে।

আর্য্যেন মম মান্ধাত্রা ব্যসনং ঘোরমীপ্সিতম্।
শ্রমণেন কৃতে পাপে যথা পাপং কৃতং ত্বয়া ॥

রামচন্দ্র বালিকে বলিয়াছিলেন "এক শ্রমণ এইরূপ পাপাচরণ করিলে আমার পূর্ব্বপুরুষ মান্ধাতা এইরূপ দণ্ড দিয়াছিলেন।" শ্রমণেরা কর্ম্মকাণ্ড মানিতেন না; তাঁহারা দর্শন মানিতেন। দর্শন মানিতে গিয়া কেহ হয় ত উপনিষদ্ মানিতেন—কেহ মানিতেন না।

প্রচলিত নিয়ম অনুসারে বুদ্ধদেবও একজন শ্রমণ হইলেন। সেকালে

ব্রাহ্মণেরা বাদশীল ছিলেন। তীর্থীয়, আজীবিক ও নির্গ্রন্থ বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে ভেদ ছিল। তাঁহারা কেহ "পদক" অর্থাৎ ছন্দোগ্রন্থে পারদর্শী ছিলেন। কেহ বৈয়াকরণ ছিলেন। নির্ঘণ্টু, ইতিহাস ইত্যাদি শাস্ত্রও তাঁহারা অধ্যয়ন করিতেন। জপের বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। ব্রাহ্মণদিগের প্রধান মন্ত্র সাবিত্রী ছিল। তিন বেদ অধ্যয়ন করিতেন বলিয়া, তাঁহাদিগকে ত্রৈবিদ্য বলিত। যে সকল ব্রাহ্মণগণ বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিতেন, তাঁহাদিগকে "জটিল" বলিত। তাঁহারা জটা রাখিতেন এবং আশ্রমে বিধিপূর্ব্বক অগ্নি স্থাপন করিতেন। নিয়মিতকালে তাঁহারা মহাসমারোহে যজ্ঞ করিতেন। গোতম বুদ্ধের অবির্ভাব কালে তাঁহাদের অত্যন্ত সমাদর ছিল। সর্ব্বপ্রধান জটিল কশ্যপ বুদ্ধদেবের শিষ্য হইয়াছিলেন।

শ্রমণদিগের মধ্যে চারি প্রকার ভেদ ছিল—মার্গজিন (মার্গজয়ী), মার্গদেশক (মার্গ-উপদেশক), মার্গজীবী এবং মার্গদূষী। বোধ হয় জৈন সম্প্রদায় মার্গজিন হইতেই উদ্ভূত। শ্রমণদিগের মধ্যে বাদানুবাদে হাতাহাতি চলিত। তাহাদিগের মধ্যে ত্রিষষ্টি প্রকার দর্শন বা "দৃষ্টি" প্রচলিত ছিল। শ্রমণের সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন—

"ন মুণ্ডকেন সমণো অব্বতো অলিকং ভণং।
ইচ্ছালোভসমাপন্নো সমণো কিং ভবিস্সতি॥"

মিথ্যাবাদী ও ব্রতহীন ব্যক্তি কেবল মস্তক মুণ্ডন দ্বারা শ্রমণ হয় না; বাসনা এবং লোভযুক্ত ব্যক্তি কিরূপে শ্রমণ হইবে?

"যো চ সমেতি পাপানি অণুং থূলানি সব্বসো।
সমিতত্তা হি পাপানং সমণোহতি নবুচ্চতি॥"

আর যিনি ক্ষুদ্র কিম্বা মহৎ সমস্ত পাপ দূরীকৃত করেন, পাপের প্রশমনহেতু তিনি শ্রমণ বলিয়া কথিত হন।—শ্রীচারুচন্দ্র বসুর "ধর্ম্মপদ"

—ধর্ম্মার্থ বাক্য ১৪৭ পৃষ্ঠা।

ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে গৌতমবুদ্ধের যে মত ছিল, তাহা জানা আবশ্যক।

ভগবান্ বুদ্ধদেব শ্রাবস্তি নগরে বাস করিতেছিলেন। কোশল হইতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর্য্য! আজ কালকার ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষা করেন কি?" বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন—"প্রাচীন ঋষিগণ সংযত ও তপস্বী ছিলেন। তাঁহারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় ত্যাগ করিয়া আপন আপন মঙ্গলচিন্তা করিতেন। ধেনু, স্বর্ণ ও শস্য তাঁহাদের সম্পত্তি ছিল না। ধ্যানই তাঁহাদের প্রধান সম্পত্তি ছিল। সেই সকল ব্রাহ্মণদিগকে ধর্ম্ম রক্ষা করিত। কেহ তাঁহাদের বিরোধী ছিল না। লোকে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রচুর অর্থ সামগ্রী দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিত।

আটচল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেন। তাঁহারা বিজ্ঞানের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন। তাঁহাদের চরিত্র অন্যের আদর্শস্বরূপ ছিল। তাঁহারা অসবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন না এবং মূল্য দ্বারা পত্নী আহরণ করিতেন না। বিবাহের পর তাঁহারা দাম্পত্যপ্রেমে কালযাপন করিতেন। প্রায় ঋতুর অবসান কাল ব্যতীত অন্য সময়ে তাঁহারা পত্নীসঙ্গম করিতেন না। তাঁহারা ধর্ম্মের প্রশংসা করিতেন। দয়া, দাক্ষিণ্য, ধৈর্য্য ও সত্য তাঁহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ছিল।

যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা স্বপ্নেও কামের অনুশীলন করিতেন না। তাঁহারা যজ্ঞের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতেন। কিন্তু যজ্ঞকালে গো-বধ করিতেন না।

আহা! যেমন আমাদের মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী; গোসমূহও আমাদের সেইরূপ বন্ধু। গো-সকল হইতে আমরা আহার, ওষধি, বল ও সুখ প্রাপ্ত হই। এইজন্য তাঁহারা গো-বধ করিতেন না।

তাঁহারা সত্য সত্যই ব্রাহ্মণপ্রকৃতি ছিলেন। দীর্ঘকায়, বলবান্, সৌন্দর্য্য-

শালী সেই ব্রাহ্মণগণ আপন আপন কার্য্যে যথেষ্ট তৎপর ছিলেন। যতদিন তাঁহারা জীবিত ছিলেন, ততদিন এই আর্য্যবংশের উন্নতি ছিল!

হায়! কালের স্রোতে তাঁহাদের পরিবর্ত্তন হইল। রাজার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া—সুশোভনা রমণী দেখিয়া তাঁহারা মোহিত হইলেন। তখন লোভপরবশ ব্রাহ্মণেরা উত্তম উত্তম ঋক্ রচনা করিয়া রাজার নিকট গমন করিলেন এবং অশ্বমেধাদি নানা যজ্ঞের ভাণ করিয়া দক্ষিণাস্বরূপ প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। সুন্দর অট্টালিকা, সুন্দর পরিচ্ছদ, সুন্দরী রমণী, প্রভুত গো, অশ্ব, রথ, পরিচারকাদি, ইহাতেও ব্রাহ্মণদিগের লোভ পরিতৃপ্ত হইল না।

তাঁহারা রাজাকে যজ্ঞে গো-বধের জন্য উত্তেজিত করিলেন, রাজাও যজ্ঞে লক্ষ লক্ষ গো-বধ করিতে লাগিলেন। গোসমূহ কাহারও অনিষ্ট করে না; তাহারা ক্ষুরদ্বারা কি শৃঙ্গদ্বারা কাহাকেও আঘাত করে না। কোমল প্রকৃতি গো-সকল আমাদিগকে দুগ্ধদান করে। সেই গো-সকলকে শৃঙ্গে ধরিয়া শাণিত অস্ত্রদ্বারা রাজা নিপাতিত করিতে লাগিলেন।

তখন দেবগণ, পিতৃগণ, ইন্দ্র, অসুর, এমন কি রাক্ষসগণও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি অবিচার!"

পূর্ব্বে তিন ব্যাধি ছিল; বাসনা, তৃষ্ণা ও ক্ষয়। গো-বধের কাল হইতে আটানব্বই ব্যাধির উৎপত্তি হইল। সনাতন কাল হইতে এই অবিচার চলিয়া আসিতেছে। নিরীহ গো-সকল নিহত হইতেছে এবং যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মে পতিত হইয়াছে।

এই জন্য বিদ্বান্ ব্যক্তি সনাতন ধর্ম্মের নিন্দা করেন। এই জন্যই তিনি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের নিন্দা করেন। ধর্ম্মের যখন হানি হইল, তখনই শূদ্র ও বৈশ্যের মধ্যে বিরোধ হইল—ক্ষত্রিয়গণ ভিন্নমত অবলম্বন করিল—পত্নী

পতিকে ঘৃণা করিতে লাগিল—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ কামসুখে রত হইল। (Sacred Books of the East, Vol X Satta-Nipata, p. 47 ব্রাহ্মণ ধর্ম্মিকাসূক্ত।)

কোশলরাজ্যে অচিরাবতী (ইরাবতী) তীরে ভগবান্ বুদ্ধদেব শিষ্য সমভিব্যাহারে বিচরণ করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণকুমার বাশিষ্ঠ ও ভরদ্বাজ তর্কমীমাংসার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা করপুটে নিবেদন করিলেন, "গোতম ! ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবার উপায় আমাদের আচার্য্যগণ ভিন্নরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন মার্গের উপদেশ করেন। সকল মার্গই কি ব্রহ্মাকে লাভ করিবার উপায় ?" বুদ্ধদেব বলিলেন, "বাশিষ্ঠ ! বেদত্রয়ে পারদর্শী হইয়া কোনও ব্রাহ্মণ কি ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন ? তাঁহাদের সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্তও কি কেহ এরূপ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন ? যে সকল ঋষিরা বেদত্রয় রচনা করিয়াছেন, বামদেব, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, আঙ্গিরস, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কশ্যপ ও ভৃগু, ইঁহারা কি কখনও বলিয়াছেন, আমরা ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি ? যদি তাঁহারাই ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎকার না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবার সহজ উপায় কিরূপে বলিতে পারেন ? অন্ধ দ্বারা কি অন্ধ নীয়মান হইতে পারে ? সূর্য্য ও চন্দ্র ব্রাহ্মণেরা প্রত্যক্ষ করেন, ও নিত্য উপাসনা করেন। তাঁহারা কি বলিতে পারেন, সূর্য্যলোকে ও চন্দ্রলোকে যাইবার সহজ পথ কি ?

বাশিষ্ঠ ! যদি কেহ বলে, এই দেশে সর্ব্বাপেক্ষা যে সুন্দরী রমণী আছে, তাহাকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি, এবং লোকে যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, সে রমণী কে, এবং উত্তরে যদি সে বলে, আমি জানি না, তাহা হইলে কি উপহাসাস্পদ হয় না ?

যদি চৌরাস্তার উপর কেহ সিঁড়ি নির্ম্মাণ করে, এবং জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে কোন্ বাটীর উপর আরোহণ করিতে হইবে তাহা জানি না, তখন কি লোকে তাহাকে বাতুল বলে না ?

এই অচিরাবতী নদী যদি আকূলপূর্ণা হয় এবং কর্ম্ম উপলক্ষ্যে কাহাকেও যদি অপর পারে যাইতে হয়, সে যদি এ পার হইতে চীৎকার করে, "হে নদীর অপরকূল ! তুমি এই পারে আইস," তাহা হইলে কি অপরকূল সেই কথা শুনিবে ? বাশিষ্ঠ ! যদি ব্রাহ্মণেরা তিনবেদ অধ্যয়ন করিয়াও সেই সকল সদ্‌গুণের আধার না হন, যাহাতে লোক সত্য সত্য ব্রাহ্মণ হয়, তাহা হইলে কি "ইন্দ্র তোমাকে আহ্বান করিতেছি—বরুণ তোমাকে আহ্বান করিতেছি—ঈশান তোমাকে আহ্বান করিতেছি—প্রজাপতি তোমাকে আহ্বান করিতেছি—ব্রহ্মা তোমাকে আহ্বান করিতেছি," এইমাত্র বলিয়া আহ্বান করিয়াই তাহারা মৃত্যুর পর ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইতে পারে ?

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, এই পাঁচ বিষয়ের বন্ধনে ব্রাহ্মণগণ বিশেষরূপে আবদ্ধ। তাঁহারা নদীর অপর পারে কিরূপে যাইবেন ? বিষয়ের সম্বন্ধে তাঁহাদের রিপু-সকল সর্ব্বদা উত্তেজিত হইতেছে। ভোগের উন্মাদে তাঁহারা এ বিষয় একবার ভাবিয়াও দেখেন না। মৃত্যুর পর এই সকল ব্রাহ্মণেরা কিরূপে ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইতে পারেন ?

বাশিষ্ঠ ! যদি এ পারে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত হইয়া তুমি শয়ন কর, তাহা হইলে কি অচিরাবতীর অপর পারে যাইতে পার ?

কাম, হিংসা, আলস্য, অহঙ্কার এবং সংশয় এই পাঁচ আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া ব্রাহ্মণেরা কিরূপে অপর পারে যাইবেন ?

ব্রহ্মার কি পত্নী আছে, ব্রহ্মার কি ধন আছে ? তাঁহার কি ক্রোধ আছে, না হিংসা আছে, না মনের অপবিত্রতা আছে ? ব্রহ্মার কি আত্মসংযম নাই ?

সপত্নীক, ধনশালী ব্রাহ্মণগণের কি ব্রহ্মার কোন অংশে তুলনা হয় ? তাঁহারা রাগ-দ্বেষে পূর্ণ হইয়া মৃত্যুর পর ব্রহ্মার সহিত কিরূপে মিলিত হইতে পারেন ?

ব্রাহ্মণেরা মনে করেন যে, তিন বেদ পড়িয়া তাঁহারা কোন পুণ্যলোকে গমন করিবেন ; কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা গভীর পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছেন। তাঁহাদের ত্রয়ী-বিদ্যা কেবল জলশূন্য মরুভূমি, মার্গহীন গহনবন, এবং নাশের আলয়মাত্র।

বাশিষ্ঠ ! আমি তথাগত, আমাকে যদি কেহ ব্রহ্মলোকের কথা জিজ্ঞাসা করে, আমি নিঃসন্দেহরূপে ঐ লোকের কথা বলিতে পারি, কোন্ পথে ব্রহ্মলোকে যাইতে হয় তাহা বলিয়া দিতে পারি। আমি ব্রহ্মাকে জানি, ব্রহ্মলোকও জানি।

তবে বাশিষ্ঠ ! অবধান কর। কালে 'তথাগত' বুদ্ধ এই ব্রহ্মাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞানালোকে পরিপূর্ণ, সুলক্ষণসম্পন্ন ও সুমহান্। ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার করতলগত। তিনি দেবগুরু ও মনুষ্যগুরু। তিনি অন্তরের আলোকদ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ করেন। অধোলোক ও ঊর্দ্ধলোক, মার ও ব্রহ্মা, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্য, এমন কি যাবতীয় জীব—তাঁহার জানিতে কিছুই বাকি থাকে না। তিনি নিজে সত্য উপলব্ধি করিয়া জগতে প্রচার করেন। ধর্ম্মের পূর্ণতা ও পবিত্রতা তিনি বিস্তার করেন।

এই সত্য অবগত হইয়া গৃহপতি গৃহত্যাগ করে। সেই শীল ও সদ্গুণের অনুশীলন করে।"

Rhys David's Buddhist Suttas (Sacred Books of the East, Volume XI.) Tevigga Sutta, page 167 et seq.

অনুবাদে Brahma আছে। মূল পালিগ্রন্থে "ব্রহ্মা" কি "ব্রহ্ম" আছে বলিতে পারি না। অনুসন্ধান করিয়া পালিগ্রন্থ পাই নাই। রিস্ ডেভিড্

সাহেব অনুমান করেন, বাশিষ্ঠ ও ভরদ্বাজ ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব "ব্রহ্মার" কথা বলিয়াছিলেন। অনুমানটি মনে হয় সত্য।

"It is not easy to say what opinion is really imputed to the young Brahmanas before their conversion. It is probably meant that they were seeking a way by which their self should become identified after death, with Brahman; a way by which they could escape from the immortality of transmigration, from existence altogether as separate individuals. And in holding out a hope of union with Brahma as a result of the practice of universal love, the Buddha is most probably intended to mean a union with Brahma in the Buddhist sense—that is to say a temporary companionship as a separate being with the Buddhist Brahma, to be enjoyed by a new Individual not consciously identical with its predecessor." Rhys David's Introduction to Tevigga Sutta.

রিস্ ডেভিড্ সাহেবের মতে বৌদ্ধ "ব্রহ্মা" ও হিন্দু "ব্রহ্মা" স্বতন্ত্র। কিন্তু এ অনুমান তাঁহার অলীক।

যে সময়ে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন সে সময়ে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞের এত আদর করিতেন যে, বোধ হয় উপনিষদের জ্ঞান তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। দু'চারিখানি উপনিষদ্ প্রচলিত থাকিলেও 'ঔপনিষদ-ব্রহ্ম' কেবল সুদূর স্মৃতিমাত্র ছিল। লোভী ব্রাহ্মণের নিকট উপনিষদ্ অপেক্ষা ত্রয়ীবিদ্যার সমাদর অধিক ছিল।

"এবং ত্রয়ী ধর্ম্মমনুপ্রপন্নাঃ গতাগতং কামকামা লভন্তে।"

শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ সকাম হৃদয়ে স্থান পায় নাই।

তবে ঔপনিষদ-ব্রহ্মের কথা ব্রাহ্মণকুমারেরা যে একেবারে জানিতেন না, ইহা সম্ভবপর নয়। তাঁহারা ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্যমার্গের উল্লেখ করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার অধ্বর্য্যুর কথা। সকল মার্গই তাঁহাদের এক খেঁচুরি হইয়া পড়িয়াছিল। কর্ম্মকাণ্ডে তাঁহারা বড় জোর ব্রহ্মারই অন্বেষণ করিতে পারিতেন এবং জ্ঞানকাণ্ডদ্বারাই কেবল ব্রহ্ম পাইতেন। তাঁহাদের "ব্রহ্ম" ও "ব্রহ্মা" বড় বিভিন্ন ছিল না। তাঁহাদের "ব্রহ্মলোক-গমন" ও "ব্রহ্মত্বলাভ" হয় ত একই ছিল।

গোতমবুদ্ধ সাধনাবলে—পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বলে, দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। দিব্যদৃষ্টিদ্বারা যাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার ধর্ম্ম। যে সত্য তিনি প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাহা তিনি ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করেন নাই। তাঁহার নিজ প্রত্যক্ষের উপর গভীর বিশ্বাস ছিল। সেই জন্য হৃদয়ের আবেগে তিনি সেই ধর্ম্মের উপর সকলের বিশ্বাস উৎপাদন করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এই জন্য ব্রহ্মার কথাই বলিয়াছিলেন।

সম্বোধি লাভ করিয়া, বুদ্ধদেব এক সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত নিরঞ্জরা (ফল্গু) তটে, বোধিবৃক্ষমূলে মুক্তির আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। সপ্তাহের পর তনি প্রথম প্রহর রাত্রিতে কার্য্যকারণশৃঙ্খলার উপর অনুলোম ও প্রতিলোম চমে মনঃসংযোগ করিলেন। সম্বোধির আলোকে তাঁহার নিম্নলিখিত গান প্রত্যক্ষ হইল।

"অবিদ্যা হইতে সংস্কারের উদ্ভব হয়। সংস্কার হইতে জ্ঞানের উদ্ভব হয়। গান হইতে নামরূপের, এবং নামরূপ হইতে ছয় ইন্দ্রিয়ের ছয় বিষয় উদ্ভূত য়। ছয় ইন্দ্রিয়-বিষয় হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে অনুভব, অনুভব হইতে ষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে রাগ, রাগ হইতে সত্তা, সত্তা হইতে জন্ম, জন্ম হইতে জরা ও মৃত্যু, শোক, রোদন, ক্লেশ, খেদ ও হতাশা। আমাদের সমগ্র দুঃখই

এইরূপে উদ্ভূত হয়। অবিদ্যার বিনাশ দ্বারা সংস্কার নষ্ট হয়, সংস্কারের নাশ দ্বারা নামরূপের নাশ হয়, নামরূপের নাশদ্বারা ছয় ইন্দ্রিয়-বিষয়ের নাশ হয়। এইরূপ পর পর নাশদ্বারা জন্ম ও আনুসঙ্গিক দুঃখের নাশ হয়।"

ক্লেশ না জানা, ক্লেশের কারণ না জানা, ক্লেশের নিবৃত্তি না জানা এবং ক্লেশনিবৃত্তির মার্গ না জানা, ইহাকেই বৌদ্ধমতে অবিদ্যা বলে। সাধারণতঃ বৌদ্ধগ্রন্থে তিন প্রকার সংস্কারের কথা দেখা যায়—কায়সংস্কার, বাক্যসংস্কার ও চিত্তসংস্কার। নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা কায়সংস্কার হয়। বিতর্ক ও বিচার দ্বারা বাক্যসংস্কার হয়। সংজ্ঞা, বেদনা ও বিতর্ক বিচার দ্বারা চিত্তসংস্কার হয়। বিভঙ্গে ছয় প্রকার সংস্কারের কথা আছে পুণ্যাভিসংস্কার, অপুণ্যাভি-সংস্কার, অনন্দাভিসংস্কার, কায়সংস্কার, বাক্যসংস্কার ও চিত্তসংস্কার। পরবর্ত্তী কোন কোন গ্রন্থে ৫৫ সংস্কারের উল্লেখ আছে।

এই কার্য্যকারণশৃঙ্খলা এবং কারণ নাশদ্বারা কার্য্যনাশ বৌদ্ধধর্ম্মের মূলভিত্তি। বুদ্ধদেবের সম্বোধি (Intuitional cosmic consciousness) এই ধর্ম্মের একমাত্র প্রমাণ।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই ভগবান্ পতঞ্জলি অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশের নিরূপণ করিয়াছিলেন। উপনিষদে বিদ্যা, অবিদ্যা, জ্ঞান ও অজ্ঞান লইয়া কত পবিত্র বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল। ভগবান্ ব্যাসদেব সেই ঔপনিষদ-জ্ঞানকে কত পূর্ব্বেই না সূত্রবদ্ধ করিয়াছিলেন।

কিন্তু বুদ্ধদেব স্বাধীনভাবে মানুষিক শক্তির বিকাশদ্বারা নিজ সম্বোধি-বলে এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেবগণ আপন আপন সম্বোধি-দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানপরম্পরা ও জ্ঞানসমষ্টি এক সাধারণ সম্পত্তি হইয়া বেদমার্গে আর্য্য শিশুর নিকট উপনীত হইয়াছিল। অবতারগণ করুণাবশে অবতীর্ণ হইয়া সেই জ্ঞান

আরও পরিস্ফুট করিয়াছিলেন। বুদ্ধিবৃত্তির সংকীর্ণ ও বিচিত্র আধারে সেই জ্ঞান নানারূপে দর্শনে পরিণত হইয়াছিল। দর্শনের অহং-সংকীর্ণ কালিমায় জ্ঞানরবি রাহুগ্রস্ত হইল। কি জানি রাজগৃহের পর্ব্বত-গুহায়, বুদ্ধদেব অলার ও উদ্রকের নিকট কি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন? তাঁহার গুরুগণ বেদমূলক ধর্ম্মের শিক্ষা দিলেও, বোধ হয় দেবগণ গৌতম বুদ্ধের কর্ণ বধির করিয়াছিলেন। মনুষ্যত্বের উচ্চতম শিখরে আরূঢ়, সর্ব্বত্যাগী, মারজয়ী গৌতম কেবল আপনার মানুষিক শক্তিবলে কিরূপে জ্ঞান ও মুক্তিলাভ করিতে পারেন, এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেবতাদের ইচ্ছা। তাঁহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইল বটে। কিন্তু এই অলৌকিক অভিনয়ের মিশ্র ফল উৎপন্ন হইল। মনুষ্য আপনার শক্তি জানিল। কিন্তু অপক্ক ক্ষেত্রে সেই শক্তি আত্মঘাতী হইল। এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মবিপ্লব হইল। সেই বিপ্লবের ঢেউ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব কাল পর্য্যন্ত কখনও প্রবল, কখনও দুর্ব্বল। অবশেষে মহাপ্রভু সেই ঢেউ প্রশমিত করিলেন।

অতি যত্নে গৌতমদেব কার্য্যকারণমূলক জ্ঞানলাভ করিলেন। গভীর চিন্তাবলে সেই প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান আয়ত্ত করিলেন। কিন্তু এই জ্ঞান লইয়া তিনি জীবের কি করিবেন? জীবের দুঃখ দেখিয়াই তাঁহার সন্ন্যাস। জীবদুঃখ নিবারণের জন্যই তাঁহার এ দীর্ঘব্যাপী উদ্যম।

অজপাল বৃক্ষতলে সমাসীন হইয়া বুদ্ধদেব ভাবিতে লাগিলেন—"এই সত্যের অভ্যন্তরে আমি প্রবেশ করিয়াছি বটে। কিন্তু এই সত্য অত্যন্ত গম্ভীর। সহজে এ সত্য অনুভব করা যায় না। তর্কের দ্বারা এই মহৎ সত্য লাভ করা যায় না। এই দুর্গম সত্য কেবল পণ্ডিতেই বুঝিতে পারিবেন। লোকসমূহ বাসনা-পূর্ণ। কামনার পিপাসায় লালায়িত। অর্থ ও কাম লইয়াই তাহাদের সকল ব্যবহার। কিরূপে তাহারা এই দুরূহ কারণবাদ ও কার্য্যকারণ-ক্রম বুঝিতে পারিবে? রিপুর একবারে দমন করিতে হইবে।

হৃদয়ে শান্তি আনিতে হইবে। সকল উপাধিরই নাশ করিতে হইবে। সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না। এমন কি সমগ্র নাশ করিয়া একেবারে নির্ব্বাণ লাভ করিতে হইবে। আপামর সাধারণে এ কথা কেমনে বুঝিবে? এ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কোন লাভ নাই।"—(বিনয় পিটকের অন্তর্গত মহাবাক্যের প্রথম খণ্ড।)

দুঃখের মূল অবিদ্যা নাশ করিতে হইলে, সকল বাসনারই নাশ করিতে হয়। সে নাশে নামরূপ থাকিবে না, ইন্দ্রিয় বিষয় থাকিবে না, তৃষ্ণা রাগ থাকিবে না, স্বর্গ থাকিবে না, ভোগ থাকিবে না, কাম থাকিবে না; এমন কি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত কিছুই থাকিবে না। বাসনামাত্রের নাশ হইলে দুঃখই বা কোথায়, জন্মই বা কোথায়? কিন্তু ইহা ত কথার কথা। বাসনার ঐকান্তিক নিবৃত্তি হইলে মানুষ আর মানুষ থাকিল কোথায়? দেবতা ত তখন তাহার কাছে তুচ্ছ পদার্থ। এ ধর্ম্মের আদর্শ, এ ধর্ম্মের আশ্রয় একমাত্র গৌতম বুদ্ধ ত্রিলোকী আলোকিত করিয়া, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অমিত আভায় প্রজ্জ্বলিত থাকিবেন। কিন্তু ময়ূরের পুচ্ছ লইয়া কাকরূপী জীবমণ্ডলীর কি হইবে? বুদ্ধদেব নিজে এই কথা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু স্বয়ম্পতি ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন—"বুদ্ধদেব! ধর্ম্মের প্রচার কর। এমন লোক আছে, যাহার মানসিক দৃষ্টি ধূলিধূসরিত নহে। তাহাদের মুক্তি কিরূপে হইবে? মগধদেশে যে ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহা অসাধু ও অপবিত্রতাময়। অমৃতের দ্বার উদ্ঘাটিত কর। মগধবাসীদিগকে আপন ধর্ম্ম শুনাও। সত্যের উচ্চতম আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া দুঃখময় ভ্রান্ত মানবগণের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। তুমি মুক্ত হইয়াছ। তাহারা এখনও মুক্ত হয় নাই। বীরবর! গাত্রোত্থান কর। তুমি আজ মহাজয়ী ধর্ম্মপিপাসু পথিকদিগের অগ্রণী হইয়া পৃথিবীমধ্যে বিচরণ কর। ধর্ম্মের প্রচার কর। অবশ্য তোমার উপদেশের অধিকারী জীব তুমি দেখিতে পাইবে।"

করুণহৃদয় বুদ্ধদেবের করুণা উথলিয়া উঠিল। ব্রহ্মার উক্তি তাঁহার মর্ম্ম স্পর্শ করিল। নূতন লব্ধ অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা তিনি জীবমণ্ডলীকে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। দেখিলেন অধিকারী জীব অনেক আছে।

আর কি তিনি স্থির থাকিতে পারেন? কারুণিক বুদ্ধ করুণার স্রোতে —করুণার অকূল পাথারে ভাসিয়া পড়িলেন। আর তখন দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকিল না। আর তখন অধিকারীর নিয়ম থাকিল না। কেবল কিছুদিন পর্য্যন্ত নারী জাতিই এই ধর্ম্মের বহির্ভূত ছিল। নন্দের প্রার্থনায়, প্রজাবতী দেবীর রোদনে, বুদ্ধের সে প্রতিজ্ঞাও ভগ্ন হইল। অধিকারী ও অনধিকারী সকলেই এই ধর্ম্ম লাভ করিল।

গৌতম! তুমি প্রথমে কেবল তোমার গুরু অলার ও উদ্রককে অধিকারী বলিয়া স্মরণ করিয়াছিলে। যখন জানিতে পারিলে তাহারা মৃত, তখন তোমার পূর্ব্ব শিষ্য ও পূর্ব্ব সহচর পাঁচজন ভিক্ষুকে মাত্র অধিকারী বলিয়া স্মরণ করিয়াছিলে। পরে অধিকারের কথা তুমি একবারে ভুলিয়া গেলে কিরূপে? দেবতারাই সকল অনর্থ ঘটান। তোমার কোন দোষ নাই।

বুদ্ধদেব হেতুবাদ সকলকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন।

যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা হেতুংস্তেষাং তথাগতঃ।
হ্যবদীত্তেষাঞ্চ নিরোধমেবংবাদী মহাশ্রমণঃ॥

সকল হেতুর নিরোধ বাসনার সম্পূর্ণ ত্যাগ। দেহ হইতেই বাসনার উৎপত্তি। দেহ নশ্বর, ঘৃণিত রস ও ধাতুপূর্ণ এবং কতকগুলি অপবিত্র পদার্থের সংহতি (বিজয়সূত্র। Sacred Books of the East, Vol X. Page 32, Sutta Nipata).

দেবতা ও মনুষ্য, পৃথিবী আদি সকল লোক, হেতুর বশীভূত হইয়া সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এইক্ষণে যাহা আছে অপর ক্ষণে তাহা নাই। যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, কতকগুলি কার্য্যের সংহতি মাত্র বা "স্কন্ধ"।

স্কন্ধ পাঁচ প্রকার—রূপ (Material properties or attributes), বেদনা (Sensations), সংজ্ঞা (Abstract Ideas), সংস্কার (Tendencies or potentialities) এবং বিজ্ঞান (Thought, Reason)। সকল মনুষ্যই স্কন্ধের সমষ্টিমাত্র। নিদান-অনুযায়ী স্কন্ধের উৎপত্তি হয়। নিদান-নাশে স্কন্ধের নাশ হয়।

নিদান, কারণ বা কর্ম্ম-অনুযায়ী কখনও একরূপ দেহ, একরূপ জন্ম হয়, কখনও অন্যরূপ দেহ, অন্যরূপ জন্ম হয়। কারণ অনুসারেই কার্য্য, কার্য্য অনুসারেই জন্মান্তর-পরিগ্রহ।

ক্ষণে ক্ষণে কারণ অনুসারে কার্য্যের পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং সকল সত্তাই ক্ষণস্থায়ী। এই মত সুগত বুদ্ধের মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ অতি সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা "ক্ষণিক বিজ্ঞান বাদে" পরিণত করিয়াছেন।

মাধ্যমিক মতপ্রবর্ত্তক নাগার্জ্জুনকে গ্রীক রাজা মিনাণ্ডর (মিলিন্দ) যখন জিজ্ঞাসা করেন, "মহাত্মার নাম কি?" নাগার্জ্জুন (নাগসেন) উত্তর করিলেন, "পিতা, মাতা, ব্রাহ্মণগণ এবং অন্য সকলে আমাকে নাগসেন নামে অভিহিত করেন, কিন্তু বস্তুতঃ নাগসেন বলিয়া কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি নাই।"

রাজা উত্তর করিলেন, "তবে নাগসেন আমার সম্মুখে নাই। নাগসেন কেবল শব্দমাত্র। ইহার কোন অর্থ নাই।" নাগার্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন, "রাজন্, আপনি পদব্রজে আসিয়াছেন, কি রথে আসিয়াছেন?" রাজা উত্তর করিলেন, "আমি রথে আসিয়াছি।" নাগার্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, "রথ কাহাকে বলে?" এই বলিয়া রথের প্রত্যেক অঙ্গকে নির্দ্দেশ করিলেন। রাজা বলিলেন এই অঙ্গগুলি রথ নয়। নাগার্জ্জুন বলিলেন, "তবে রথ নাই।" (মিলিন্দ প্রশ্নাঃ)।

স্কন্ধের সংহতিমাত্র জীবের সত্তা, এ কথা বুদ্ধদেব বলেন নাই। তিনি

আত্মার কথা উল্লেখ করেন নাই। তিনি শেষ তত্ত্বের শিক্ষা দেন নাই। জগতের আদি কারণ লইয়া তাঁহার কোন তাৎপর্য্য ছিল না। মনুষ্য কি, জগৎ কি, এ কথার মীমাংসা করিবার জন্য তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার একমাত্র মীমাংসার বিষয় জীবের দুঃখ কিরূপে ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক ভাবে নিবৃত্ত হয়। কপিলমুনিও কেবলমাত্র এই মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহারও ঈশ্বর কি জানিবার প্রয়োজন হয় নাই। নর্ত্তনশীল, নিয়ত-পরিণামী প্রকৃতির মূলে কপিলমুনিও বসিয়াছিলেন, বুদ্ধদেবও বসিয়াছিলেন। কপিলমুনি প্রকৃতির মূলে কুঠারাঘাত না করিয়া, পুরুষকে লইয়া পলাইয়া আসিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব প্রকৃতির মূলে বাসনা-নাশরূপ কুঠারদ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী প্রকৃতির মূলে যখন তিনি কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মাণ্ডের অপর পারের খবর তিনি জানিতেন কিনা সন্দেহ। সম্বোধিলাভ করিয়া তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সকল কথা জানিতেন কিম্বা জানিতে পারিতেন বটে, কিন্তু পরনির্ব্বাণ লাভ না করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের অপর পারের কথা তিনি কিরূপে জানিবেন? ঈশ্বর ব্যতীত ঈশ্বরের কথা কে জানিতে পারে? অংশ অবতার ব্যাসদেব "ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" প্রসঙ্গে, ঈশ্বরের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ঈশ্বরবাদ পূর্ণরূপে ব্যাখ্যান করিয়াছেন।

বুদ্ধদেবের এ বিষয়ে কোন দোষ নাই। প্রকৃতপক্ষে মূলতত্ত্ব (Metaphysics) তাঁহার শিক্ষার বিষয় ছিল না। অবান্তরতত্ত্ব (Psychology and physics) লইয়া তিনি কর্ত্তব্য ধর্ম্মের (Practical Religion) শিক্ষা দিয়াছিলেন। "When Malunka asked the Buddha whether the existence of the world is eternal or not eternal, he made no reply ; but the reason of this was, that it was considered by the teacher as an enquiry that tended to no profit."

বুদ্ধদেবের স্কন্ধগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে গুলি বেদান্তের পঞ্চকোষের অন্তর্গত। "আত্মা" স্কন্ধের অন্তর্গত নয়। তাঁহার শিক্ষা অনুসারে, আত্মার কথা বলিতে তাঁহার প্রয়োজন হয় নাই।

আত্মা ও ঈশ্বর জ্ঞানের অভাব, কেবল প্রকৃতির কারণানুযায়ী পরিণাম জ্ঞানে প্রকৃতিজয়ের দুরূহতা, শাস্ত্রজ্ঞানের ভিত্তিত্যাগ এইগুলি বৌদ্ধধর্ম্মের দুর্ব্বলতা। বুদ্ধদেবের ব্যক্তিগত প্রবলতাও এ দুর্ব্বলতা নষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই। বুদ্ধদেব চারি মহাসত্য নির্ণয় করিয়াছিলেন—(আর্য্যসত্য)।

১। সংসারের সকল পদার্থ ও সকল ভাবই "ক্লেশ।" ২। এই ক্লেশের মূল বিষয়তৃষ্ণা। ৩। এই তৃষ্ণা বা বাসনার নাশদ্বারাই ক্লেশের নিবৃত্তি হয়। ৪। এই তৃষ্ণানাশের একমাত্র উপায় সৎমার্গ অবলম্বন। এই মার্গ বুদ্ধদেব কথিত "অষ্টাঙ্গ মার্গ।"

মার্গানামষ্টাঙ্গিকঃ শ্রেষ্ঠো মতানাং চতুরোপদাঃ।
বিরাগঃ শ্রেষ্ঠো ধর্ম্মাণাং দ্বিপদানাঞ্চক্ষুষ্মান্॥

'মার্গ-সকলের মধ্যে অষ্টাঙ্গমার্গ শ্রেষ্ঠ। সত্যের মধ্যে আর্য্যসত্যবাচক চারিটি বাক্য শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মের মধ্যে বৈরাগ্য শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য-সকলের মধ্যে চক্ষুষ্মান্ শ্রেষ্ঠ।'

এষ বো মার্গো নান্যো দর্শনস্য বিশুদ্ধয়ে।
এতং হি প্রতিপশ্যধ্বং সারস্যৈষ প্রযোজকঃ॥

এই অষ্টাঙ্গ-মার্গই তোমাদের মার্গ। জ্ঞানের বিশুদ্ধির নিমিত্ত অন্য পথ নাই। তোমরা ইহাকেই অবলম্বন কর। ইহা সারের প্রয়োজনকারী। —(ধর্ম্মপদ, মার্গবাক্য, (চারুচন্দ্র বসু,) ১৫২ পৃষ্ঠা)

অষ্টাঙ্গ-মার্গের নিম্নলিখিত আটটি অঙ্গ :—

১। সৎ মতি (Right Views)

২। সৎ উদ্দেশ্য (Right aims)

৩। সৎ বাক্য (Right words)

৪। সৎ আচরণ (Right behaviour)

৫। সৎ জীবনবার্ত্তা (Right word of livelihood)

৬। সৎ উদ্যম (Right exertion)

৭। সৎ মনোনিবেশ (Right mindfulness)

৮। সৎ ধ্যান ও শান্তি (Right meditation and tranquility)

এই অষ্টাঙ্গমার্গ অবলম্বন করিলে ভিক্ষু ক্রমে ক্রমে চারি অবস্থায় উপনীত হয়। প্রথম অবস্থা—দীক্ষা বা স্রোতাপত্তি। সৎসঙ্গ, ধর্ম্মশ্রবণ, সৎচিন্তা এবং ধর্ম্ম-আচরণ দ্বারা প্রথম অবস্থা লাভ হয়। এই অবস্থায় তিনটি ভ্রম দূর হয়।

১। নিজের সত্তা সম্বন্ধে ভ্রম। অর্থাৎ এই অবস্থায় ভিক্ষু আপনাকে স্কন্ধের সমষ্টি বলিয়া জানিতে পারে এবং ইহাও জানিতে পারে যে, স্কন্ধ ক্ষণে ক্ষণে পরিণামশীল।

২। বুদ্ধদেব এবং তাঁহার মত সম্বন্ধে সন্দেহ।

৩। যজ্ঞ হোম করিলেই মুক্তিলাভ হইবে, এই ভ্রান্ত-বিশ্বাস।

স্রোতে প্রবেশরূপ এই প্রথম অবস্থার ফল স্বয়ং বুদ্ধদেব বর্ণনা করিয়াছেন—

পৃথিব্যা একরাজ্যেন স্বর্গস্য গমনেন বা।
সর্ব্বলোকাধিপত্যেন স্রোতাপত্তিফলং বরম্‌॥

পৃথিবীর ঐকরাজ্য, স্বর্গগমন বা সর্ব্বলোকাধিপত্য অপেক্ষা "স্রোতাপত্তি"র ফল শ্রেষ্ঠ।—(চারুচন্দ্র বসুর ধর্ম্মপদ, ১০০ পৃষ্ঠা)

এই অবস্থায় উপনীত হইলে ভিক্ষু হয় ত সাত জন্মের পর নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিতে পারেন।

দ্বিতীয় অবস্থা।

সকৃদাগমী—এই অবস্থায় ভিক্ষুর সন্দেহ ও ভ্রম থাকে না। তিনি সংযতচিত্তে কাম, দ্বেষ ও বিকল্পের পরাভব করেন। এই অবস্থাপন্ন যতি আর একবার (সকৃৎ) মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বেদান্তশাস্ত্রে ইহাকে "এক ভব" বাদ বলে।

তৃতীয় অবস্থা।

অনাগমী—এই অবস্থায় কামের আত্যন্তিক নাশ হয় এবং দ্বেষভাবও সমূলে বিনষ্ট হয়। হৃদয়ে তখন আর কাম ও দ্বেষের উদয় হয় না। আর পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। কিন্তু নির্ব্বাণলাভের পূর্ব্বে ব্রহ্ম-লোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

চতুর্থ অবস্থা।

অর্হৎ—এই অবস্থায় পার্থিব কি অপার্থিব জন্মের বাসনা থাকে না; অভিমান, অহংজ্ঞান ও অবিদ্যা, ইহার কিছুই থাকে না। কেবলমাত্র পরের জন্য, জগতের জন্য অর্হৎ জীবন ধারণ করেন।

"As a mother, even at the risk of her own life, protects her son, her only son; so let him cultivate good will without measure towards the whole world, above, below, around, unstinted, unmixed with any feeling of differing or opposing interests. Let a man remain steadfastly in this state of mind all the while he is awake, whether he be standing, walking, sitting, or lying down. This state of heart is the best in the world.—Metta sutta. From children's text J. R. A. S., 1869, describing the state of the Arhats.

অর্হৎ সকল সংযোজন ছেদন করিয়া নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করেন। বেদান্তশাস্ত্র-মতে অর্হৎ জীবন্মুক্ত।

অর্হতের কর্ম্মবীজ নষ্ট হয়। কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মানুযায়ী দেহ ধারণ করিয়া থাকিতে হয়। অর্হতের নির্ব্বাণ সোপাধিকের নির্ব্বাণ। ইহার পর পরনির্ব্বাণ, যাহাকে নিরুপাধি শেষ নির্ব্বাণ বলে।

সচরাচর "পরনির্ব্বাণ" শব্দের অর্থে "নির্ব্বাণ" শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সেটি ভুল।

"Thus of the Dhamma-pada, Professor Max Muller, who was the first to point out the fact, says: If we look in the Dhamma-pada, at every passage where Nirvana is mentioned, there is not one which would require that its meaning should be annihilation; while most, if not all, would become perfectly unintelligible if we assigned to the word Nirvana that signification. * *

The samething may be said of such other parts of the Pitakas as are accessible to us in published texts, ...It follows, I think, that to the mind of the composer of the Buddhavansa, Nirvana meant not the extinction, the negation of being, but the extinction, the absence, of the three fires of passion (lust, hatred and delusion). From those passages it would seem that the word was used in its original sense only, as late as the time of Buddhagosha; after that time we occasionally (but very seldom, and only when the context makes the modification clear) find Nirvana used where we should expect "anupadisesa nibbana" or "parinibbana."—Rhys Davids.

পরনির্ব্বাণ শব্দেও জীবের ঐকান্তিক নাশ অভিপ্রেত নহে। পর-নির্ব্বাণ লাভ করিলে জীবের ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আর জন্ম হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বুদ্ধদেব জীবের স্বরূপ নির্ণয় করেন নাই।

ভগবান্ বুদ্ধদেব কপিলাবস্তু নগরে ন্যগ্রোধারামে শাক্যদিগের মধ্যে সেকালে অবস্থিতি করিতেছিলেন। গোতমী মহা-প্রজাবতী ধীরে ধীরে উপনীত হইয়া, এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন এবং দণ্ডবৎ প্রণামানন্তর সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন,—"ভগবন্, স্ত্রীলোকে কি গৃহত্যাগ করিয়া তথাগত প্রবর্ত্তিত ভিক্ষুর আশ্রম অবলম্বন করিতে পারিবে না?" গর্জ্জন করিয়া বুদ্ধদেব বলিলেন, "যথেষ্ট হইয়াছে! গোতমী, আপনি এরূপ আজ্ঞা করিবেন না।" দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বার, মহা-প্রজাবতী অনুনয় করিলেন। বুদ্ধদেব স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

কপিলাবস্তু ত্যাগ করিয়া বুদ্ধদেব বেসালী নগরীতে উপনীত হইলেন এবং মহাবনে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

গোতমকুলরমণী মহা-প্রজাবতী, মাথার চুল কাটিয়া ফেলিলেন। এবং গৈরিক বসন পরিধান করিয়া, কতকগুলি শাক্য রমণী সমভিব্যাহারে বেসালী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথাকালে তিনি বেসালী নগরীতে মহাবনে উপনীত হইলেন। কণ্টকবিদ্ধ, ধূলিধূসরিত চরণে রোদন করিতে করিতে তিনি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। আনন্দ তাঁহাকে এই ভাবে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা বলিলেন, "এরূপে আপনি এখানে কেন?" "আনন্দ! ভগবান্ রমণীকে তাঁহার প্রবর্ত্তিত গৃহত্যাগী ভিক্ষুর ব্রত হইতে বঞ্চিত করিতেছেন, তাই আমি ভিক্ষুকের ন্যায় এখানে দণ্ডায়মান!" আনন্দ আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি সেই মুহূর্ত্তে ভগবান্ বুদ্ধদেবের নিকট গমন করিলেন, এবং কাতরস্বরে বলিলেন, "ভগবন্, কৃপা কর। গোতমী মহা-প্রজাবতী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। তাঁহার পথশ্রান্ত, ধূলিময়

চরণ। তাঁহার নয়নে বারি ধারা পতিত হইতেছে। আপনি রমণী জাতিকে ভিক্ষু ধর্ম্মের অধিকারী করুন।" গর্জ্জন করিয়া বুদ্ধদেব বলিলেন, "আনন্দ এরূপ কথা বলিও না।" দ্বিতীয় বার, আনন্দ অনুনয় করিলেন। সেই এক উত্তর। তখন আনন্দ নিজের মনে যুক্তি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, যদি স্ত্রীলোকে গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, যদি তাহারা ভিক্ষুর ব্রত অবলম্বন করিয়া আপনার উপদিষ্ট মত এবং শাসনের অনুসরণ করে, তাহা হইলে কি তাহারা দীক্ষার ফল লাভে অসমর্থ হইবে? তাহারা কি ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় মার্গ এবং অবশেষে অর্হতের সিদ্ধ অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবে না?" বুদ্ধদেব বলিলেন, "অবশ্য তাহারা এই যোগমার্গের পথিক হইতে সমর্থ।" "তবে ভগবন্, আপনি গোতমী মহা-প্রজাবতীকে কেন বঞ্চিত করিবেন? তিনি আপনার পিতৃব্য পত্নী। আপনার মাতা পরলোক গমন করিলে, তিনিই আপনাকে স্তন্য-দানে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। আজ সেই আপনার পরমোপকারিণী মহা-প্রজাবতীর কথায়, রমণী জাতিকে অধিকার প্রদান করুন।" বুদ্ধদেব সম্মতি প্রদান করিলেন। মহা-প্রজাবতী দীক্ষিতা হইলেন।

গোতম বুদ্ধের স্বর পরিবর্ত্তিত হইল। অতি গম্ভীর ভাবে তিনি বলিতে লাগিলেন, "আনন্দ, যদি রমণী জাতি দীক্ষার অধিকার না পাইত, তাহা হইলে এই পবিত্র বৌদ্ধধর্ম্ম সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিত। এখন কেবল মাত্র পাঁচশত বৎসর এই ধর্ম্মজগতে আপনার অধিকার বিস্তার করিবে। আনন্দ, যদি কোন গৃহে স্ত্রীলোকের আধিক্য হয়, তাহা হইলে সহজে সে গৃহে দস্যুর উৎপাত হয়।" Sacred Books of the East, Vol XX, pages 320-326.

যীশুখ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণ করিবার ৪৪৭ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব শরীর ত্যাগ করিয়াছিলেন। যীশুখ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করিলেই তিনি ধর্ম্ম-প্রচারকের অধিকার

প্রত্যাহৃত করিয়া, পরনির্ব্বাণ লাভানন্তর অবতারের উচ্চপদবীতে আরোহণ করিলেন। তাঁহার পবিত্র কিরণ মাত্র এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে তাঁহার নিদর্শন থাকিয়া গেল।

পাঁচশত বৎসর তথাগত-প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মের যথার্থ জীবন। পাঁচশত বৎসরের পর নাগার্জ্জুন এই ধর্ম্মের নেতা। পাঁচশত বৎসর ব্যাপী মহাতেজস্বী ধর্ম্ম মধ্যেই বুদ্ধদেবের মাহাত্ম্য অনুসরণ করিতে হইবে।

এই কাল পরিচ্ছেদ কেন? ধর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য কি? এ ধর্ম্মে আছে কি ও নাই কি? বৌদ্ধধর্ম্মে আছে আত্মবল, নাই ঈশ্বর সহকারিতা। আছে বাসনা ত্যাগ, ব্রহ্মাণ্ড নাশ, আছে নির্ব্বাণ, নাই নির্ব্বাণের অবশেষ। আছে প্রকৃতির উপর কটাক্ষ, নাই পুরুষের কেবলতা। আছে মায়াত্যাগ, নাই স্বরূপাবস্থিতি। আছে পরিণাম জ্ঞান, নাই অপরিণামী।

ফল,—বাসনা ত্যাগ দ্বারা, ধর্ম্ম আচরণ দ্বারা ঐশ্বর্য্য লাভ ও ঊর্দ্ধলোকে গমন। কিন্তু ঊর্দ্ধাদপি ঊর্দ্ধলোক, ক্রমে ব্রহ্মলোক গমন করিয়া, ব্রহ্মলোকের বাসনা ত্যাগ দ্বারা ব্রহ্মলোক হইতে মুক্ত হইলে ভবিষ্যৎ শূন্যময়।

ফল, যোগমার্গের পুনরুদ্ধার, যোগের বিভূতি লাভ, পরে যোগদ্বারা নির্ব্বাণ মুক্তি।

কিন্তু নিরীশ্বর, ব্রহ্মজ্ঞান রহিত, প্রকৃতির ক্ষণিক বিজ্ঞান দ্বারা শূন্য-চিন্তক, ব্যক্তির বাসনা-নাশ কোথায়? কিসের জন্য বাসনা নাশ? শূন্য-দর্শীর প্রয়োজনই বা কি, অপ্রয়োজনই বা কি?

বাসনার মূলে কুঠারাঘাত করিলে, মনুষ্যের চরমলাভ হয় বটে, কিন্তু সে কি শূন্যলাভ? বুদ্ধদেব যদিও শূন্য বলেন নাই, তথাপি তিনি কিছুই বলেন নাই। তাঁহার ধর্ম্মে Metaphysics নাই, Absolute Reality নাই, Thing-in-itself নাই। বাসনা ত্যাগ তবে কিসের জন্য? কেবল মাত্র দুঃখ নাশের জন্য; আনন্দ প্রাপ্তির জন্য নহে। দুঃখময় জীবন বরং

ভাল, নাশের চিত্র চিরভয়ঙ্কর। নির্ব্বাণের পর বুদ্ধদেব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিলেন। তিনি পরম আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু এ কথা ত শিক্ষা দিয়া আসেন নাই। সুতরাং চিত্তের আবেগে তিনি শঙ্করাচার্য্যে প্রচ্ছন্নরূপী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য।

বুদ্ধদেব শাস্ত্রের ভিত্তি ত্যাগ করিয়াছিলেন। যে ভিত্তি অবলম্বন করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ক্রমবিকাশ দ্বারা উচ্চতম সিংহাসন অধিকার করিয়া আছে, বুদ্ধদেব সেই ভিত্তিকে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। যদি বেদের কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা আর্য্যশিশু শৃঙ্খলাবদ্ধ না হইতেন,—যদি বিধি নিষেধ দ্বারা তিনি মার্জ্জিত না হইতেন,—যদি দেব উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরজ্ঞান সুলভ না হইত,—যদি সুখ দুঃখের চিন্তায় আর্য্য-হৃদয় পুনঃ পুনঃ উথলিয়া না উঠিত,—যদি পূর্ব্ব পক্ষ ও অপর পক্ষ দ্বারা বিভিন্ন দর্শন না হইত,—তাহা হইলে ধর্ম্মের পূর্ণত্ব থাকিত না, সর্ব্বাঙ্গীনতা থাকিত না, চিরবিকাশ থাকিত না, চিরজীবন থাকিত না। শাস্ত্রের অর্থ অনন্তযুক্তি, অনন্তভাব, অনন্তজ্ঞান এবং অবশেষে এই অনন্তযুক্তি, ভাব ও জ্ঞানের সমন্বয়। শাস্ত্রের ভিত্তি ত্যাগ করিলে "অনবস্থা" দোষ ঘটে। বুদ্ধদেব স্বয়ং যাহা প্রত্যক্ষ করিতেন, তাহার উপদেশ দিলেন; তাহার পর বুদ্ধদেব চক্ষু মুদিত করিলেন। তখন প্রথম বিবাদ এই হইল যে, নন্দের কথা প্রামাণিক কি না; এমন কি নন্দ ধর্ম্মাপরাধী কি না। অতি কষ্টে নন্দ ও উপল যাহা সঙ্কলন করিলেন, তাহাই বৌদ্ধশাস্ত্র বলিয়া গৃহীত হইল। তাহার পর মহাযান ও হীনযান। তাহার পর সৌগত দর্শন। বুদ্ধদেব শাস্ত্রের ভিত্তি অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন। কিন্তু সেই ভিত্তি অমান্য করিলে ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। শঙ্করাচার্য্য শাস্ত্রের ভিত্তি অবলম্বন করিলেন। বেদের চরম উপনিষৎ। উপনিষদের সমন্বয় উত্তর মীমাংসা। উপনিষদের সার গীতা। বেদান্তশাস্ত্রের এই তিন মহা-

প্রস্থানকেই শঙ্করাচার্য্য ভিত্তি করিলেন। তিনি প্রস্থানত্রয়েরই ভাষ্য করিলেন।

অপূর্ব্ব প্রতিভায় জগৎ আলোকিত হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাষ্যকারগণ হার মানিলেন। সূর্য্যের আলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকসকল লুক্কায়িত হইল। এক আলোকে জগৎ পূর্ণ হইল। ক্রমে মূল লইয়া টানা-টানি পড়িল। মূলের অর্থ ভাষ্যে আচ্ছাদিত হইল। "ব্রহ্ম" "শূন্যের" স্থান অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু সে "ব্রহ্ম"—ঔপনিষদ ব্রহ্ম কি শাঙ্কর ব্রহ্ম? বাদরায়ণের "ব্রহ্ম" ও ভাষ্যকারের "ব্রহ্ম" এক কি না? শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত তাৎপর্য্য "সমুচ্চয় বাদ", কি "ক্রমবাদ"? শাস্ত্রকে শঙ্করাচার্য্য শাঙ্কর শাস্ত্র করিয়া লইলেন। শাস্ত্র থাকিল। কিন্তু সনাতন ধর্ম্ম শাস্ত্রের এক অঙ্গ লুপ্ত হইল। বাদরায়ণের সময় হইতে শঙ্করাচার্য্যের সময় পর্য্যন্ত বেদান্ত-শাস্ত্রের প্রচলিত টীকাগুলি একরূপ লুপ্ত হইল। রামানুজ স্বামীর বিশেষ যত্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধার হইল বটে; কিন্তু ধর্ম্মের ধারাবাহিক সূত্রে, ধর্ম্মের মণিরত্নমালায় কতকগুলি মণির উচ্ছেদ হইল। শাঙ্কর "ব্রহ্ম"সৌগত "শূন্যের" স্থান অধিকার করিলেন। বাসনা নাশদ্বারা জীবের নাশ না হইয়া ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি হইল। আর আভাস বিশ্বে মিলিত হইল।

শূন্যের রূপান্তর হইল বটে; কিন্তু "ব্রহ্ম" ও "শূন্যে" ভেদ অতি অল্প থাকিল। ব্রহ্মে জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় নাই; ক্রিয়া, কর্ত্তা, কর্ম্ম নাই। জগদাধার "শূন্য" ও জগদাধার "ব্রহ্ম"—কেবল কথার ফের মাত্র। শাঙ্কর ব্রহ্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মের Metaphysical necessity। সেই সমগ্র বাসনাত্যাগ, সেই সংসারের অলীকতা, সেই "নিজগৃহাত্তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্", সেই সকলই বাসনাময়, সকলই ক্ষণমাত্র স্থায়ী, ক্ষণিক বিজ্ঞানাবলম্বী, সকলই দুঃখ-মূলক—সেই সৌগত জ্ঞান শাঙ্কর জ্ঞানে রূপান্তরিত হইল

মাত্র। শঙ্কর কেবল মাত্র ক্ষণিক বিজ্ঞানকে মায়ার কল্পনাতে পরিণত করিলেন। ক্ষণিক অবস্থানও মায়া-কল্পিত। একেবারে পরিষ্কার করিয়া জীব ও ঈশ্বর দুই মায়া-কল্পিত। বুদ্ধদেবের শিক্ষায় ঈশ্বর ছিলেন না, সে এক প্রকার ভাল ছিল। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের কাছে ঈশ্বর হাবুডুবু খেলিতে লাগিলেন।

থাকিল কেবল এক ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মে মায়ার লহরী খেলিতে লাগিল। মায়া ব্রহ্মের শক্তি মাত্র। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন। মায়াবাদ, আভাসবাদ, বিবর্ত্তবাদ—এই বাদে ধর্ম্মজগৎ পরিপূর্ণ হইল। সূক্ষ্ম তর্ক-জালে, ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বাঁধা পড়িলেন। এই ধাঁধা ঘুচিতে অনেক দিন লাগিল। প্রতিবাদের সাহস সহজে কুলাইয়া উঠিল না। অবশেষে আচার্য্য রামানুজ অসীম সাহসের উপর নির্ভর করিয়া, পূর্ব্ব আচার্য্যদিগের নাম লইয়া, সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সেই কাল হইতে এই কাল পর্য্যন্ত, অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ লইয়া প্রবল বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। কে বলিতে পারে ইহার মীমাংসা কখনও হইবে কি না?

শাঙ্কর-ভাষ্য।

শঙ্করাচার্য্য অলৌকিক প্রতিভাবলে অতি অল্পকালে সমগ্র শাস্ত্র-সাগর মন্থন করিলেন। গৌতম বুদ্ধ শাস্ত্রের যষ্টি ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সেই যষ্টি দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন। সুতরাং শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, কেহ তাঁহার বাক্য অবহেলা করিতে পারিলেন না। তিনি শাস্ত্রের বিচিত্রতায় মুগ্ধ হইলেন না; পাক্ষিক (partial) দৃষ্টিতে শাস্ত্রের অংশ মধ্যে অবরুদ্ধ হইলেন না; পারম্পর্য্য, প্রণালী ও সম্প্রদায়ের জাল তাঁহাকে বাঁধিতে পারিল না। তিনি শাস্ত্রের সারভাগ পর্য্যালোচনা করিলেন; ঐশ্বরিক বাক্য উপনিষৎ মধ্যে সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। দেখিলেন, এখনও ঔপনিষদ ব্রহ্ম এবং সেই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকৃত সূত্র এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান আছে। দেখিলেন, স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেবও ঐ জ্বলন্ত আলোককে জীব ও অণ্ডের উপাধিদ্বারা উপহিত করিয়াছেন। দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসদেব জ্ঞানের শিক্ষা দিয়াছেন; তথাচ তাঁহাদের উপদিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানে ধর্ম্মের অপেক্ষা আছে। উপদেষ্টা আছে, শিষ্য আছে, অর্জ্জুন আছে, নর আছে, তবে জ্ঞান উপদিষ্ট হয়। কেন অপেক্ষা কিসের? গৌতম বুদ্ধ কাহারও অপেক্ষা করেন নাই। শঙ্করাচার্য্য শাস্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন বলিয়া, কি শাস্ত্রের অপেক্ষা করিবেন। মহানির্ব্বাণনিষ্ঠ বাসনা-ত্যাগী শঙ্কর যদি শাস্ত্র মধ্যে নিরপেক্ষ সত্য দেখিতে না পাইতেন, তাহা হইলে শাস্ত্র ত্যাগ করিতে তাঁহার মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব হইত না। তাহা হইলে তিনি ব্যাসদেবের দোহাই মানিতেন না, শ্রীকৃষ্ণের দোহাই মানিতেন না; হয়ত ঈশ্বরের দোহাই মানিতেন না।

দেখিলেন উপনিষদের মধ্যে সত্য আছে। ভাষ্যকারগণ সে সত্যের অনেক অপলাপ করিয়াছেন। তিনি নিজের ভাষ্যদ্বারা সেই সত্যের উদ্ধার করিলেন। মহাসত্যব্যঞ্জক উপনিষৎ বাছিয়া লইলেন। "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের গভীর নির্ঘোষে ধর্ম্মজগৎ পরিপূর্ণ করিলেন।

উপনিষদের ভাষ্য সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না। মহাপ্রভু চৈতন্য-দেবও কিছু বলেন নাই। নির্ব্বিশেষ জ্ঞান বলার অপেক্ষা রাখে না, অনুভবের অপেক্ষা রাখে না। সে জ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ; সে জ্ঞান সিদ্ধ করিতে হয় না। যখন কিছু থাকে না, তখন সেই জ্ঞান থাকে। যতদিন বাসনা থাকে, ততদিন বাসনা-কল্পিত পদার্থ থাকে। যখন মন থাকে না, তখন মনুষ্যত্ব থাকে না। যখন বিশেষ থাকে না, তখন নির্ব্বিশেষ জ্ঞান থাকে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। যদি জ্ঞানমূলক অস্তিত্ব হয়, যদি অজ্ঞান শূন্যের ভিত্তিতে ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার না হয়, তাহা হইলে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের অস্তিত্ব ও সম্ভবপরতা সম্বন্ধে বিরোধ করা কেবল ধৃষ্টতা মাত্র। যাঁহারা শঙ্করাচার্য্যের সহিত এই সম্বন্ধে বিরোধ করিতে গিয়াছেন, তাঁহারাই পরাস্ত হইয়াছেন। যদি নির্ব্বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে, তবে সেই জ্ঞানের পথিকও হইতে পারে।

কিন্তু সে জ্ঞান ও সে জ্ঞানের পথিকের সহিত জগতের সম্বন্ধ নাই, জীবের সম্বন্ধ নাই, ঈশ্বরেরও সম্বন্ধ নাই। ঈশ্বর জীব লইয়া, ঈশ্বর জগৎ লইয়া। যে জ্ঞানে জীব নাই, যে জ্ঞানে জগৎ নাই, সে জ্ঞানে ঈশ্বরও নাই। সে জ্ঞানের শিক্ষায় জীবের প্রয়োজন নাই। যেখানে জীবের প্রতি ধর্ম্মশিক্ষা আছে, সেখানে সে জ্ঞানের আভাস নাই।

উপনিষদে জ্ঞানের প্রকাশ আছে। ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত হইয়াছে। ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সীমা অতিক্রম করিয়া ঋষির হৃদয়-গবাক্ষ জ্ঞানালোকের জন্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। সংসার ভুলিয়া, সেই হৃদয় আলোকমাত্র

গ্রহণ করিতেছে। সেই আলোক কখনও নির্ব্বিশেষ, কখনও সবিশেষ; কখনও আলোক উদ্ভাসিত সৃষ্টি, কখনও কেবল মাত্র আলোক। নির্ব্বিশেষ আলোকে জ্ঞান, সবিশেষ আলোকে উপাসনা।

এই আলোক অনুসরণ করিয়া, বাদরায়ণ ব্যাস মুক্তি-পিপাসু জীবের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিলেন। এবং দেখাইয়া দিলেন যে, এই জ্ঞানের পথ অনুসরণ করিলে "অনাবৃত্তি" হয়। সে "অনাবৃত্তি" ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত জীবের পুনরাবৃত্তির অভাব। এ আলোকে বিশেষ আছে, ঈশ্বর আছে।

শঙ্করাচার্য্য দেখিলেন, গোলযোগ। যেমন পূর্ব্বমীমাংসা কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদের সামঞ্জস্য, সেইরূপ জ্ঞানকাণ্ডাত্মক উপনিষদের সামঞ্জস্য উত্তর মীমাংসা। কিন্তু ব্যাসের সূত্রে সবিশেষ জ্ঞানের ছড়াছড়ি। তাই তিনি উপনিষদের দোহাই দিয়া শারীরক সূত্রের ভাষ্য করিলেন। পরম্পরাগত বোধায়নের ভাষ্য লুপ্তপ্রায় হইল।

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান দর্শনশাস্ত্রের অঙ্গীভূত হইল, মুক্তি-পিপাসু জীবের অধিকারের স্থল হইল। জীব অদ্বৈত-জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া, "ব্রহ্মাস্মি" বলিতে শিখিল। কর্ম্মের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া গেল, উপাসনার ভিত্তি অন্তর্হিত হইল।

যেন রাস্তা হারাইল, যেন জীব মার্গভ্রষ্ট হইল।

"ব্রহ্মাস্মি" ত মুখে বলিলে চলে না। "ব্রহ্মাস্মি" বলিলেও লোকে ব্রহ্ম হয় না। অদ্বৈত-জ্ঞানীর একুল ওকুল দুকুল গেল। ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত হইল।

শাঙ্কর-ভাষ্যের বিরুদ্ধে কথা কয়, এমন কাহারও সাহস হয় না।

সকলেই জানিল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানই শারীরক সূত্রের তাৎপর্য্য। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বিস্তারের জন্য, বেদের বিভাগের জন্য বেদব্যাসের অবতার। তাঁহার মীমাংসা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান। শঙ্করাচার্য্য সেই মতের

সমর্থন করিলেন। অদ্বৈতবাদে সকলের শ্রদ্ধা জন্মিল। কর্ম্ম ও উপাসনা সকলের নিকট লঘু হইতে লাগিল। ধর্ম্মের বিশৃঙ্খলতা হইল।

ক্রমে ধর্ম্মজগতে রামানুজাচার্য্যের আবির্ভাব হইল।

তিনি বোধায়ন-ভাষ্য ও শাঙ্কর-ভাষ্য এ দুয়ের প্রশস্ততরতা স্বাধীন ভাবে বিচার করিলেন। এবং অন্তর্য্যামীর প্রেরণায় বোধায়ন-ভাষ্য অভ্রান্ত বলিয়া স্থির করিলেন।

বোধায়ন-ভাষ্য অনুসরণ করিয়া রামানুজাচার্য্য ভাষ্য করিলেন।

"ভগবদ্বোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্ব্বাচার্য্যাঃ সংচিক্ষিপুস্তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে।"

এখন এক নূতন প্রশ্ন উত্থিত হইল। ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য কি? শাঙ্কর-ভাষ্যের অর্থ নির্দ্ধারণ সত্য, কি শ্রীভাষ্যের অর্থ নির্দ্ধারণ সত্য? চৈতন্য দেব ইহার মীমাংসা করিয়াছিলেন। সে মীমাংসা আমরা ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিব।

শাঙ্কর-ভাষ্য ও রামানুজ-ভাষ্য।

"প্রভু কহে বেদান্তসূত্র ঈশ্বর-বচন।
ব্যাস রূপে কহিয়াছেন শ্রীনারায়ণ॥
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণা পাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে, নাহি দোষ এই সব।
উপনিষদ্ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্য বৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব॥
গৌণ-বৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য।
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সব কার্য্য॥
তাঁহার নাহিক দোষ ঈশ্বরাজ্ঞা পাঞা।
গৌণার্থ করিল মুখ্য-অর্থ আচ্ছাদিয়া॥"

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মতে শঙ্করাচার্য্য ব্যাসসূত্রের মুখ্য-অর্থ প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার ভাষ্যে যে অর্থ প্রকাশিত আছে, তাহা গৌণার্থ। ঈশ্বরের আজ্ঞা পাইয়া, শঙ্করাচার্য্য এইরূপে গৌণ-অর্থ করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শঙ্করাচার্য্যের প্রধান উদ্দেশ্য ভগবান্ গৌতম-বুদ্ধ-কথিত ধর্ম্মের অভাব পূরণ এবং বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্য-দিগের মত খণ্ডন। বুদ্ধদেব শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া যাহা করিতে পারেন নাই, শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শঙ্করাচার্য্য তাহাই করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণমুক্তি ব্রহ্মাণ্ডের পারে। তিনি স্বয়ম্পতি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকেই ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বলিয়াছেন। তাঁহার মুক্তি সেই ব্রহ্মাকে উপেক্ষা করিত।

শঙ্করাচার্য্যের মুক্তিও ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরের অপেক্ষা রাখে না।

বুদ্ধদেব শূন্যনির্ব্বাণোদ্দেশী। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মনির্ব্বাণোদ্দেশী।

এই জন্য শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম।

শূন্যের স্থানে নির্গুণ ব্রহ্মকে স্থাপন করিয়া, মহোৎসাহে শঙ্করাচার্য্য শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সেই ব্যাখ্যা দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের স্বতন্ত্রতা নষ্ট হইয়া গেল এবং বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতভূমি হইতে তিরোহিত হইল। আর এক কথা। বুদ্ধদেব-প্রবর্ত্তিত প্রবল যোগাভ্যাসদ্বারা সিদ্ধি-সকল শ্রমণের করায়ত্ত হইয়াছিল। কিন্তু তদনুরূপ নিঃস্বার্থ উদারভাবের উৎকর্ষ সাধন না হওয়ায়, এই সকল সিদ্ধি অপাত্রে ন্যস্ত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব নিজে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার জ্ঞাতি ও শিষ্য সিদ্ধির কুহকে অজাতশত্রুকে বশীভূত করিয়া কিরূপে তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিয়াছিল। বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ প্রবর্ত্তনদ্বারা শঙ্করাচার্য্য তাঁহার শিষ্যদিগকে সিদ্ধির প্রলোভন হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বরের স্থান ছিল না এবং বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য ঈশ্বরের অবতার গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় নাই।

ইহাই মহাপ্রভু কথিত ঈশ্বরাজ্ঞা। তবে শারীরক সূত্রের মুখ্যার্থ কি? বোধায়ন ঋষি-প্রবর্ত্তিত প্রাচীন বৃত্তিই মুখ্যার্থ হওয়া সম্ভব। শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী সময় হইতে শিষ্য পরম্পরায় যে নিরপেক্ষ অর্থ প্রচলিত ছিল, রামানুজাচার্য্য তাহার পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। নিরপেক্ষভাবে থিব (Thibaut) সাহেব প্রতি সূত্র প্রতি অধিকরণের শাঙ্করভাষ্য ও রামানুজ-ভাষ্য তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়াছেন এবং সেই বিচারদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য ব্যাসসূত্রের মুখ্যার্থ নহে; রামানুজের ভাষ্য মুখ্যার্থ হইতে পারে। যে সংস্কারের বশীভূত হইয়া লোকে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকে সাম্প্রদায়িক বলে, সেই সংস্কারের বশীভূত হইয়া এখনও শঙ্করাচার্য্যের অন্ধ অনুধাবকগণ থিব সাহেবকে অবাচ্যবাদ বলিয়া থাকেন।

"The question as to what the Sutras really teach is a critical, not a philosophical one. This distinction seems to have been imperfectly realised by several of those critics, writing in India, who have examined the views expressed in my Introduction of the translation of Sankara's commentary. A writer should not be taxed with 'philosophic incompetency', 'hopeless theistic bias due to early training', and the like, simply because he, on the basis of a purely critical investigation, considers himself entitled to maintain that a certain ancient document sets forth one philosophical view rather than another,.................. Among the remarks of critics on my treatment of this problem I have found little of solid value. The main arguments which I have set forth, not so much in favour of the adequacy of Ramanuja's interpretation, as against the validity of Sankaracharya's understanding of the Sutras, appear to me not to have been touched."—Thibaut's Introduction to Vedanta Sutras with Ramanuja's Commentary.

থিব সাহেবের প্রাঞ্জল বিচার অনুসরণ করিয়া আমরা দুই ভাষ্যের মোটামুটি পার্থক্য দেখাইব। এই পার্থক্য থিব সাহেব সংক্ষেপে নিম্নলিখিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"The chief points in which the two systems sketched above agree on the one hand and diverge on the other may be shortly stated as follows. Both systems teach advaita, *i. e.* non-duality or monism. There exist not several fundamentally distinct principles, such as the "prakriti" and the "purushas"

of the Sankhyas, but there exists only one all embracing Being. While, however, the advaita taught by Sankara is a rigorous, absolute one, Ramanuja's doctrine has to be characterised as Visishta-advaita, *i. e.* qualified non-duality, non-duality with a difference. According to Sankara, whatever is, is Brahman, and Brahman itsels is absolutely homogeneous, so that all difference and plurality must be illusory. According to Ramanuja also, whatever is, is Brahman ; but Brahman is not of a homogeneous nature, but contains within itself elements of plurality owing to which it truly manifests itself in a diversified world. The world with its variety of material forms of existence and individual souls is not unreal Maya, but a real part of Brahman's nature, the body investing the universal self. The Brahman of Sankara is in itself impersonal, a homogeneous mass of objectless thought, transcending all attributes ; a personal God it becomes only through its association with the unreal principle of Maya, so that—strictly speaking—Sankara's personal God, his Iswara, is himself something unreal.

Ramanuja's Brahman, on the other hand, is essentially a personal God, the all-powerful and all-wise ruler of a real world permeated and animated by his spirit. There is thus no room for the distinction between a "param nirgunam" and an "aparam sagunam" Brahma, between Brahman and Iswara. Sankara's individual soul is Brahman in so far as limited by the unreal upadhis due to Maya. The individual soul of Ramanuja, ou the other hand, is

really individual, it has indeed sprung from Brahman and is never outside Brahman, but nevertheless it enjoys separate personal existence and will remain a personality for ever.—The release from "samsara" means, according to Sankara the absolute merging of the individual soul in Brahman, due to the dismissal of the erroneous notion that the soul is distinct from Brahman ; according to Ramanuja it only means the soul's passing from the troubles of earthly life into a kind of heaven or paradise, where it will remain for ever in undisturbed personal bliss.—As Ramanuja does not distinguish a higher and lower Brahman, the distinction of a higher and lower knowledge is likewise not valid for him ; the teaching of the Upanishads is not twofold but essentially one, and leads the enlightened devotee to one result only."

শঙ্কর ও রামানুজ উভয়ের মতেই এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। ব্রহ্মের অস্তিত্বেই সকলের অস্তিত্ব। শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্ম নির্গুণ। সদসৎ অনির্ব্বচনীয়া মায়া-শক্তিদ্বারা, ব্রহ্মে গুণের ভাণ হয়। জীব ও ঈশ্বর এ দুয়েরই বাস্তব সত্তা নাই। মায়ার উপাধিদ্বারা ব্রহ্মে জীব ও ঈশ্বর কল্পিত হয়। জ্ঞানালোকে মায়ার উপাধি তিরোহিত হইলে, জীবও থাকে না, ঈশ্বরও থাকে না। রজ্জুতে সর্পের বিবর্ত্ত রজ্জুজ্ঞান হইলেই নষ্ট হয়। জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র উপায়। জ্ঞান ব্যতিরেকে অজ্ঞানের নাশ হয় না। কর্ম্ম ও উপাসনা কেবল অধম ও মধ্যম অধিকারীর জন্য। জ্ঞানের অধিকার হইলে কর্ম্ম ও উপাসনার প্রয়োজন থাকে না। মুক্তি হইলে জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্মে কোন ভেদ থাকে না। উপনিষদে দুই প্রকার বিদ্যার উল্লেখ আছে, পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা। পরা-বিদ্যাদ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মকে জানা

যায়। অপরা-বিদ্যাদ্বারা মায়া-উপহিত সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে জানা যায়। যত দিন পরা-বিদ্যার অধিকার না জন্মায়, ততদিন মাত্র জীব অপরা-বিদ্যার আশ্রয় করে।

রামানুজের মতে নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্মে ভেদ নাই। এক ব্রহ্মের পরিণামেই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। জীব ও জগৎ মায়া-কল্পিত অলীক পদার্থ নহে। যাহা কিছু আছে ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা ভগবানের অংশ বা শরীর। অন্তর্যামী রূপে ভগবান্ সকলেরই অভ্যন্তরে আছেন। জীব ও ব্রহ্মের ভেদ মায়াকল্পিত নহে; বাস্তব ভেদ। মুক্ত হইলে জীব ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হয় না; কিন্তু সালোক্যাদি লাভ করিয়া অনন্ত কালের জন্য বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভব করে। উপনিষদে পরা-বিদ্যা ও অপরা-বিদ্যা বলিয়া কোন ভেদ নাই। চিৎ ও অচিৎ ঈশ্বরের প্রকার এবং অনাদি কাল হইতে এই দুই প্রকার আছে ও থাকিবে। প্রলয় কালে অচিৎ অব্যক্ত ভাবে থাকে, চিৎ সঙ্কোচ অবস্থায় থাকে; ব্রহ্ম কারণাবস্থায় থাকে। সৃষ্টির কালে অচিৎ ব্যক্ত হয়, চিতের বিকাশ হয় ও ব্রহ্ম কার্য্যাবস্থায় পরিণত হয়। এই দুই পক্ষ অবলম্বন করিয়া শাঙ্কর-ভাষ্য ও রামানুজ-ভাষ্য।

শাঙ্কর-ভাষ্য ও রামানুজ-ভাষ্যের সামঞ্জস্য

এবং

চৈতন্যদেব কথিত সূত্রের প্রকৃত অর্থ।

রামানুজ স্বামী একবার প্রাচীন বৃত্তির দোহাই দিয়া শঙ্করাচার্য্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে, ভেদ, ভেদাভেদ ও অভেদ লইয়া হুলস্থূল পড়িয়া গেল। স্বামী মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদ মতে সূত্রের ভাষ্য করিলেন।

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ঈশ্বরপুরীর শিষ্য। ঈশ্বরপুরী মধ্বাচার্য্যের শিষ্য-প্রণালীর মধ্যে। এই জন্য অনেকে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবকে মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত বলেন। এটী এক ভুল সংস্কার। কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত বলিলেও চলে। পুরী সম্প্রদায়ও শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত "দশনাম" সন্ন্যাসীর মধ্যে। বাস্তবিক শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র না হইলে, তাঁহার আবির্ভাবের কোন প্রয়োজন ছিল না।

উদিপি নগরে মধ্বাচার্য্যের প্রধান স্থানে মধ্ব-সম্প্রদায়ী আচার্য্যের সহিত মহাপ্রভু বিচার করিয়াছিলেন।

মুক্তি কর্ম্ম, দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্য সাধন॥
সন্ন্যাসী দেখিয়া মোরে করহ বঞ্চন।
না কহিলা তেঞি সাধ্য সাধন লক্ষণ॥
শুনি তত্ত্বাচার্য্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত।
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি হইলা বিস্মিত॥

আচার্য্য কহে তুমি যে কহ সেই সত্য হয়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয়॥
তথাপি মধ্বাচার্য্য যৈছে করিয়াছে নির্ব্বন্ধ।
সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায় সম্বন্ধ॥
প্রভু কহে কর্ম্মী জ্ঞানী দুই ভক্তি হীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিন॥
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।
সত্য বিগ্রহ ঈশ্বর করহ নিশ্চয়ে॥

চৈ, চ, মধ্যলীলা ৯ পঃ।

এইত মহাপ্রভুর মধ্বাচার্য্যের সহিত সম্বন্ধ। বাস্তবিক, দ্বৈতবাদ মহাপ্রভুর অভিপ্রেত নহে। সেইজন্য দ্বৈত-ভাষ্য বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। প্রকাশানন্দ স্বামীর সহিত বিচার করিতে মহাপ্রভু তাঁহার অভিপ্রেত সূত্রার্থের সূচনা করিয়াছিলেন।

"ব্রহ্ম" শব্দ মুখ্য অর্থে কহে "ভগবান্"
চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান।
তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার।
চিদানন্দ দেহ তাঁর স্থান পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার।
তাঁর দোষ নাহি তিঁহ আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে তার হয় সর্ব্বনাশ।
বিষ্ণু নিন্দা আর নাহি ইহার উপর
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর।

ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন
জীবের স্বরূপ যেন স্ফুলিঙ্গের কণ।
জীবতত্ত্ব হৈতে কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান
গীতা বিষ্ণুপুরাণাদি ইহাতে প্রমাণ॥

"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—এই সূত্রে ব্রহ্মের অর্থ নির্গুণ ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্মশব্দের অর্থ ভগবান্। এই সম্বন্ধে রামানুজ ও শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের মত এক। কিন্তু ভগবানের বর্ণনা সম্বন্ধে দুয়ের মত কিছু ভিন্ন। শ্রীশ্রীচৈতন্য-দেবের ভগবান্ নিত্য নিজদেহ-সম্পন্ন। সেই দেহ শুদ্ধ-সত্ত্বময়। তাঁহার স্থান বৈকুণ্ঠও শুদ্ধ-সত্ত্বময়। বৈকুণ্ঠবাসিগণের দেহও শুদ্ধ-সত্ত্বময়। এই শুদ্ধসত্ত্ব প্রাকৃতিক সত্ত্বের বিকার নহে। প্রাকৃতিক সত্ত্ব মিশ্র-সত্ত্ব। এই শুদ্ধসত্ত্ব চিদানন্দময়। শুদ্ধসত্ত্ব লইয়া বৈকুণ্ঠে বিরজা। প্রাকৃতিক সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ লইয়া ব্রহ্মাণ্ডে মায়া। বৈকুণ্ঠের বর্ণনে ভাগবতে শুদ্ধ-সত্ত্বের প্রসঙ্গ আছে।

"প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ,
সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং নচ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥" ২।৯।১০।

বৈকুণ্ঠে রজোগুণ ও তমোগুণ নাই এবং ঐ দুইগুণ সংযুক্ত মিশ্র সত্ত্বগুণ নাই। এই জন্য তথায় কালকৃত বিনাশ কিম্বা মায়ার প্রবেশ নাই। সেখানে ভগবানের পারিষদগণ অধিষ্ঠান করেন।

"কারণাব্ধি পারে মায়ার নিত্য অবস্থিতি
বিরজার পারে পরব্যোম নাহি গতি।"

সনাতনের শিক্ষা। চৈ, চ।

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥"
ব্রহ্মসংহিতা।

ব্রহ্ম এই ভগবানের অঙ্গ-কান্তি।

"ব্রহ্ম অঙ্গ-কান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে।" চৈ, চ।
সনাতনের শিক্ষা। চৈ, চ।

"যস্য প্রভা-প্রভবতঃ"
ব্রহ্ম সংহিতা।

এই ভগবানের তিন শক্তি—স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। চতুর্ব্যূহ, অবতার ও পারিষদগণ তাঁহার স্বরূপশক্তি। তাঁহারা শুদ্ধ-সত্ত্বময়। এইজন্য তাঁহাদের দেহ অপ্রাকৃত। জীব অতি সূক্ষ্ম। জীবের শরীর প্রাকৃত। এই জন্য জীব নিজশক্তি হইলেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে, তটস্থরূপে। মায়া-শক্তিদ্বারা ভগবান্ জগৎরূপে পরিণত হন।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" গীতা, ৭।১৪।

গুণময়ী প্রাকৃতিক মায়াকে অতিক্রম করিয়া যাহারা ভগবানকে আশ্রয় করে তাহারা শুদ্ধ-সত্ত্বে অবস্থিত হয়। "তাঁহার বিভূতি-দেহ সব চিদাকার"—অর্থাৎ ভগবানের সচ্চিদানন্দরূপ দেহ। "চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার"—অর্থাৎ চিদ্বিভূতিময় দেহ স্বীকার না করিয়া ভগবান্‌কে নিরাকার বলে।

"চিদানন্দ দেহ তাঁর স্থান পরিবার
তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার।"

ভগবানের দেহ, ভগবানের স্থান বা বৈকুণ্ঠ ভগবানের পরিবার, এ

সকল চিদানন্দময়। শঙ্করাচার্য্য যে ঈশ্বরের দেহকে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার কহেন এবং ঈশ্বরকে প্রাকৃতিক মায়া-উপহিত কহেন, সে নিতান্ত ভুল। "বিষ্ণু কলেবর" প্রাকৃত নহে।

জীবতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্র নহে। ঈশ্বরতত্ত্ব যেন জ্বলিত অগ্নি। জীব সেই অগ্নির স্ফুলিঙ্গ। অগ্নি ও অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে যে ভেদ, ঈশ্বর ও জীবে সেই ভেদ।

শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন,—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।"

রামানুজ ও শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব উভয়ের মতে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান্ একই তত্ত্ব।

রামানুজের মতে ব্রহ্ম চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বররূপে ত্রিধা। শ্রীশ্রীচৈতন্য-দেবের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ—সগুণ, নির্ব্বিশেষ—সবিশেষ রূপে দ্বিধা। শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্ম কেবল মাত্র নির্গুণ, অতএব অসম্পূর্ণ।

"বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্ব ধাম।
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর নাহি মায়াগন্ধ
সকল বেদের ভগবান্ সে সম্বন্ধ।
তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি।"

ব্রহ্মের এই স্বরূপ বর্ণনা উপনিষদ্ ও গীতার সহিত সঙ্গত এবং শঙ্করা-চার্য্যের বর্ণনার সহিত একেবারে বিরুদ্ধ নয়। অর্দ্ধ স্বরূপ ত্যাগ করিয়া শঙ্করাচার্য্যকে ঐন্দ্রজালিক মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব মায়ার স্থানে শক্তির শিক্ষা দিয়াছেন। এই শিক্ষা ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ-সঙ্গত।

রামানুজের ব্রহ্মে নির্গুণতার স্থান নাই; এই জন্য তাঁহার ব্রহ্ম ও শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্ম অত্যন্ত বিরুদ্ধ। রামানুজের মতে জীব ও ব্রহ্মের প্রকার

ভেদ অনাদি এবং তাহাদের সাযুজ্য সম্ভবপর নহে। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের মতে ভেদ কেবল অংশ-অংশীর ভেদ, এবং সাযুজ্য বা একত্ব সম্ভবপর বটে, কিন্তু প্রার্থনীয় নয়। ভাগবতেও একত্বের কথা আছে। তবে এই যে সাযুজ্য যুক্তি, ইহার স্থান নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম,—সবিশেষ ব্রহ্ম নহে।

"সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য প্রকার।
চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার॥
ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তের তাঁহা নাহি গতি।
বৈকুণ্ঠ বাহিরে তা সবার হয় স্থিতি॥
বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভায় পরম উজ্জ্বল॥
সিদ্ধ-লোক নাম তার প্রকৃতির পার।
চিৎস্বরূপ, তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার॥
সূর্য্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্ব্বিশেষ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ॥"

জীব ও ব্রহ্মের কল্পিত ভেদ গীতার সম্মত নহে, অংশগত ভেদ গীতার সম্মত। তথাপি "একত্ব," "সাযুজ্য" বা "নির্ব্বাণমুক্তি" দুই পক্ষেই সম্ভবপর। ভাগবতের মতে, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের মতে সেবার জন্য, ভক্তির জন্য মুক্তি প্রার্থনীয় নয়।

পরিণাম-বাদ সম্বন্ধে রামানুজ ও শ্রীশ্রীচৈতন্য একমত।

"ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণাম-বাদ।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাহা উঠাইল বিবাদ।
পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি॥
বস্তুত পরিণাম-বাদ সেই ত প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি এই বিবর্ত্তের স্থান॥"

আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন। প্রতি জন্মে আত্মার দেহ পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু আমরা ভ্রম বশতঃ দেহে আত্মবুদ্ধি করি। এই ভ্রমজ্ঞান বিবর্ত্ত-বশতঃ। কিন্তু রজ্জুতে সর্পের ন্যায় ব্রহ্মে জগৎ বিবর্ত্ত নহে। তবে কি ব্রহ্ম বিকারী? শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব বলেন,—

"অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি।
নানারত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি ইথে কি বিস্ময়॥"

চিদ্বিভূতিরূপ ঈশ্বরের যে দেহ, সেই দেহ অবলম্বন করিয়া জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়া-শক্তি এই তিন মুখ্য শক্তি বিরাজ করিতেছে। যখন 'একোঽহং নানা স্যাম্'—ঈশ্বরের এই ইচ্ছা হয়, তখনই তাঁহার অনন্ত জ্ঞানে বিশ্বের ছায়া উদ্ভূত হয় এবং তাঁহারই ক্রিয়া-শক্তিবলে চিদ্বিভূতির একাংশের পরিণাম হইয়া জগতের সৃষ্টি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঈশ্বরের দুই প্রকার; নির্ব্বিশেষ বা abstract aspect এবং সবিশেষ বা concrete aspect। এই সবিশেষ বা concrete aspect কে চৈতন্যদেব চিদ্বিভূতি বা শুদ্ধ-সত্ত্ব বলেন। পরিণাম চিদ্বিভূতিতে হয়। কিন্তু সে পরিণাম প্রাকৃতিক বিকার নহে। সে পরিণাম চিদ্বিভূতি অবলম্বন করিয়া ইচ্ছায় জগতের আবির্ভাব। জগতের জ্ঞান হইতেই জগতের সৃষ্টি। ইহাকে Pure Idealism বলা চলে। ইচ্ছায় জগতের জ্ঞান, জ্ঞান হইতে বিচিত্র Idea, Idea হইতেই ক্রিয়া-শক্তিবলে সৃষ্টি।

এই সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ ভাগ দ্বারা ব্রহ্ম দুই নহেন। তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। এই দুই ভাগ তাঁহার প্রকার বা aspect। নির্ব্বিশেষ-aspect নির্গুণ; তাহাতে কোন বিশেষ বা ভেদ নাই। সেই abstraction সমভাবে সকল পদার্থেই আছে, অথচ কোন পদার্থদ্বারা লিপ্ত নহে। শঙ্করাচার্য্য এই নির্গুণ-aspect সম্বন্ধে যথেষ্ট বলিয়াছেন। চৈতন্যদেবকে সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয় নাই। কিন্তু সবিশেষ, সগুণ-aspect সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা একরূপ নূতন। নূতন হইলেও গীতা ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে তাহার যথেষ্ট সূচনা রহিয়াছে।

সবিশেষ ব্রহ্ম।

"বেদ পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর লক্ষণ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান॥
নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন॥"

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে—একবিংশাঙ্ক-ধৃত হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রম্;

"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥"

'যে সকল শ্রুতি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বিষয় বলিয়াছেন, তাঁহারাই আবার সবিশেষ ব্রহ্মেরও বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বিচার করিলে সবিশেষ ব্রহ্মপক্ষেই প্রমাণ-বাহুল্য লক্ষিত হইয়া থাকে।'

"ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥
অপাদান করণাধিকরণ কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই চিহ্ন তিন॥
ভগবান্ বহু হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন॥

সে কালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন নয়ন।
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র মন ॥

*　　*　　*

অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্ব্বিশেষ ॥

*　　*　　*

সৎ চিৎ আনন্দময় ঈশ্বর স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিনরূপ ॥
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া, তিনে করে প্রেমভক্তি ॥

*　　*　　*

ঈশ্বরের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহ কহ সত্ত্বগুণের বিকার ॥"

মধ্যলীলা, ৬ পরিচ্ছদ।

সচ্চিদানন্দাকার ঈশ্বরের বিগ্রহ অর্থাৎ দেহ। এই দেহ প্রাকৃত নহে, অপ্রাকৃত। যদি সম্পূর্ণ ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলা হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দাকার দেহ অপ্রাকৃত বলিয়া ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলা হয়। লক্ষণা অর্থাৎ figure of aspect দ্বারা সবিশেষ ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলা হয়।

অপ্রাকৃত শুদ্ধ সত্ত্ব বৈকুণ্ঠের উপাদান।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥"

গুণময়ী মায়া উত্তীর্ণ হইলেই ভক্ত শুদ্ধ-সত্ত্বের উপাদানে গঠিত হয়।

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥"

'ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য লোক পুনরাবর্ত্তী। আমাকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে পুনর্জন্ম হয় না।' ইচ্ছা কিম্বা লীলায় জন্ম হইতে পারে।

ইহাতে জানা যায় ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকল লোক মায়ার অধীন। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড প্রাকৃতিক মায়ার উপাদানে গঠিত। ব্রহ্মাণ্ডের উপরে এমন এক লোক আছে, যেথানে প্রাকৃতিক মায়া যাইতে পারে না। সে লোকে গেলে আর অবশ হইয়া পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না।

"ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং, যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।"

গীতা।

সে লোক সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নির সীমার বহির্ভূত।

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥"

সেই লোক কি? বুদ্ধদেব যে লোককে একরূপ শূন্য বলিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্য তাহাকে নির্গুণ ব্রহ্ম পদ বলিয়াছেন, পুরাণ তাহাকে বৈকুণ্ঠ বলিয়াছেন। তিন গুণ অতিক্রম করিলেই শূন্য হয় না বা নির্গুণ ব্রহ্ম হয় না। "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে"—সেখানে জীবের অস্তিত্ব লোপ পায় না।

অর্জ্জুন উবাচ।

"কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে॥

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যোমিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥"

বৈকুণ্ঠে প্রাকৃতিক বিচিত্রতা নাই। সেখানে সকলেই বিষ্ণুরূপী। সেখানে সকলই নিত্য। ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ে সে নিত্যতার কিছু যায় আসে না। বৈকুণ্ঠের লীলা নিত্য লীলা। তবে সে লোকের উপাদান কি? শুদ্ধ-সত্ত্ব।

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবোহ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥"
ভাঃ, পু, ৪।৩।২৩।

বিশুদ্ধ-সত্ত্বকে 'বসুদেব' বলে। আবরণরহিত ভগবান্ বাসুদেব সেই বিশুদ্ধ-সত্ত্বে প্রকাশ পান।

"সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিনরূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিত, যারে জ্ঞান করি মানি॥
সন্ধিনীর সার অংশ, শুদ্ধসত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় তাহাতে বিশ্রাম॥
মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার॥"
চৈ চ।

"নাতঃপরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপমানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্ ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥"

ভাগবত পুরাণ, ৩-৯-৩।

'হে পরম, তোমার অবিদ্ধতেজ, অবিকল্প আনন্দমাত্র যে স্বরূপ, তাহা এই কৃষ্ণ-স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে।'

এখানে আনন্দ-মাত্র-স্বরূপ ভাগবতে আছে। কোথাও চিন্মাত্র-স্বরূপ আছে। ভগবদ্বিগ্রহকে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব "চিচ্ছক্তি বিলাস" বলিয়াছেন। এই চিচ্ছক্তি বিলাস ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ। চতুঃশ্লোকী ভাগবতের তৃতীয় শ্লোককে মহাপ্রভু ভগবদ্বিগ্রহের প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥"

ভা, পু, ২।৯।৩২।

"অহমেব অহমেব শ্লোকে তিনবার।
পূর্ণৈশ্বর্য্য বিগ্রহের স্থিতি নির্দ্ধার॥
যেই জন এই বিগ্রহ না মানে।
তারে তিরস্করিবারে করিল নির্দ্ধারণে॥
"এই" শব্দে হয় জ্ঞান বিজ্ঞান বিবেক।
মায়া কার্য্য মায়া হৈতে আমি ব্যতিরেক॥
যৈছে সূর্য্যের স্থানে ভাসয়ে আভাস।
সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ॥
মায়াতীত হইলে হয় আমার অনুভব।
এই সম্বন্ধ তত্ত্ব কহিল আর সব॥" চৈ, চ।

"সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের" কথা ব্রহ্মসংহিতাতে আছে। এইজন্য মহাপ্রভু ব্রহ্মসংহিতার পরম আদর করিতেন।

"মহা ভক্তগণসহ তাঁহা গোষ্ঠি কৈল।
ব্রহ্মসংহিতাধ্যায় পুথি তাঁহাই পাইল॥
পুথি পাঞা প্রভুর হৈল আনন্দ অপার।
কম্প অশ্রু পুলক স্বেদ স্তম্ভ বিকার॥
সিদ্ধান্ত শাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতার সম।
গোবিন্দ মহিমা জ্ঞানে পরম কারণ॥
অল্পাক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণব শাস্ত্র মধ্যে অতি সার॥" চৈ, চ।

এই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্থাপন করিবার জন্যই যেন মহাপ্রভুর অবতার। গীতাতে ইহার আভাস আছে, ভাগবতে ইহার উল্লেখ আছে, ব্রহ্মসংহিতাতে এই বিগ্রহের কথা স্পষ্ট রহিয়াছে। তথাপি মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তর্ক দ্বারা এই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্যের ঈশ্বর সমষ্টি মায়ারূপ দেহধারী। চৈতন্যদেবের ঈশ্বর মায়ার অতীত, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহধারী।

শঙ্করাচার্য্যের জীব ও ঈশ্বর উভয়ই মায়া-উপহিত এবং উপাধি-রহিত হইলে দুই এক। চৈতন্যদেবের ঈশ্বর ও জীব অংশী ও অংশরূপে বিভিন্ন। এ ভেদ কল্পিত নহে, বাস্তব। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন,—

"মায়াধীশ, মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সহ করহ অভেদ॥
গীতা শাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে।
হেন জীব অভেদ কর ঈশ্বরের সনে॥"

"অপরে যমিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।"

এই সচ্চিদানন্দাকার ঈশ্বরই পূর্ণব্রহ্ম। বাস্তবিক ব্রহ্ম সবিশেষ। লক্ষণা বা একদেশ-নির্ব্বাচন দ্বারা তিনি নির্ব্বিশেষ।

এই ঈশ্বর চতুস্পাদ। তাঁহার তিন পাদ মায়ার বহির্ভূত। এক পাদ লইয়া মায়ার কার্য্য।

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥" গীতা।

তথাচ।—"তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যং অনন্তং পরমং পদম্॥" পাদ্মোত্তরখণ্ড।

'বিরজার পারে ত্রিপাদ, সনাতন পরব্যোম ধাম। সেই পরম পদে অমৃত, শাশ্বত, নিত্য ও অনন্ত। বিরজার পারে মায়ার গতি নাই।'

ব্রহ্মাণ্ডের পারে, বিরজার পারে নিত্য বৈকুণ্ঠধাম। সেই বৈকুণ্ঠধামের উপাদান শুদ্ধসত্ত্ব। শুদ্ধসত্ত্ব চিচ্ছক্তির বিলাস এবং বৈকুণ্ঠধামে যে সকল ভক্ত পারিষদ থাকেন, তাঁহাদের শরীর শুদ্ধসত্ত্বময়। ভগবানের বিগ্রহও চিচ্ছক্তির বিলাস। এই বৈকুণ্ঠ ত্রিপাদ্বিভূতির ধাম।

"ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎ পদম্।
বিভূতি র্মায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ॥" পাদ্মোত্তরখণ্ড।

'ত্রিপাদ্বিভূতির ধাম বলিয়া, ভগবানের স্থানকে ত্রিপাদ্ভূত বলা যায়। আর সর্ব্বপ্রকার মায়িক বিভূতি পাদাত্মিকা মাত্র।'

জীব নির্ব্বিশেষ অথবা সবিশেষ ব্রহ্মে লীন হইতে পারে, কিম্বা ঈশ্বরের পারিষদ হইতে পারে। এই তিন প্রকার মুক্তিই সম্ভবপর।

"যদ্যপি মুক্তি হয় এই পঞ্চ প্রকার।
সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য সার্ষ্টি সাযুজ্য আর॥
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবা দ্বার।"

(অর্থাৎ এই সকল মুক্তিলাভ করিয়া জীব যদি ভগবানের সেবা করিতে পারে, অর্থাৎ তাঁহার সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কার্য্যে সহায়তা করিতে পারে :—)

"তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয় ॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত প্রকার।
ব্রহ্ম সাযুজ্য হইতে ঈশ্বর সাযুজ্য ধিক্কার ॥"

চরিতামৃত, মধ্য-৬।

সূত্রানুসরণ।

এইবার আমরা যতদূর সাধ্য ব্রহ্মসূত্রের অর্থ অন্বেষণ করিব।

ব্যাসের বেদান্ত সূত্রগুলি চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। এক এক অধ্যায়ে চারি চারি পাদ। শঙ্করাচার্য্যের সূচনা অনুসরণ করিয়া ভারতী তীর্থ এই সূত্রগুলির অধ্যায় ও পাদগত ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণ বা বিষয় নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার নির্ণীত অধিকরণগুলিকে ব্যাসাধিকরণমালা বলে।

"শাস্ত্রব্রহ্মবিচারাখ্যা অধ্যায়াঃ স্যুশ্চতুর্বিধাঃ।
সমন্বয়াবিরোধৌ দ্বৌ সাধনং চ ফলং তথা॥"

'ব্রহ্মবিচারপরায়ণ বেদান্তসূত্ররূপ শাস্ত্রের চারি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ের বিষয় সমন্বয়, দ্বিতীয় অধ্যারের বিষয় অবিরোধ, তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয় সাধন, চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় ফল।'

প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসমূহের সমন্বয় করা হইয়াছে।

"সমন্বয়ে স্পষ্টলিঙ্গে প্রশ্নষ্টত্বেঽপ্যুপাস্যগম্।
জ্ঞেয়গং পদমাত্রং চ চিন্ত্যং পাদেষ্বনুক্রমাৎ॥"

'প্রথম পাদে স্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গযুক্ত, অর্থাৎ স্পষ্টরূপে ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যের সমন্বয় করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পাদে উপাস্য ব্রহ্মবাচক অস্পষ্ট শ্রুতিবাক্যের সমন্বয় করা হইয়াছে।

তৃতীয় পাদে জ্ঞেয় ব্রহ্ম প্রতিপাদক অস্পষ্ট শ্রুতিবাক্যের সমন্বয় করা হইয়াছে এবং চতুর্থ পাদে কেবলমাত্র "অব্যক্ত" ইত্যাদি সন্দিগ্ধ পদমাত্রের সমন্বয় করা হইয়াছে।'

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে সাঙ্খ্যযোগ কাণাদাদি স্মৃতির সহিত এবং সাংখ্যাদি প্রযুক্ত তর্কের সহিত বেদান্ত সমন্বয়ের বিরোধ পরিহার করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পাদে সাংখ্যাদি মতের দুষ্টত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে।

তৃতীয় পাদের প্রথম ভাগে পঞ্চ মহাভূত বিষয়ক শ্রুতির এবং দ্বিতীয় ভাগে জীব-শ্রুতির পরস্পর বিরোধ পরিহার করা হইয়াছে।

চতুর্থ পাদে লিঙ্গশরীরবিষয়ক শ্রুতিসমূহের বিরোধ পরিহার করা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে জীবের পরলোক গমনাগমন বিচারপূর্ব্বক, বৈরাগ্য নিরূপণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদের প্রথম ভাগে 'ত্বং' পদের এবং দ্বিতীয় ভাগে 'তৎ' পদের শোধন করা হইয়াছে।

তৃতীয় পাদে সগুণ বিদ্যায় গুণোপসংহার এবং নির্গুণ-ব্রহ্মে অপুনরুক্ত পদোপসংহার নিরূপিত হইয়াছে।

চতুর্থপাদে নির্গুণ জ্ঞানের বহিরঙ্গ-সাধনভূত আশ্রম যজ্ঞাদি এবং অন্তরঙ্গ-সাধনভূত শম-দম-শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদি নিরূপিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে জীবের মুক্তি, দ্বিতীয় পাদে ম্রিয়মাণ জীবের উৎক্রান্তি, তৃতীয় পাদে উত্তরায়ণ মার্গ এবং চতুর্থ পাদে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও ব্রহ্মলোক নিরূপিত হইয়াছে।

এই গেল মোটামুটি অধিকরণ নির্ণয়।

এইবার বিশেষ অধিকরণ নিরূপণ করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য্য রামানুজাচার্য্য ও চৈতন্য মহাপ্রভুর মতভেদ বুঝিতে পারিব।

প্রথম অধ্যায়, প্রথম পাদ।

প্রথম অধিকরণ সূত্র ১—ব্রহ্মের বিচার্য্যত্ব।

দ্বিতীয় ঐ সূত্র ২—ব্রহ্মের লক্ষণ—"জন্মাদস্য যতঃ"।

তৃতীয় অধিকরণ সূত্র ৩—ব্রহ্ম-বেদের কর্ত্তা।

চতুর্থ ঐ সূত্র ৪—বেদান্ত ব্রহ্মবোধক এবং ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত।

পঞ্চম ঐ সূত্র ৫-১১—অচেতন প্রধান জগতের কর্ত্তা নহে।

এই পাঁচ অধিকরণ পর্য্যন্ত কোন বিবাদ নাই।

ষষ্ঠ অধিকরণ লইয়া সামান্য বিবাদ। অধিকরণের প্রকৃত অর্থ লইয়া কোন বিবাদ নাই। সূত্র ১২-১৯। তৈত্তিরীয় উপনিষদে "আনন্দময়" শব্দ পরমাত্মবাচক। সেইরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত "আদিত্যান্তর্গত হিরণ্ময় পুরুষ" "আকাশ" "প্রাণ" ও "জ্যোতিঃ" শব্দ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর-বাচক। (সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম অধিকরণ। সূত্র ২০—২৭)।

সেইরূপ কৌষীকতী উপনিষদে "প্রাণোঽস্মি" ইত্যাদি বাক্যে প্রাণশব্দ ব্রহ্মবাচক। (১১ অধিকরণ সূত্র ২৮—৩১)।

প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" এই কথা বলিয়া "স ক্রতুং কুর্ব্বীত মনোময় প্রাণশরীরো ভারূপঃ" এইরূপ বলা হইয়াছে। এখন "মনোময়" "প্রাণ শরীরো ভারূপঃ" বলিলে জীবাত্মা বুঝায়। কিন্তু পূর্ব্ব অংশে, ব্রহ্মই উপাস্য বলিয়া উপনিষদ্-বাক্য রহিয়াছে। তবে কি ব্রহ্ম উপাস্য, না জীব উপাস্য? উত্তর—ব্রহ্ম উপাস্য। (১ অধিকরণ সূত্র ১—৮)।

কারণ "সত্যকাম," "সত্য-সংকল্প," "আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত," এ সকল গুণ জীবাত্মার পক্ষে সম্ভব নহে। (২ ও ৩ সূত্র)।

উপনিষদের বাক্যে কর্ম্ম ও কর্ত্তার ভেদ উপলক্ষিত আছে। অর্থাৎ, শারীর-জীবাত্মা কর্ত্তৃক ব্রহ্ম (কর্ম্ম) প্রাপ্ত হন। ভেদ আছে বলিয়াই

উপাসক ভাব।* "তথোপাস্যোপাসকভাবোঽপি ভেদাধিষ্ঠান এব।" এইজন্য "মনোময়ত্বাদি" বিশিষ্ট বাক্য শারীর জীবে প্রযুক্ত নহে (৪ সূত্র)।

এক শব্দ দ্বারা জীবাত্মা নির্দ্দিষ্ট হয়। অপর শব্দ দ্বারা পরমাত্মা নির্দ্দিষ্ট হয়। "যথা ব্রীহি র্বা যবো বা শ্যামাকো বা শ্যামাকতণ্ডুলো বৈবময় মন্তরাত্মন্ পুরুষো হিরণ্ময়ঃ।" শতপথব্রাহ্মণের এই বাক্যে জীবাত্মা-বাচক "অন্তরাত্মন্" শব্দ সপ্তম্যন্ত এবং ঈশ্বরবাচক "পুরুষ" শব্দ প্রথমান্ত। (৫ সূত্র)। স্মৃতিতেও জীব ঈশ্বরের ভেদ দর্শিত হইয়াছে। (৬ সূত্র)।

শঙ্করাচার্য্য এই ষষ্ঠ সূত্রের টীকায় লিখিতেছেন—

স্মৃতিশ্চ শারীর-পরমাত্মনো ভেদং দর্শয়তি "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" ইত্যাদি।

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই শঙ্করাচার্য্যের মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি দেখেন, ব্যাসের সূত্রে ত জীব-ঈশ্বরের ভেদ সাব্যস্ত হইতে চলিল। আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। একবারে বাকিয়া বসিলেন—"অত্রাহ। কঃ পুনরয়ং শারীরো নাম পরমাত্মনোঽন্যো যঃ প্রতিষিধ্যতে অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ইত্যাদিনা। শ্রুতিস্তু "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা" ইত্যেবঞ্জাতীয়কা পরমাত্মনোঽন্যমাত্মানং বারয়তি। তথা স্মৃতিরপি "ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত" ইত্যেবঞ্জাতীয়কেতি। অত্রোচ্যতে। সত্যমেবমেতৎ পর এবাত্মা দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যুপাধিভিঃ পরিচ্ছিদ্যমানো বালৈঃ শারীর ইত্যুপচর্য্যতে। যথা ঘটকরকাদ্যুপাধিবশাৎ অপরিচ্ছিন্নমপি নভঃ পরিচ্ছিন্নবৎ অবভাসতে তদ্বৎ। তদপেক্ষয়া চ কর্ম্মকর্ত্তৃত্বাদিভেদ-ব্যবহারো ন বিরুধ্যতে প্রাক্ "তত্ত্বমসি" ইত্যাত্মৈকত্বোপদেশ-গ্রহণাৎ। গৃহীতে ত্বাত্মৈকত্বে বন্ধমোক্ষাদি-সর্ব্বব্যবহার পরিসমাপ্তিরেব স্যাৎ।"

পরমাত্মা হইতে বিভিন্ন এ শারীরাত্মা আবার কে? বেদান্ত-সূত্রেই

ত শারীর নিবারিত হইয়াছে। শ্রুতি ও স্মৃতি এক আত্মার নির্দ্দেশ করে। পরমাত্মাই দেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধি-উপাধি কর্ত্তৃক পরিচ্ছিন্ন হইয়া মূর্খগণ কর্ত্তৃক 'শারীর' বলিয়া কথিত হন। ঘটকরকাদি দ্বারা বাস্তবিক অপরিচ্ছিন্ন হইলেও আকাশ পরিচ্ছিন্নের ন্যায় বোধ হয়। যতদিন "তত্ত্বমসি" এই উপদেশ আমরা গ্রহণ করিতে না পারি, ততদিনই ভেদ-ব্যবহার। আত্মৈকত্ব- জ্ঞান হইলে বন্ধ-মোক্ষাদি সকল ব্যবহারই বিনষ্ট হইয়া যায়।"

ভাষ্যকারের সহিত এ পর্য্যন্ত রামানুজাচার্য্যের কোন বিরোধ হয় নাই। এইবার তাঁহাকে অস্ত্রধারণ করিতে হইল। সূত্রকার ভেদ দেখাইতেছেন। ভাষ্যকার অভেদ দেখাইতেছেন। ভেদই সত্য হউক, অভেদই সত্য হউক, বা ভেদাভেদই সত্য হউক, সূত্রের এইরূপ ভাষ্য সত্য হইতে পারে না।

"জীবস্য ইব পরস্যাপি ব্রহ্মণঃ শরীরান্তর্বর্ত্তিত্বমভ্যুপগতং চেৎ তদ্বদেব শরীরসম্বন্ধপ্রযুক্তসুখদুঃখোপভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন। হেতুবৈশেষ্যাৎ। ন হি শরীরান্তর্বর্ত্তিতয়ৈব সুখদুঃখোপভোগহেতুঃ অপিতু পুণ্যপাপরূপকর্ম্ম-পরবশত্বং তস্যাপহতপাপ্মনঃ পরমাত্মনো ন সম্ভবতি।"

রামানুজ বলেন যে, জীব কর্ম্মবশ, পরমাত্মা কর্ম্মবশ নহেন। জীব ও ঈশ্বরের এই ভেদ।

যদি মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য করিতেন, তাহা হইলে তিনিও বলিতেন যে, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ কল্পিত নহে।

ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যেন স্ফুলিঙ্গের কণ॥

অংশ অংশীর স্বরূপগত অভেদ থাকিলেও, ভেদগত ব্যবহার নষ্ট হয় না। অন্ততঃ যে একাত্মতার কথা শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, সে একাত্মতার কথা এ পর্য্যন্ত সূত্রে কিছুই নাই।

"The Sutras of this Adhikarana emphatically dwell on the difference of the individual and the highest self, whence Sankara is obliged to add an explanation in his commentary on Sutra 6 to the effect that the difference is to be understood as not real, but as due to the false limiting adjuncts of the highest self."

Dr. Thibaut's Introduction to the commentaries of Sankaracharya.

ব্রহ্মসূত্র।

প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ।

দ্বিতীয় অধিকরণ—(৯-১০ সূত্র)

কঠবল্লী উপনিষদে 'যস্ত ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোভে ভবত ওদনঃ' এই বাক্যে অত্তা চরাচর জগতের অত্তা বা সংহর্ত্তা ব্রহ্ম জীব বা অগ্নি হইতে পারে না। কারণ ব্রহ্মেরই প্রকরণে একথা লিখিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধিকরণ—(১১-১২ সূত্র)

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্ত লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ" কঠোপনিষদের এই বাক্যে জীব ও পরমাত্মার কথা বলা হইয়াছে।

চতুর্থ অধিকরণ—(১৩-১৭ সূত্র)

"য এযোঽক্ষিপুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মেতি" এই ছান্দোগ্য শ্রুতিতে কথিত অক্ষিপুরুষ পরমাত্মা।

পঞ্চম অধিকরণ—(১৮-২০ সূত্র)

বৃহদারণ্যকে "আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" ব্রহ্মবাচক।

ষষ্ঠ অধিকরণ—(২১-২৩ সূত্র)

মুণ্ডক উপনিষদে "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রং" ইত্যাদি বাক্য ব্রহ্মবাচক।

সপ্তম অধিকরণ—(২৪-৩২ সূত্র)

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে "আত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে" এই বাক্যে বৈশ্বানর শব্দ অগ্নি কি জীব বাচক নহে, পরমেশ্বর-বাচক।

প্রথম অধ্যায়—তৃতীয়পাদ।

প্রথম অধিকরণ—(১-৭ সূত্র)

"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং" (মুণ্ডক)—এই বাক্যে ব্রহ্মেরই কথা বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধিকরণ—(৮-৯ সূত্র)

"ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" (ছান্দোগ্য।) এখানে ব্রহ্মই ভূমা।

তৃতীয় অধিকরণ—(১০-১২ সূত্র)

"তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি" (বৃহদারণ্যক) এখানে "অক্ষর" বর্ণ নহে, ব্রহ্ম।

চতুর্থ অধিকরণ—(১৩ সূত্র)

"এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারস্তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনে নৈকতরমন্বেতি" এইরূপে প্রকরণের আরম্ভ করিয়া প্রশ্ন-শ্রুতি বলিতেছেন, "যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত।"

প্রকরণে পরব্রহ্মের উল্লেখ আছে। অপর-ব্রহ্মেরও উল্লেখ আছে। তাহা হইলে পরম পুরুষ বলিলে কোন্ ব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে? কাহার অভিধ্যান করিতে হইবে? মীমাংসা এই যে, পরব্রহ্মেরই ধ্যান করিতে হইবে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধিকরণ—(১৪-২১ সূত্র)

ছান্দোগ্য শ্রুতির দহরাকাশ আকাশও নহে, জীবও নহে, কিন্তু ব্রহ্ম।

সপ্তম অধিকরণ—(২২-২৩ সূত্র)

"ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" (কঠবল্লী)—এ কোন অন্য ভাস্বর পদার্থ নহে, স্বয়ং ব্রহ্ম।

অষ্টম অধিকরণ—(২৪-২৫ সূত্র)

কঠবল্লীর "অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ" বিজ্ঞানাত্মা নহে, পরমাত্মা। মনুষ্যের শাস্ত্রে অধিকার। মনুষ্যের হৃদয় অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত। যদিও পরমেশ্বর সকলের হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, তথাপি শাস্ত্রাধিকার-সম্পন্ন মনুষ্যের হৃদয় লক্ষ্য করিয়া 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ' বলা হইয়াছে।

নবম অধিকরণ—(২৬-৩৩ সূত্র)

তবে কি মনুষ্যেরই কেবল শাস্ত্রে অধিকার আছে। দেবতার কি নাই? বাদরায়ণ বলেন, দেবতারও অধিকার অছে। কারণ, দেবতারও শরীর আছে। শরীর পরিমাণে হৃদয়ও আছে। অঙ্গুষ্ঠেরও সেইরূপ পরিমাণ।

শূদ্রের বেদে অনধিকার।

প্রথম অধ্যায় তৃতীয়পাদ।

দশম অধিকরণ—(৩৪-৩৮ সূত্র)

তবে শূদ্রের অধিকার নাই। কারণ শ্রুতি ও স্মৃতি-বাক্য বিচার করিলে দেখা যায়, যে বেদের অধিকার ব্যতিরেকে বৈদিক-জ্ঞানলাভ হইতে পারে না। উপনীত না হইলে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। শূদ্রের উপনয়ন নাই। তৈত্তিরীয় সংহিতা সেইজন্য বলিয়াছেন—"তস্মাচ্ছূদ্রো যজ্ঞেঽনবক্লৃপ্তঃ।"

গৌতম ঋষি জাবালকে ব্রহ্মবিদ্যা শিখাইবার পূর্ব্বে তাহার সরল ব্যবহার ও সত্যবাদিতা দ্বারা ব্রহ্মকুলে জন্ম অবধারণ করিয়াছিলেন। পরে তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছিলেন। ইহাতেও অনুমান করা যায় যে, শূদ্রের বৈদিক জ্ঞানে অধিকার নাই।

স্মৃতিতেও এ সম্বন্ধে নিষেধ-বাক্য আছে। প্রথমতঃ মনু বলেন, "ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ ন চ সংস্কার মর্হতি।"

তাহার পর অন্য স্মৃতি-বাক্য আছে যথা—"অথাস্য বেদমুপশৃণ্বত স্ত্রপু-জতুভ্যাং শ্রোত্র-প্রতিপূরণম্" বেদ-শ্রবণকারী শূদ্রের কর্ণে সীসক ও জতু ভরিয়া দিবে।

"পদ্যুহবা এতৎ শ্মশানং যচ্ছূদ্রস্তস্মাৎ শূদ্রসমীপে নাধ্যেতব্যম্।"

শূদ্র শ্মশান-তুল্য। এ জন্য শূদ্রের নিকট বেদাধ্যয়ন করিবে না।

বেদোচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদ এবং বেদাধ্যয়নে শরীর-ভেদও স্মৃতিতে শূদ্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ," "দ্বিজাতী-

নামথাধ্যয়নমিজ্যা দানম্।" এইরূপ বাক্যে বেদ ও বৈদিক কর্ম্ম দুইই শূদ্রের প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।

এইরূপে নিজের ভাষ্যদ্বারা শঙ্করাচার্য্য ব্যাসসূত্রের অর্থ সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিলেন। শূদ্রের বেদাধ্যয়ন-নিষেধের প্রমাণগুলি যত্নের সহিত সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু জগতের শিক্ষাগুরু, পরম কারুণিক গৌতম বুদ্ধের দ্বিতীয় মূর্ত্তি শঙ্কর, ভেদজ্ঞান-রহিত চিদানন্দরূপ শঙ্কর, শূদ্রের অনধিকারে ব্যথিত-হৃদয় হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

"যেষাং পুনঃ পূর্ব্বকৃতসংস্কারবশাৎ বিদুরধর্ম্মব্যাধপ্রভৃতীনাং জ্ঞানোৎপত্তি স্তেষাং ন শক্যতে ফলপ্রাপ্তিঃ প্রতিবদ্ধুং জ্ঞানস্যৈকান্তিকফলত্বাৎ।"

'কিন্তু যে সকল শূদ্রের বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির ন্যায় পূর্ব্বজন্ম-কৃত সংস্কার বশতঃ জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদিগের ফলপ্রাপ্তি কে প্রতিরোধ করিতে পারে? কারণ, জ্ঞানের ফল ঐকান্তিক। জ্ঞানের ফল কিছুতেই প্রতিহত হয় না। জ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী। শূদ্রের যদি জ্ঞান হয়, তবে কি তাহারা অজ্ঞান থাকে?'

"শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্" ইতি চেতিহাসপুরাণাধিগমে চাতুর্বর্ণ্যাধিকার স্মরণাৎ।"

ইতিহাস-পুরাণদ্বারা যে জ্ঞানের অধিগম হয়, সে জ্ঞানে চারিবর্ণেরই অধিকার আছে। স্বয়ং ব্যাসদেবই মহাভারতে বলিয়াছেন, "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্।"

"বেদপূর্ব্বকস্তু নাস্ত্যধিকারঃ শূদ্রাণামিতি স্থিতম্।"

তবে বেদের কর্ম্মকাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া, বৈদিক যজ্ঞদ্বারা দেবতাদের অনুগ্রহ লাভ করিয়া, মন্ত্রবর্ণ দ্বারা অগ্নিদেবকে দূত করিয়া সকল দেবকে হব্য দান করিয়া, সংস্কার ও আশ্রমের পথে পথিক হইয়া ঐ পথলব্ধ-জ্ঞানে শূদ্রের অধিকার নাই। এখন ব্রাহ্মণেরও সে পূর্ণ অধিকার নাই।

এখন সে সংস্কারও নাই, সে বৈদিক মার্গও নাই। এখন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম কেবল মাত্র নামে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

ভাগবত পুরাণে এইজন্য লিখিত হইয়াছে যে, কলিকালে জাতিগত আচার ধর্ম্ম নাই, গুণগত আচার ধর্ম্ম। যদি কোন শূদ্রের স্বভাবগত ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে তাহার ব্রাহ্মণের কার্য্যে অধিকার হয়।

যে কালে শারীরক-সূত্র লিখিত হইয়াছিল, সে কালে যাহার পাপ-পুণ্যের জ্ঞান ছিল, সে সংস্কারদ্বারা বৈদিক জ্ঞানলাভ করিতে পারিত। সে কালে শূদ্রের পাপ-পুণ্যের জ্ঞান ছিল না। তাহার সংস্কার অসম্ভব ছিল। যেমন পশুর পাপপুণ্যের জ্ঞান নাই; তাহার সংস্কার অসম্ভব। সেরূপ মনুষ্যপশুকে (Animal man) চেষ্টা দ্বারা সংস্কৃত করিতে পারা যায় না। পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভ দ্বারা, দুঃখ ও যাতনার কষাঘাত দ্বারা ক্রমশঃ মনুষ্যপশুর পাপ-পুণ্যের জ্ঞান হয়। তখন তাহার বর্ণাশ্রম-নিয়ত দেশে দ্বিজাতিকুলে জন্ম হয়। তখন তাহার বৈদিক সংস্কার হয়, এবং সে বৈদিক কর্ম্ম দ্বারা ক্রমশঃ বৈদিক জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

যে কালে ভগবান্ বৈবস্বত মনু মানব-ধর্ম্ম নির্ণয় করিয়াছিলেন, সেকালে মনুষ্য-পশুকে শূদ্র বলিত। "ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ।" সেইরূপ সিংহ-ব্যাঘ্রেরও কোনরূপ পাপ নাই। যেরূপ সিংহ-ব্যাঘ্রের পাতক নাই, সেইরূপ মনুষ্য-পশু শূদ্রেরও পাতক নাই। কারণ উভয়ই হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য।

কিন্তু যখন শূদ্রের হিতাহিত জ্ঞান হয়, তখন সে কি শূদ্র থাকে? তখন কি তাহার ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা হইতে পারে না? যদি কেহ পূর্ব্বজন্মে সংস্কার-সম্পন্ন হইয়াও পরজন্মে শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করে, সেও কি জ্ঞানলাভ-

সম্বন্ধে শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইবে? বিদুরের জ্ঞান কি ব্যাসের জ্ঞান হইতে নিকৃষ্ট হইবে? শঙ্করাচার্য্য বলেন, বিদুরাদির ন্যায় সংস্কারহীন লোক বৈদিক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন এবং হিতাহিত-জ্ঞানসম্পন্ন শূদ্র ইতিহাস-পুরাণাদি দ্বারা জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইবেন। ব্যাসদেবও চতুর্ব্বর্ণের জন্য মহাভারত ও পুরাণ সঙ্কলন করিয়াছিলেন।

মন্ত্রবর্ণের জন্য এত মারামারি কেন? মন্ত্রবর্ণে অধিকার অতি সাবধানতার সহিত দিতে হয়। মন্ত্রবর্ণের ব্যভিচার আছে। মান্ত্রবর্ণিক বেদে সংস্কারসম্পন্ন দ্বিজাতিরই অধিকার।

কিন্তু যখন সংস্কার লুপ্ত হইতে চলিল, তখন মান্ত্রবর্ণিক বৈদিক ক্রিয়াও অন্তর্হিত হইল, দেবগণও মনুষ্যের পরোক্ষ হইলেন।

এখন আর বৈদিক যজ্ঞও নাই, বৈদিক সংস্কারও নাই। উপনয়ন এখন নাম মাত্র। এখন আর গুরুকুলও নাই, গুরুকুলে বাসও নাই।

যে বেদে শূদ্রের অনধিকার, সে বেদে আজকাল জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণেরও অনধিকার।

যে মান্ত্রবর্ণিক বেদ লুপ্ত হইয়াছে, তাহা বালক আর্য্যের সোপানস্বরূপ ছিল, আর্য্য বালককে কোলে পিঠে করিবার জন্য দেবতাদিগের অস্ত্র ছিল। সে বেদের আজ প্রয়োজন নাই। সে বেদের যে অবশেষ আছে, তাহা মোক্ষমূলরও নিরাপদে ঘাঁটিতে পারেন এবং যে-কোন শূদ্রও তাহাকে জ্ঞানের ভিত্তি করিতে পারে।

রাজগৃহে জরাসন্ধের সুবর্ণভাণ্ডারে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া কেহ কিছু করিতে পারিত না। প্রবেশদ্বাররহিত বেদভাণ্ডারের বহির্দেশে দণ্ডায়মান হইয়া কেহ কোন তথ্য জানিতে পারিবে না। ঔপনিষদ-জ্ঞান প্রকট আছে। ইতিহাস, পুরাণের সহায়তায় দ্বিজ শূদ্র সকলেই সে

জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। মান্ত্রবর্ণিক বেদের সোপান সে জ্ঞানলাভের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে।

ব্যাসের সূত্র ও শঙ্করের ভাষ্য লইয়া শূদ্রের অনধিকার প্রসঙ্গ বিচার করা হইল। রামানুজাচার্য্যেরও এই অবকাশে মায়াবাদী শঙ্করকে কটাক্ষ করিবার সুযোগ হইল।

শ্রীভাষ্যকার বলেন, ব্যাসদেব যাহা বলেন বলুন, মায়াবাদী শঙ্কর কিরূপে বলেন শূদ্রের বেদে অধিকার নাই?

"যে তু নির্বিশেষচিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থঃ, অন্যৎ সর্ব্বং মিথ্যাভূতং, বন্ধশ্চ অপারমার্থিকঃ,......তৈ র্ব্রহ্মজ্ঞানে শূদ্রাদেরনধিকারো বক্তুং ন শক্যতে। অনুপনীতস্য অনধীতবেদস্য অশ্রুতবেদান্তবাক্যস্যাপি যস্মাৎ কস্মাচ্চিদপি......বাক্যাৎ বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানোৎপত্তেস্তাবতৈব বন্ধনিবৃত্তেশ্চ নচ তত্ত্বমস্যাদি বাক্যেনৈব জ্ঞানোৎপত্তিঃ কার্য্যা ন বাক্যান্তরেণেতি নিয়ন্তুং শক্যং জ্ঞানস্য অপুরুষতন্ত্রত্বাৎ, সত্যাং সামগ্র্যাং অনিচ্ছতোঽপি জ্ঞানোৎপত্তেঃ, নচ বেদবাক্যাদেব বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানে সতি বন্ধনিবৃত্তির্ভবতীতি বক্তুং শক্যং যেন কেনাপি বস্তুমাহাত্ম্যজ্ঞানে সতি ভ্রান্তিনিবৃত্তেঃ।"

'যাঁহারা বলেন, নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মই পরমার্থ, আর সব মিথ্যাভূত, সংসারবন্ধনও অপারমার্থিক, তাঁহারা কিরূপে বলিতে পারেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানে শূদ্রের অধিকার নাই। অনুপনীত, অনধীতবেদ, অশ্রুতবেদান্তবাক্য ব্যক্তিও যে কোন প্রকারে, যে কোন বাক্যদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে তাহার বন্ধনিবৃত্তি হয়। তত্ত্বমস্যাদি বাক্য দ্বারাই যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, তাহা নহে। যে কোন প্রকারে বস্তুমাহাত্ম্যজ্ঞান হইলেই ভ্রান্তি নিবৃত্তি হয়।

এই অদ্বৈত বস্তু জ্ঞানে ব্রাহ্মণেরও যেমন অধিকার, শূদ্রেরও সেইরূপ অধিকার।। তবে গরীব উপনিষদ্ একেবারে ব্যর্থ হইয়া গেল।

"শূদ্রাদীনামের ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ সুশোভনঃ, অনেনৈব ন্যায়েন ব্রাহ্মণাদীনামপি ব্রহ্মবেদনসিদ্ধেঃ উপনিষচ্চ তপস্বিনীদত্তজলাঞ্জলিঃ স্যাৎ।"

এইজন্য রামানুজ বলেন, মায়াবাদ মিথ্যা। শূদ্রের অনধিকারই সত্য।

আমি বলি, মায়াবাদ সত্য হউক মিথ্যা হউক, শূদ্রের অনধিকার-প্রসঙ্গ এ সম্বন্ধে অপ্রাসঙ্গিক।

এ বিষয়ে কোন সাধারণ নিয়ম চলে না। বিদুরের অধিকার রামানুজ-কেও স্বীকার করিতে হইয়াছে।

"বিদুরাদয়স্তু ভবান্তরাধিগতজ্ঞানাপ্রসেধাৎ জ্ঞানবন্তঃ প্রারব্ধকর্ম্মবশাচ্চেদৃশ-জন্মযোগিন ইতি তেষাং ব্রহ্মনিষ্ঠত্বম্।"

যে কোন কারণে হউক, বিদুরাদি শূদ্র যদি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারে, তাহা হইলে অন্য শূদ্রেও হইতে পারে। জাতিগত অব্যর্থ বাধা নাই।

মধ্বাচার্য্য বলেন, স্ত্রীলোকের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে। অনধিকার ত কেবল সংস্কারের অভাব লইয়া। স্ত্রীলোকের বিবাহই সংস্কার। স্মৃতি-শাস্ত্রে বলে, যেমন পুরুষের পক্ষে উপনয়ন, সেইরূপ স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহ।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ মনুরও রাজত্ব নাই, মনুর বংশোদ্ভূত রাজগণও লুপ্ত হইয়াছেন। তাই ব্যাসের সূত্র লইয়া আজ এত মারামারি।

চৈতন্যদেবের জ্ঞান কৃষ্ণমূলক। শ্রীকৃষ্ণ বেদের অতীত। সে জ্ঞানে ব্রাহ্মণ, শূদ্র নাই। তিনি কেবল লোক-সংগ্রহের জন্য, ধর্ম্মের সেতু রক্ষার জন্য, বর্ণাশ্রমের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। ভক্তিমিশ্রিত ভাগবত-জ্ঞানে তিনি সকলকেই অধিকার দিয়াছেন।

"অজা" ছাগী না প্রকৃতি?

ব্রহ্মসূত্র—প্রথম অধ্যায়।

তৃতীয় পাদ ১১ অধিকরণ ৩৯ সূত্র।

কঠোপনিষদে "প্রাণ এজতি মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" এই বাক্যে প্রাণ শব্দে বজ্র কি বায়ু বুঝিতে হইবেনা, পরব্রহ্ম বুঝিতে হইবে।

১২ অধিকরণ ৪০ সূত্র।

ছান্দোগ্য উপনিষদে "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য" এই বাক্যে পরজ্যোতি শব্দেও পরব্রহ্ম বুঝিতে হইবে।

রামানুজ স্বামী বলেন, শঙ্করাচার্য্যের ৯ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ অধিকরণ ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণ নহে, বস্তুতঃ একই অধিকরণ। অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ ব্রহ্মবাচক, এই মাত্র অধিকরণের বিষয়। শূদ্রের প্রসঙ্গ মূল-প্রসঙ্গের আনুসঙ্গিক, যদিও প্রসঙ্গ হইতে ভিন্ন। প্রাণ আর জ্যোতি শব্দ কঠোপনিষদেই অঙ্গুষ্ঠপুরুষের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী এবং এই শব্দ কঠোপনিষদে স্পষ্টতঃ ব্রহ্মবাচক; সুতরাং অঙ্গুষ্ঠপুরুষও ব্রহ্মবাচক।

এ কেবল অধিকরণ লইয়া বিবাদ।

১৩ অধিকরণ ৪১ সূত্র।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আকাশ শব্দ ব্রহ্মবাচক।

১৪ অধিকরণ ৪২-৪৩ সূত্র।

বৃহদারণ্যকে বিজ্ঞানময় শব্দও ব্রহ্মবাচক। রামানুজ স্বামীর মতে ১৩ ও ১৪ অধিকরণ ভিন্ন নহে, কেবল মাত্র আকাশ-বিষয়ক অধিকরণ।

চতুর্থ পাদ।

১ম অধিকরণ ১ ৭ সূত্র।

"মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ"—কঠোপনিষদ্। মহৎ, অব্যক্ত ও পুরুষ শব্দ এইরূপ সন্নিকট থাকায় "অব্যক্ত" শব্দে সাংখ্য শাস্ত্রের প্রধান বুঝাইতে পারে। এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য ব্যাসদেব বলেন যে, প্রকরণ অনুসরণ করিলে, অব্যক্ত শব্দে শরীর বুঝায়। কঠোপনিষদের অগ্র-পরবর্ত্তী বাক্য সকল বিচার করিয়া শঙ্করাচার্য্য এই অর্থ সুস্পষ্ট করিয়াছেন।

২য় অধিকরণ ৮-১০ সূত্র।

এই অধিকরণের অর্থ করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য্য যে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সূত্র তিনটি। "চমসবদবিশেষাৎ।" 'কোন বিশেষ নাই। এইজন্য "চমস" শব্দের ন্যায়।'

"জ্যোতিরুপক্রমাত্তু তথা অধীয়ত একে।"

'জ্যোতিরুপক্রমের জন্য কেহ কেহ এরূপ পাঠ করিয়া থাকেন।'

"কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ।"

"কল্পনার উপদেশ থাকায় মধ্বাদির ন্যায় বিরোধ হয় না।"

প্রথম সূত্রের অর্থ সম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই। সকল ভাষ্যকারই বলেন, শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদের "অজামেকাং লোহিত-শুক্লকৃষ্ণাং। বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" এই শ্লোক লইয়া এই অধিকরণের আরম্ভ হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য বলেন "অজা" শব্দে প্রধান কি প্রকৃতি বুঝিতে হইলে কোন বিশিষ্ট নির্দ্দেশ চাই। কারণ অজা শব্দে ছাগীও ত বুঝায়। এখানে অজা শব্দে প্রধান বুঝিতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই।

লোহিত শুক্ল কৃষ্ণা অজার যে-কোন অর্থ করা যায় এবং যে-কোন মতে সে অর্থ প্রযুক্ত হইতে পারে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে "অর্ব্বাগ্বিলশ্চমস উর্দ্ধবুধ্ন" এইরূপ চমসের বিবরণ আছে অর্থাৎ সেই চমসের মুখ নীচে এবং শেষভাগ উর্দ্ধে। কেবলমাত্র এই মন্ত্র পড়িলে জানা যায় না যে, কোন চমস পাত্রের উল্লেখ এই মন্ত্রে আছে। পরে অন্য মন্ত্রে এই চমসকে আমাদের মস্তক বলা হইয়াছে, কারণ মস্তকের নিম্নভাগে মুখগহ্বর এবং উপরিভাগে অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়গণ।

অজা শব্দের প্রকৃত অর্থ তবে কিরূপে জানা যায়? সেইজন্য দ্বিতীয় সূত্রে বলিতেছেন—জ্যোতিঃ অর্থাৎ অগ্নি হইতে আরম্ভ করিয়া (তেজ, জল ও পৃথিবী এই তিন ভূত) অজা শব্দ বাচ্য। কারণ কোন কোন শাখায় এরূপ পাঠ আছে। যেমন ছান্দোগ শাখায়—"যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎকৃষ্ণং তদন্নস্য"। অগ্নির লোহিত রূপ, জলের শুক্ল রূপ এবং পৃথিবীর কৃষ্ণরূপ।

"তেজোঽবন্নকে" অজা বলিয়া শঙ্করাচার্য্যের নিজের মন পরিতৃপ্ত হইল না। ব্যাসসূত্রের অযথা অর্থ করিয়া শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং অজার অন্য অর্থ করেন। তিনি বলেন, শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদেই ঐশ্বরিক শক্তির উল্লেখ আছে—"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈ র্নিগূঢ়াম্।" এই অব্যাকৃত-নামরূপা দৈবী শক্তিই অজা শব্দ বাচ্য হইতে পারে। তবে শঙ্করাচার্য্যকে এই অর্থ করিতে নিষেধ কে করিয়াছিল?

তেজোঽবন্ন না হয় লোহিতশুক্লকৃষ্ণ হইল। "অজা" কিরূপে হইবে? এইজন্য শঙ্করাচার্য্যকে তৃতীয় সূত্রের এক বিকৃত অর্থ করিতে হইল।

এ কেবল কল্পনা মাত্র। ইহাতে কোন দোষ নাই। এখানে এ কথা বলা হয় নাই যে, তেজোঽবন্ন ছাগজাতীয় কিম্বা জন্মরহিত। এখানে এই মাত্র কল্পনা করা হইয়াছে যে, পৃথিবী, জল ও তেজ হইতে জরায়ুজাদি

সকল প্রাণী উদ্ভূত হইয়াছে এবং সেই ভূতত্রয় একটি ছাগীর তুল্য। যেমন কোন ছাগী দৈববশতঃ কতকটা লোহিত বর্ণ, কতকটা শুক্লবর্ণ ও কতকটা কৃষ্ণবর্ণ। তাহার সন্তান সন্ততিগণ মাতারই বর্ণ প্রাপ্ত হয়। তাহার মধ্যে কোন ছাগ ঐ ছাগীর নিকট থাকিতে ভালবাসে কেহ ভালবাসে না। সেইরূপ তেজোঽবন্ন লক্ষণ, ত্রিবর্ণ, ভূতপ্রকৃতি হইতে চরাচর ভূতজাত উৎপন্ন হয়। অবিদ্বান্ সেই প্রকৃতির উপভোগ করে। বিদ্বান্ সেই প্রকৃতিকে ত্যাগ করে।

যদি শঙ্করাচার্য্য এই অর্থ না করিতেন তাহা হইলে আমরা কিছুতেই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতাম না।

আচার্য্য সূত্রের অর্থ করিতে গিয়া বেশী দূরে গিয়াছেন। তিনি সাংখ্যের প্রকৃতি পরিত্যাগ করিতে গিয়া প্রকৃতিকে একবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং ব্যাসদেবকে অজার তেজোঽবন্ন অর্থ দিয়া নিজে চুপে চুপে "ঐশ্বরিক শক্তি" অর্থ করিলেন।

গোবিন্দানন্দ কিন্তু দোষ দিলেন ব্যাসের দ্বারে এবং থিবো (Thibaut) সাহেব গোবিন্দানন্দেরই অনুসরণ করিলেন।

"Here there seems to be a certain discrepancy between the views of the "Sutra" writer and Sankara. Govindananda notes that according to the Bhashyakrit "aja" means simply "maya", which interpretation is based on "prakarana"; while according to the Sutrakrit who explains "aja" on the ground of the Knandoyya-passage treating of the three primary elements, "aja" denotes the aggregate of those three elements constituting an "avantara prakriti."—On Sankara's explanation the term "aja" presents no difficulties, for "maya" is "aja", i. e, unborn, not produced. On the explana-

tion of the Sutra writer, however, "aja" cannot mean unborn, since the three primary elements are products. Hence we are thrown back on the "rudhi" signification of "aja," according to which it means she-goat."—Sacred Books of the East. Vo. XXXXIV. (Vedanta Sutras with Sankara's Comment.)—Pages 255-256.

থিবো সাহেব যদি জানিতেন যে তেজোঽবন্ন লক্ষণ অজা শঙ্করাচার্য্যের সৃষ্টি তাহা হইলে তিনি এরূপ লিখিতেন না।

রামানুজ বলেন,. অজা অর্থে প্রকৃতি কেন ছাড়িব, সাংখ্যের স্বতন্ত্র প্রকৃতিই ছাড়িব। ঈশ্বরাধীন প্রকৃতি ভগবদ্গীতাতেও আছে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও আছে। তদ্ভিন্ন আথর্ব্বন চুল্লিকা উপনিষদে ও গর্ভ উপনিষদে সুস্পষ্টরূপে ঈশ্বরাধীন প্রধান, প্রকৃতি ও অব্যক্তের উল্লেখ আছে।

ব্যাসদেব কেবল এইমাত্র মীমাংসা করেন যে,—"অজা" শব্দে সাংখ্যাচার্য্যের স্বতন্ত্র প্রধান বুঝায় না, ঈশ্বর-পরতন্ত্র, শ্রুতি-সম্মত প্রকৃতি বুঝায়। কেবলমাত্র 'অজা' শব্দ থাকিলেই স্বতন্ত্র প্রকৃতির অধিগম হয় না। যেমন কেবলমাত্র 'চমস' শব্দে কোন নির্দ্দিষ্ট 'চমস' বুঝায় না। প্রকরণে এমন কিছু নাই যাহাতে 'অজা' শব্দে স্বতন্ত্র প্রকৃতি বুঝায়। "অতোঽনেন মন্ত্রেণ ন অব্রহ্মাত্মিকা অজা অভিধীয়তে।" এইজন্য এই শ্রুতিবাক্যে অব্রহ্মাত্মিকা 'অজা' বুঝায় না।

"জ্যোতিরুপক্রমাত্তু"—অপরন্তু ব্রহ্মাত্মিকা প্রকৃতি বলিবার কারণ আছে। সূত্রে "জ্যোতি" শব্দ ব্রহ্মবাচক। "জ্যোতিরুপক্রমা—ব্রহ্মকারণিকা। তথা হি অধীয়তে একে।" তৈত্তিরীয় শাখান্তর্গত মহানারায়ণ উপনিষদে ব্রহ্মাত্মিকা অজার উল্লেখ আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও প্রকরণের আরম্ভে "কিং কারণং ব্রহ্ম"—এইরূপ উল্লেখ আছে।

কেবল এইমাত্র আপত্তি হইতে পারে—যদি প্রকৃতি ব্রহ্মকারণিকা হয়,

তাহা হইলে 'অজা' কিরূপে হইতে পারে। তাহার উত্তরে তৃতীয় সূত্রে বলিতেছেন যে,—"কল্পনোপদেশাচ্চ"—এখানে "কল্পন" শব্দের অর্থ সৃষ্টি। যেমন 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ'।

প্রকৃতি কারণ ও কার্য্যরূপে দুই অবস্থাপন্ন।

"সা হি প্রলয়বেলায়াং ব্রহ্মতাপন্না অবিভক্ত-নামরূপা অব্যক্তাদিশব্দবাচ্যা সূক্ষ্মরূপেণ,—অবতিষ্ঠতে। সৃষ্টবেলায়াং চোদ্ভূত-সত্ত্বাদিগুণা বিভক্ত-নামরূপা ব্যক্তাদিশব্দ-বাচ্যা তেজোঽবন্নাদিরূপেণ চ পরিণতা লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাকারা চ অবতিষ্ঠতে। অতঃ কারণাবস্থা অজা, কার্য্যাবস্থা চ জ্যোতিরুপক্রমা ইতি ন বিরোধঃ।"

কারণাবস্থায় ব্রহ্মতাপন্ন অব্যক্ত প্রকৃতিকে অজা বলিলে দোষ হয় না। রামানুজের এ অর্থ অসঙ্গত মনে হয় না।

শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদে সৃষ্টি নাই, প্রকৃতির সত্তা ও বিকার নাই। আছে মাত্র মায়াশক্তি। সেই মায়াশক্তি দ্বারা অদ্বয় ব্রহ্মে জগতের 'ভাণ' হয়। এই মায়াবাদ অনুসরণ করিয়া হয়ত আচার্য্য 'অজা' প্রকৃতি স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু তেজোঽবন্ন দ্বারা কিরূপে মায়াবাদের সমর্থন হয়, তাহা বুঝি না। তেজোঽবন্ন ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শক্তি গ্রহণ করিলে তাঁহার মতের সমর্থন হয় বটে। কিন্তু গোবিন্দানন্দ সে কথা বলিলেও, ভাষ্যকার সে কথা বলেন নাই।

মধ্বাচার্য্যের মতে এই তিন সূত্রে 'অজা'র উল্লেখ নাই। তাঁহার ব্যাখ্যানুসারে যেরূপ চমস শব্দের অর্থ মুখ, সেইরূপ অব্যক্তাদি শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। "জ্যোতি", অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ শব্দেও ব্রহ্মকে উল্লেখ করিতেছে। "কল্পন", অর্থাৎ ঈশ্বরের অনুধ্যানের জন্যই ঈশ্বরের এইরূপ নানা অভিধান শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মধ্বাচার্য্যের অর্থ একরূপ দয়ানন্দী অর্থ। যেমন দয়ানন্দের মতে

বেদের দেবতাবাচক সকল শব্দই ঈশ্বরবাচক এবং বেদের শিক্ষাও কতক পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুগত—প্রকরণ যাহাই হউক না কেন—সেইরূপ হনুমানের অবতার মধ্বাচার্য্য সকল সূত্রেই ব্রহ্ম দেখেন। সেই পরম ভক্তের নিকট আমি সতত মস্তক অবনত করি। তাঁহার ভাষ্যের কথা আমি কিছুই বলিতে চাহি না। তিনি যাহা বলেন ভক্তের নিকট তাহাই উপাদেয়।

চৈতন্যসম্প্রদায়ভুক্ত বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার গোবিন্দভাষ্যে রামানুজের অর্থই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বাস্তবিক এ বিষয়ে রামানুজ স্বামী ও মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মত অভিন্ন।

কাশকৃৎস্নের সিদ্ধান্ত—শঙ্কর ও রামানুজ।

ব্রহ্ম সূত্র – প্রথম অধ্যায়।

চতুর্থ পাদ—

তৃতীয় অধিকরণ—সূত্র ১১—১৩।

"যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশস্চ প্রতিষ্ঠিতঃ"—বৃহদারণ্যকের এই বাক্যে "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" সাংখ্যদর্শনের পঞ্চবিংশতিতত্ত্বকে বুঝায় না।

চতুর্থ অধিকরণ—সূত্র ১৪—১৫।

বেদবাক্যে সৃষ্টির ক্রম সম্বন্ধে বিরুদ্ধ বাক্য থাকিলেও, স্রষ্টার সম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই।

পঞ্চম অধিকরণ—সূত্র ১৬—১৮।

"যো বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্য বৈতৎ কর্ম্ম, স বৈ বেদিতব্যঃ"—কৌষিতকী ব্রাহ্মণের এই বাক্যে 'পুরুষাণাং কর্ত্তা' কে? শঙ্করের পূর্ব্বপক্ষ—প্রাণ না হয় জীব। রামানুজের পূর্ব্বপক্ষ—প্রসঙ্গানুযায়ি-সাংখ্যদর্শনের পুরুষ কি কর্ত্তা? উভয়েরই মীমাংসা ব্রহ্ম কর্ত্তা।

ষষ্ঠ অধিকরণ—সূত্র ১৯—২২।

এইরূপ "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্বপক্ষ শঙ্কর-মতে জীব, রামানুজ-মতে সাংখ্য পুরুষ। উভয়ের সিদ্ধান্ত ব্রহ্ম। অর্থাৎ এই শ্রুতিতে আত্মার অর্থ ব্রহ্ম।

কেন শ্রুতিতে আত্মশব্দে ব্রহ্ম বুঝায়? কেন একই শব্দ জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুয়ে প্রযুক্ত হয়? মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে পতি, পুত্রের উল্লেখ

আছে। হে মৈত্রিয়ি, পতির জন্য পতি প্রিয় নহে, আত্মার জন্য পতি প্রিয়। সেই আত্মাই আবার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের বিষয়। অতি সহজে শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মা পরমাত্মা হইয়া যায়। ইহার যথার্থ কারণ কি? জীবাত্মা ও পরমাত্মা কি এক? তাই প্রসঙ্গক্রমে ব্যাসদেব তিনজন মুনির মত উল্লেখ করিতেছেন—আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি এবং কাশকৃৎস্ন।

আশ্মরথ্য ঋষি বলেন,—"প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গম্"।

প্রকরণে এইরূপ প্রতিজ্ঞা আছে—"আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা।" আত্মা বিজ্ঞাত হইলে সকলই বিজ্ঞাত হয়। এই সকলই আত্মা।

এই প্রতিজ্ঞা দ্বারা জানা যায় আত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হইলেও অভিন্ন। আশ্মরথ্যের এই ভেদাভেদবাদ ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র আপন টীকায় বিশদ করিয়াছেন।

"অগ্নির স্ফুলিঙ্গগণ অগ্নি হইতে একান্ত ভিন্ন নহে, কারণ স্বরূপতঃ স্ফুলিঙ্গগণ অগ্নি, এবং একান্ত অভিন্নও নহে, কারণ তাহা হইলে অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের ভেদ করা যাইত না, এবং এক স্ফুলিঙ্গ হইতে অন্য স্ফুলিঙ্গেরও ভেদ হইত না। সেইরূপ জীবসকল ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া, ব্রহ্ম হইতে একান্ত ভিন্ন নহে, কারণ চৈতন্যই তাহাদের স্বরূপ,—আবার একান্ত অভিন্নও নহে, কারণ তাহা হইলে তাহাদের ব্যক্তিগত ভেদ থাকিত না। আর যদি তাহারা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ও সর্ব্বজ্ঞ হইত, তাহা হইলে জীবের প্রতি উপদেশ নিরর্থক হইত। এই জন্য জীবসকল ব্রহ্ম হইতে কতক ভিন্ন ও কতক অভিন্ন।"

আশ্মরথ্য ঋষির সাপক্ষে রামানুজ স্বামী দুইটী শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করেন।

"আত্ম বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ"—ঐতরেয় আরণ্যক।

"যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ।
তথা ক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিয়ন্তি।"

মুণ্ডক উপনিষৎ।

ঔড়ুলোমি ঋষি বলেন,—"উৎক্রমিষ্যত এবন্তাবাৎ।"

অবশ্য জাগ্রৎ অবস্থায় জীব ও পরমাত্মা ভিন্ন। কিন্তু উৎক্রমণ করিলে জীবের পরমাত্মভাব হয়। অর্থাৎ যদিও জীব বাস্তবিক পরমাত্মা হইতে ভিন্ন, তথাপি ভাবান্তর হইলে জীবের পরমাত্মত্ব হয়। তবে কি যে, সে জীব উৎক্রমণ করিলে পরমাত্মা হয়? তা নয়। "বিজ্ঞানাত্মা বা জীব দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সঙ্ঘাতরূপ উপাধি-সম্পর্কে কলুষীভূত। জ্ঞান-ধ্যানাদি সাধনের অনুষ্ঠান করিয়া জীব সংপ্রসন্ন হইলে, উৎক্রমণান্তর তাহার পরমাত্মার সহিত ঐক্যোপপত্তি হয়।"—শঙ্কর।

এই মতের সমর্থনে নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করা যায়,—

"এষ সম্প্রসাদোঽস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি।"

ছান্দোগ্য।

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে-
ঽস্তংগচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নাম-রূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"

মুণ্ডক।

এই মতকে বাচস্পতি মিশ্র সত্যভেদবাদ বলেন।

কাশকৃৎস্ন ঋষি বলেন,—"অবস্থিতেঃ"। পরমাত্মা জীবরূপেই অবস্থিত।

শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েরই মতে কাশকৃৎস্নের মত সিদ্ধান্ত।

এই বিষয়ে দুই আচার্য্যেরই মত পর্য্যালোচনা করা উচিত।

প্রথমে শাঙ্করভাষ্যের উল্লেখ করিব। "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" এবং জাতীয়ক ব্রাহ্মণবাক্য দ্বারা পরমাত্মারই জীবভাবে অবস্থান দেখা যায়। এই অভিপ্রায়ব্যঞ্জক বৈদিক মন্ত্রও আছে—"সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে।" অগ্নি, জল, প্রভৃতি ভূতের সৃষ্টিপ্রকরণে, জীবের পৃথক্ সৃষ্টি হইয়াছিল, একথা শ্রুতিতে পাওয়া যায় না। অতএব শ্রুতিতে এমন কিছু নাই, যাহাতে পরমাত্মার বিকাররূপ জীব স্বতন্ত্র পদার্থ, এরূপ অবধারিত হইতে পারে। কাশকৃৎস্ন আচার্য্যের মত এই যে, অবিকৃত পরমেশ্বরই জীব। জীব অন্য কোন তত্ত্ব নহে।

আশ্মরথ্য ঋষি যদিও জীবের সহিত পরমাত্মার অনন্যত্ব বলেন, তথাপি "প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির জন্য"—এইরূপ বলিয়া তিনি কার্য্য কারণ ভাবের সূচনা করিয়াছেন, অর্থাৎ জীব কার্য্য ও পরমাত্মা কারণ। উক্ত ঋষির কিয়ৎ-পরিমাণে অনন্যত্ব অভিপ্রেত, সম্পূর্ণরূপে নহে। আবার ঔড়ুলোমি ঋষি স্পষ্টতই অবস্থার অপেক্ষা করিয়া ভেদ ও অভেদ বলিয়াছেন।

এই সকল ঋষিদিগের মতের মধ্যে কাশকৃৎস্ন ঋষির মতই শ্রুতির অনুসারী। কারণ তাঁহার মত "তত্ত্বমসি" আদি মহাবাক্যের সহিত সঙ্গত। পরমাত্মরূপ জীবের জ্ঞানেই অমৃতত্ব সম্ভব হয়। আর জীব যদি বিকারাত্মক হয়, তাহা হইলে—যেমন বিকৃতি তাহার প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হইলে, সেই বিকৃতির আর কিছু থাকে না,—সেইরূপ বিকারাত্মক জীব আপন প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হইলে, কে আর অমৃতত্ব লাভ করিবে? (যদি ভেদ কল্পিত হয়, তবেই তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের জ্ঞানদ্বারা ভেদের নিবৃত্তি হইতে পারে। যদি

ভেদ সত্য হয়, তাহা হইলে তাহার নিবৃত্তি হয় না।—আনন্দগিরি)। এই কারণ নাম ও রূপ জীবকে আশ্রয় করিতে পারে না। নাম ও রূপ জীবের উপাধিকেই আশ্রয় করে। উপাধি-আশ্রিত নাম-রূপই জীব গ্রহণ করে। তবে যে কোন শ্রুতিতে জীবকে অগ্নি-বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বলিয়াছেন, সে স্ফুলিঙ্গত্ব বা অংশত্ব উপাধির আশ্রিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। জীবের উৎপত্তিও উপাধি আশ্রিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ বাস্তবিক জীবের উৎপত্তি হয় না, উপাধিরই উৎপত্তি হয়। ... ...

... ... উপরে কাশকৃৎস্নের মত বেদসম্মত ইহা দেখান হইয়াছে। এইজন্য বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মারর ভেদ পারমার্থিক নহে। এ ভেদ অবিদ্যা-প্রত্যুপস্থাপিত নামরূপ-বিরচিত দেহাদি উপাধি নিমিত্ত ভেদ। এই অর্থ সকল বেদান্তবাদীরই স্বীকার করা উচিত।

"সদেব সোম্যেদমগ্র অসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছান্দোগ্য), "আত্মৈবেদং সর্ব্বন্" (ছা), "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" (মু), "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" (বৃ), "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যতোঽস্তি দ্রষ্টৃ" (বৃ)—এই সকল শ্রুতিবাক্য-দ্বারাও ঐ মতের সমর্থন হয়।

"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিদম্" (গীতা), "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।" (গী), "সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্" (গী)—ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যও ঐ মতের সমর্থন করে।

যে সকল বাক্যে ভেদদর্শনের নিষেধ করে, সেই সকল বাক্য দ্বারাও কাশকৃৎস্নের মত সিদ্ধ হয়। যথা—"অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশু" (বৃ) "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" (বৃ)।

আবার যে সকল শ্রুতিবাক্যে আত্মার বিচার নাই একথা বলে, সে সকল বাক্যও অভেদ প্রতিপন্ন করে—যেমন "স বা এষ মহানজ আত্মা-ঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম" (বৃ)।

অন্যথা মুমুক্ষুর নিরপবাদ বিজ্ঞান হইতে পারে না। (কারণ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, জীবের ব্রহ্মজ্ঞান প্রবল হইয়া "অহং ব্রহ্ম" এই নির্বাধ জ্ঞানের বাধক হয়—আনন্দগিরি। ভেদই অপবাদ। যদি জ্ঞান মুক্তির অবস্থাতেও ভেদ-কলুষিত হয়, তাহা হইলে মুমুক্ষুকে নিরপবাদ জ্ঞানের আশা পরিত্যাগ করিতে হয়)।

আর মুমুক্ষুর সুনিশ্চিত অর্থও হইতে পারে না। (ভেদ ও অভেদের বিরোধ প্রযুক্ত যে সংশয় হয়, ভেদজ্ঞানে তাহার নিবৃত্তি হয় না—আনন্দগিরি)।

নিরপবাদ বিজ্ঞান সকল আকাঙ্ক্ষার নিবর্ত্তক। কেবলমাত্র সে জ্ঞান আত্মবিষয়ক। সে জ্ঞানের অন্য বিষয় থাকিবে না।

শ্রুতিতে কথিত আছে,—"বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ"—মুণ্ডক।

"তত্র কোমোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ"—ঈশা।

গীতাস্মৃতিতে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণেও এইরূপ বর্ণন আছে।

যদি এইরূপ প্রতিপন্ন হইল, যে ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরমাত্মার একত্বজ্ঞানই সম্যগ্দর্শন, এবং ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরমাত্মার ভেদ কেবল নামমাত্র, তখন ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন এবং পরমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে ভিন্ন—এইরূপ আত্মভেদ-বিষয়ক নির্বন্ধ নিরর্থক।

একই আত্মা নামমাত্র ভেদে বহুধা অভিহিত হয়।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্"—তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই বাক্যে কোন এক গুহা নির্দ্দেশ করিয়া "গুহায়াম্" শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। আর ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অন্য কেহ গুহাতে নিহিত নহে। শ্রুতিতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে,—"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"—তৈত্তিরীয়।

যাহারা জীব পরমাত্মার ভেদবিষয়ক নির্বন্ধ করে, তাহারা বেদান্তের প্রকৃত অর্থের বাধক হয়, শ্রেয়োদ্বার সম্যগ্দর্শনের বাধক হয় এবং অনর্থক

মোক্ষকে কৃত বা কর্ম্মফলীভূত কল্পনা করে। কিন্তু যাহা কৃত তাহাই অনিত্য, সুতরাং তাহাদের কল্পিত মোক্ষও অনিত্য। আবার যদি তাহারা এরূপ তর্ক করে যে, মোক্ষ 'কৃত' হইলেও নিত্য, তাহা হইলে তাহাদের তর্ক ন্যায়সঙ্গত হয় না। শঙ্করের যুক্তি আনুপূর্ব্বিক দেওয়া হইল।

এইবার শাঙ্কর-যুক্তি সম্বন্ধে রামানুজের তর্ক দিব। এই তর্ক রামানুজের অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচায়ক। যদি রামানুজের সিদ্ধান্ত বা মণ্ডন তাঁহার খণ্ডনের সমতুল্য হইত, তাহা হইলে অনায়াসে তিনি শঙ্করাচার্য্যের স্থান অধিকার করিতে পারিতেন।

আশ্মরথ্যের ভেদাভেদ সম্বন্ধে রামানুজ বলেন,—

এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হয় এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার জন্য আশ্মরথ্য যে বলেন—জীব ব্রহ্মের কার্য্য, অতএব জীব-শব্দে ব্রহ্মকে বলা যায়, একথা অযুক্ত।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারা জানা যায় যে জীব অজ।

আর ইহাও সকলে স্বীকার করে যে, জীবের পূর্ব্বজগতে অর্জ্জিত কর্ম্মফল-ভোগের জন্য নূতন জগতের সৃষ্টি হয়।

নতুবা (যদি প্রতিজগতে নূতন করিয়া সূর্য্য হইতে সূর্য্য কিরণের ন্যায়, ব্রহ্ম হইতে জীবের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে) বিষম সৃষ্টি হইতে পারে না। (কারণ, ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইলে, সকল জীবই সমান ধর্ম্মাবলম্বী হইবে। তাহা হইলে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ভাল, কেহ মন্দ কেন হইবে?)

আর যদি জীব ব্রহ্মের কার্য্যমাত্র হয়, তাহা হইলে মুক্তির অবস্থায় জীব একবারে ব্রহ্মে লীন হইয়া যাইবে, তাহার ব্রহ্মত্বাপত্তি হইবে, তখন আর জীব বলিয়া কিছুই থাকিবে না। যেমন ঘটাকাশে মহাকাশে মিলিয়া

গেলে তাহার কিছু থাকে না। এই বিনাশরূপী মোক্ষের জন্য উপায়-বিধান ও সেই উপায়ের অনুষ্ঠান অনর্থক।

আর এরূপ মোক্ষে পুরুষের কি অর্থ সাধিত হইবে? ঘট যদি মৃত্তিকায় পরিণত হয়, তাহা হইলে ঘটের কি উপকার হয়। ঔডুলোমির মতের সম্বন্ধে রামানুজ বলেন,—জীবের আবার ব্রহ্ম হওয়া বা ব্রহ্মভাব কি কথা? উৎক্রমণের পূর্ব্বে জীবের অব্রহ্মত্ব স্বাভাবিক না ঔপাধিক? আর যদি ঔপাধিক হয়, তাহা হইলে সে উপাধি পারমার্থিক না অপারমার্থিক?

যদি পূর্ব্বকালীন অব্রহ্মত্ব স্বাভাবিক বা স্বাভাবগত হয়, তাহা হইলে যাহা স্বরূপতঃ অব্রহ্ম, তাহা স্বরূপ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম হইতে পারে না।

আর যদি বল—উৎক্রমণের পর ভেদেরও নাশ হয়, স্বরূপেরও নাশ হয়, তাহা হইলে যাহার স্বরূপ গেল, তাহার অস্তিত্ব গেল, তখন আর ব্রহ্মভাব কাহার হইবে? আর সে ব্রহ্মভাব হইয়াই বা কি লাভ?

যদি বল—উৎক্রমণের পূর্ব্বে জীবের অব্রহ্মত্ব, বা ব্রহ্মের সহিত ভেদ, ঔপাধিক, এবং সেই উপাধি পারমার্থিক, অর্থাৎ বাস্তবিক বা সত্য, কাল্পনিক নহে—তাহা হইলে জীব ব্রহ্ম হয়—এ কথা বলিতে পার না। কারণ, জীব ত পূর্ব্ব হইতেই ব্রহ্ম ছিল। উপাধি জীব হইতে ভিন্ন ছিল। এই পক্ষ-বাদীর মত-অনুসারে উপাধি ও ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্য বস্তু নাই। তাহা হইলে উপাধিতে ভেদ হইতে পারে। নিরবয়ব ব্রহ্মে উপাধি কর্ত্তৃক ভেদ হইতে পারে না। ভেদ যদি কেবলমাত্র উপাধিগত হয়, তাহা হইলে উৎক্রমণের পূর্ব্বে যাহা ব্রহ্ম ছিল না, তাহা উৎক্রমণের পর ব্রহ্ম হইল—এরূপ কথা বলা চলে না।

আর যদি বল—উৎক্রমণের পূর্ব্বে জীবের অব্রহ্মত্ব ঔপাধিক, আর সে উপাধি অপারমার্থিক বা কাল্পনিক, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি—উৎক্রমণের পর কে ব্রহ্ম হইল? কাহার ব্রহ্মভাব হইল?

যদি বল—ব্রহ্মই ব্রহ্ম হয়, অর্থাৎ উৎক্রমণের পূর্ব্বে ব্রহ্মের আত্মস্বরূপ অবিদ্যা উপাধি কর্ত্তৃক তিরোহিত ছিল এবং উপাধি নষ্ট হইলেই ব্রহ্ম আপন স্বরূপে প্রতিভাত হয়—তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি ব্রহ্ম ত নিত্য, মুক্ত, স্বপ্রকাশ, জ্ঞানস্বরূপ, সেই ব্রহ্মের অবিদ্যা কর্ত্তৃক তিরোধান কিরূপে হইবে ?

তিরোধান শব্দের অর্থ কি ? বস্তুর স্বরূপ বিদ্যমান থাকে, তবে তাহার প্রকাশের নিবৃত্তি হয়।

আর যেখানে প্রকাশই বস্তুর স্বরূপ, আর (অদ্বৈতবাদী তাহাই অঙ্গীকার করেন), সেখানে তিরোধান বা প্রকাশের নিবৃত্তি হইতে পারে না। আর যদি প্রকাশের নিবৃত্তি হয়, তাহা হইলে স্বরূপেরই নাশ হইল।

ব্রহ্ম নিত্য-আবির্ভূত, স্ব-স্বরূপ হইলে, উৎক্রান্তির পর ব্রহ্মভাব হওয়া অসম্ভব।

এই ত গেল রামানুজের পূর্ব্বপক্ষ। এইবার দেখিব রামানুজের সিদ্ধান্ত, —যাহাকে তিনি কাশকৃৎস্নের সিদ্ধান্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কাশকৃৎস্ন বলেন,—জীববাচক শব্দ ব্রহ্মে প্রয়োগ করা যায়, কারণ ব্রহ্ম আত্মরূপে স্বশরীরভূত জীবাত্মায় অবস্থিতি করেন। এই মতের সমর্থক শ্রুতিবাক্যও আছে; যথা—"য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যমাত্মা নবেদ যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি সবৈ আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ," "যোঽক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্," "যস্যাক্ষরং শরীরং যমক্ষরং নবেদ", "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা"।

তিন সূত্রের বিচার করিয়া শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ কাশকৃৎস্নের দোহাই দিয়া, আপন আপন মত স্থাপিত করিলেন। এখন চৈতন্য-সম্প্রদায়ী ভাষ্যকার কোথায় ? বলা হয় নাই,—শঙ্করাচার্য্য এই তিন সূত্রের প্রকরণ অনুসারে অন্য অর্থও করিয়াছেন।

মৈত্রেয়ী সংবাদে এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে,—"মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি"। "ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়",—ভূতসমূহ হইতে সমুত্থান—একথা কেবল বিজ্ঞানাত্মারই হইতে পারে, পরমাত্মার নহে।

এই পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণের জন্য ব্যাসদেব তিন জন ঋষির মত দেখাই-তেছেন। প্রত্যেকেরই মতে বিজ্ঞানাত্মাকে পরমাত্মা বলা চলে।

শঙ্করাচার্য্যের এই ব্যাখ্যায় এই তিন ঋষির পরস্পর বিরোধ বিচারের অবশ্যকতা হয় না। এই বলিয়া বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় রণে ভঙ্গ দিলেন।

আমরা ক্ষীণ বুদ্ধির ক্ষীণ আলোকে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের চরণকমল ধ্যান করিয়া, ঐ তিন সূত্রে তাঁহার মত স্থাপিত করিবার প্রয়াস পাইব।

কাশকৃৎস্ন—চৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত।

বোধায়ন ঋষি-প্রবর্ত্তিত শারীরক সূত্রের ভাষ্য সনাতন কাল হইতে প্রচলিত ছিল। শঙ্করাচার্য্যও সেই ভাষ্যের অনুসরণ করিয়াছিলেন। কেবল মাত্র নিজমত স্থাপনের জন্য যেখানে অন্যতর ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছে, সেখানে তাহাই করিয়াছেন। এ জন্য মোটামুটি শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ স্বামীর ভাষ্য, যেখানে মতভেদ নাই সেখানে এক। মধ্বাচার্য্যের ভাষ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আনন্দগিরি, গোবিন্দানন্দ বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি সকলে শঙ্করাচার্য্যের টীকার অনুসরণ করেন। বলদেব বিদ্যাভূষণও মোটামুটি সেই পথের পথিক হইয়াছেন। অতএব বোধায়ন-প্রবর্ত্তিত সনাতন মূল-ভিত্তি একরূপ বজায় আছে। সেই মূল-ভিত্তি না থাকিলে, ব্যাসের সূত্র লইয়া যে গণ্ডগোল হইত, তাহার অনুমান করাও দুঃসাধ্য।

চৈতন্যদেবও, সূত্রের ভাষ্য করিতে হইলে, মূলভিত্তি ছাড়িতেন না।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি।

কোন্ আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য—জীবাত্মা না পরমাত্মা? উত্তর,—পরমাত্মা।

জীবাত্মা নহে পরমাত্মা,—ইহার কারণ কি? আশ্মরথ্য বলেন,—"প্রতিজ্ঞা সিদ্ধের্লিঙ্গম্"। "আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা"—আত্মা বিজ্ঞাত হইলে, 'ইদং সর্ব্বং' বিজ্ঞাত হয়। 'ইদং সর্ব্বং' যাহা, তাহাই আত্মা। এই প্রতিজ্ঞাবাক্যে আত্মার লিঙ্গ বা চিহ্ন দেওয়া রহিয়াছে। যাহাকে জানিলে, প্রত্যেক আত্মাকে জানা যায়,—সেই আত্মা দ্রষ্টব্য। সে কিরূপে সম্ভব হয়? যদি প্রত্যেক আত্মা পরমাত্মায়

অংশ হয়, তবেই পরমাত্মাকে জানিলে তাঁহার সকল অংশকে জানা যায়। অংশ-অংশী-রূপে জীবাত্মা-পরমাত্মা এক। সেই জন্য—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ"—এই শ্রুতিতে জীবাত্মাবাচক শব্দদ্বারা পরমাত্মাকে বুঝিতে হইবে।

অবশ্য একথা স্বীকার করিতে হয় যে, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ। চৈতন্যের অংশ নাই সত্য; কিন্তু ঈশ্বরের শক্তিও সত্য। যাহা কিছু আছে ঈশ্বরের শক্তি-রচিত। এজন্য ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছু নাই। যাহা কিছু আছে সকলই ঈশ্বর।

শক্তির তারতম্য অনুসারে, ঈশ্বর মায়াধীশ—জীব মায়ার অধীন। ঈশ্বরের পরাশক্তি। জীবের ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি—ক্ষেত্র-পরিচ্ছিন্ন।

ঈশ্বরের শুদ্ধ সত্ত্বময় অপ্রাকৃত দেহে ইচ্ছাশক্তি কর্ত্তৃক অংশ হয়। সেই অংশ আরাগ্র-শতভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম। সেই অংশে ঈশ্বর অধিষ্ঠিত থাকেন। সেই অংশ ঈশ্বরের বীজ-স্বরূপ। সেই বীজ প্রকৃতির ক্ষেত্রে নিহিত হইয়া ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হয়। সেই বীজ প্রথমে গর্ভাবস্থায় থাকে। পরে প্রসূত হইয়া নানা যোনি ভ্রমণ করে। পরে মনুষ্য জন্মলাভ করিয়া কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান বলে, পিতার অনুরূপ হয়। "মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।" "অহং বীজপ্রদঃ পিতা"। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" "প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। জীবভূতাং মহাবাহো।"

শ্রুতিতেও রহিয়াছে—"যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ।"

কিন্তু সেই অংশবাচক জীব শব্দকে পরমাত্মবাচক বলা ধৃষ্টতা। জীব ও ঈশ্বরে বস্তুতঃ অভেদ থাকিলেও ভেদ আছে। মায়াধীন বিজ্ঞানাত্মাকে মায়াধীশ-পরমাত্মা বলা কিছুতেই সঙ্গত হয় না।

অতএব ঔড়ুলোমি ঋষি বলেন,—"ঔৎক্রমিষ্যত এবম্ভাবাৎ।" জীব যদিও পরিচ্ছিন্ন ও মায়াধীন—তথাপি সংস্কার দ্বারা ও জ্ঞান-ধ্যানাদি-

সাধনের অনুষ্ঠান দ্বারা সম্প্রসন্ন হইয়া জীব উৎক্রমণ করিলে, সে বাস্তবিক ব্রহ্মই হয়।

অবশ্য এই পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে পারা যায় যে, উপাসনাদি দ্বারা বদ্ধ-জীব ত্রিগুণময়ী মায়ার সীমা অতিক্রম করিতে পারে। কিন্তু তথাপি সে ঈশ্বরের রাজ্যভুক্ত থাকে, এবং যদিও ঈশ্বরের তুল্য ঐশ্বর্য্য লাভ করে, তথাপি সৃষ্টি, স্থিতি, লয়,—এই তিন ঐশ্বরিক কার্য্যে তাহার অধিকার হয় না।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

তে এতাং মায়াং তরন্তি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ইহা বলেন না যে, তাহারা আমার স্বরূপ ধারণ করে।

আর যদি বল—নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যানদ্বারা উৎক্রমণ,—অর্থাৎ মৃত্যুর পর, "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি," তাহার উত্তর এই যে,—শ্রুতিতে তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিতেছেন যে,—"ন তেষাং প্রাণা উৎক্রামন্তি"—সেই সকল বিদ্বানের প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না।

জীব ব্রহ্মে পরিণত হইতে পারে, এই বলিয়া যে বিজ্ঞানাত্মবাচক শব্দকে পরমাত্মা বলিবে, তাহা সঙ্গত হয় না। যখন পরিণত হইল, তখন ত ব্রহ্মই হইল।

এই জন্য কাশকৃৎস্ন ঋষি বলিতেছেন—"অবস্থিতেঃ"।

পরমাত্মা জীবাত্মাতে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছেন।

"দ্বাবেব সুপর্ণা সযুজা সখায়ৌ"—দেহসংঘাত মধ্যে নিত্য অবস্থিতি করিতেছেন। বিজ্ঞানাত্মায় পরমাত্মা এরূপভাবে অবস্থিত যে,—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা কেবল পরমাত্মারই দর্শন হয়। দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্তজ্ঞানের লোপ হইলে, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা কেবলমাত্র পরমাত্মা অনুভূত হন্। দেহাদিজ্ঞান না থাকিলে, অংশজ্ঞানের লোপ

হয়। তখন অংশী—যিনি অংশে নিত্য অবস্থিত—স্বয়ং প্রকাশিত হন্—"বাসুদেবঃ সর্ব্বং"।

এই নিত্য অবস্থিতির জন্য, জীবাত্মদর্শনে কেবল পরমাত্মদর্শনই হয়, এবং জীবাত্মশব্দও অধিষ্ঠাতা পরমাত্মায় প্রযুজ্য।

সকল আত্মাতেই পরমাত্মা অবস্থিতি করিতেছেন। এই জন্য আত্মা শব্দে মৈত্রেয়ী শ্রুতিতে পরমাত্মা বুঝিতে হইবে।

অতি সঙ্কুচিতচিত্তে, চকিতহৃদয়ে, ত্রিসূত্রীর সিদ্ধান্ত শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষানুসারে উপস্থিত করিলাম। পাঠকবর্গ, আমার ধৃষ্টতা মাপ করিবেন।

এখন এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ স্বামীর কটাক্ষ পর্য্যালোচনা করিব।

প্রথমতঃ শঙ্করাচার্য্য।

১। পরমাত্মা বিজ্ঞানাত্মভাবে অবস্থান করেন। "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি"—এই ব্রাহ্মণ বাক্য তাহার প্রমাণ।

কিন্তু এই ব্রাহ্মণ বাক্যে "অনুপ্রবিশ্য" শব্দ আছে, এবং "জীবেন আত্মনা" অনুপ্রবেশ। পরমাত্মা জীবাত্মরূপে ঘটে ঘটে প্রবেশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের এই অর্থই স্বাভাবিক। ইহাতে জীবাত্মার স্বতন্ত্রতা নাই এ কথা বলা হয় নাই!

দ্বিতীয় মন্ত্রবর্ণ—"সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে।" আনন্দগিরি এই মন্ত্রবর্ণের এইরূপ অর্থ করেন—"সর্ব্বাণি রূপাণি কার্য্যাণি বিচিত্য সৃষ্ট্বা তেষাং নামানি চ কৃত্বা তেষু বুদ্ধ্যাদিষু প্রবিশ্য অভিবদনাদিকং কুর্ব্বন্ যো বর্ত্ততে।" পরমাত্মা সর্ব্বত্র অবস্থিত। তিনি বুদ্ধ্যাদিতে প্রবেশ করিবেন, সে কিরূপ কথা? জীবরূপে অবশ্য তিনি প্রবেশ করিতে পারেন। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণে এই কথাই বলা হইয়াছে।

২। জীবের পৃথক্ সৃষ্টি—ভূতাদির ন্যায় শ্রুতিতে কথিত নাই।

শ্রুতিতে এমন কিছু নাই যাহাতে পরমাত্মার বিকাররূপ জীব স্বতন্ত্র পদার্থ এরূপ অবধারিত হইতে পারে।

জীবের সৃষ্টি কথিত নাই। কারণ এই ব্রহ্মাণ্ডে জীবের সৃষ্টি হয় নাই। জীবপ্রবাহ অনাদি।

জীব যে স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহার অনেক শ্রুতি আছে। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও জীবপ্রকৃতির কথা বলিয়াছেন।

৩। কাশকৃৎস্নের মত এই যে, অবিকৃত পরমেশ্বরই জীব।

তবে "অবস্থিতি" কথার তাৎপর্য্য কি? এক পদার্থ অন্য পদার্থে অবস্থিতি করে।

৪। ভেদাভেদ, ভেদ ও অভেদ, এ তিনের মধ্যে অভেদই শ্রুতি-সম্মত। "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য ইহার প্রমাণ। "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য হইলেও তাহার অর্থ লক্ষণা লইয়া; সে অর্থ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে।

প্রণবই সকল বেদের বীজ। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। প্রণবে ব্যষ্টি ও সমষ্টি অবস্থাত্রয়ে নিঃশ্বাসের ন্যায় নিত্য উদ্ভূত ও নিত্য তিরোহিত হইতেছে। যদি প্রণব সত্য হয়, তাহা হইলে, 'অ' 'উ' 'ম'—তিনই সত্য। আর যদি 'অ' 'উ' 'ম' সত্য হয়, তাহা হইলে ব্যষ্টি, সমষ্টি দুই সত্য। ব্যষ্টি, সমষ্টি দুই সত্য হইলেও প্রণবরূপে সকলই এক। "ওঁকারমাত্রং সচরাচরং জগৎ।" অভেদ সত্য বটে। কিন্তু সে অভেদ প্রণবের সহিত, সে অভেদ ব্রহ্মের সহিত; কারণ সকলই ব্রহ্ম। জীব-কল্পিত, জগৎ-কল্পিত ব্রহ্মমাত্র বস্তুতে কেবল বিবর্ত্ত মাত্র। এরূপ অভেদ শ্রুতি বাক্যে নাই।

"তত্ত্বমসি" মহাবাক্য প্রণবের সহিত মিলিত করিয়া অর্থ করিতে হইবে।

৫। বিকারাত্মক জীব আপন প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হইলে, কে আর অমৃতত্ব লাভ করিবে?

জীবের যদি সত্তাই না থাকে, জীব যদি কাল্পনিক হয়, তাহা হইলে কে অমৃতত্ব লাভ করিবে ?

৬। জীবের নাম ও রূপ উপাধিগত।

এ কথা চৈতন্যদেবও স্বীকার করেন।

এই সকল যুক্তিদ্বারা বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ পারমার্থিক নহে—এইরূপ বেদান্তের সিদ্ধান্ত হয়।

দেখান হইয়াছে, এ সকল যুক্তি অখণ্ডনীয় নহে।

৮। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্"—সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি এক ছিলেন—একথা সকলেই স্বীকার করেন।

"আত্মৈবেদং সর্ব্বম্"—"ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্"—"ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা।"

একথা সকলেই স্বীকার করেন। ইহা দ্বারা কল্পিত ভেদ প্রমাণ হয় না

"নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা"—ইহাও সত্য।

"বাসুদেবঃ সর্ব্বম্", "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি", "সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং।" যাঁহারা গীতা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বলিবেন যে, গীতার বাক্য কাল্পনিক ভেদের প্রমাণ বলিতে শঙ্করাচার্য্যের কোন অধিকার নাই।

৯। ভেদদর্শনের অপবাদ বাক্য—"অন্যোসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুঃ", "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি ইহ নানেব পশ্যতি।" এ সকল বাক্য দুই পক্ষেই সম্ভব।

সকলই ঈশ্বর। ঈশ্বরেরই অংশ। "একাংশেন স্থিতং জগৎ।"

আমি ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র—আমি অন্য, ঈশ্বর অন্য—সকল পুরুষই ভিন্ন ভিন্ন—এইরূপ জ্ঞানই মৃত্যুর কারণ। ঈশ্বরের অংশ—এইরূপ জ্ঞান অমৃতত্বের কারণ। সেই অংশজ্ঞান পরিত্যাগ করিলে সকলই মৃত্যুরূপ।

১০। আত্মা বিকারশূন্য। "আত্মাঽজরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চৈতন্যদেবের মতে দেহেন্দ্রিয়াদি আত্মার উপাধি। "দেহে আত্মজ্ঞান এই বিবর্ত্তের স্থান।" দেহ বিকারী। আত্মা বিকার-শূন্য। এ বিষয়ে শঙ্করের সহিত চৈতন্যদেবের মতভেদ নাই।

১২। ভেদ কল্পিত না হইলে, মুমুক্ষুর নিরপবাদ জ্ঞান হয় না ও তাহার অর্থও সুনিশ্চিত হয় না।

এই কথা শঙ্করাচার্য্য বলেন, এবং এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্রুতিরও উল্লেখ করেন—"তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।" গীতাতে স্থিতপ্রজ্ঞের যে লক্ষণ দেওয়া আছে, তাহাও উদাহরণ স্বরূপ বলেন। "বেদান্ত-বিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থঃ।" যদি ভেদজ্ঞানই থাকিল, তাহা হইলে সুনিশ্চিত অর্থ কিরূপে হইল।

যদি এই নানাত্বের মধ্যে এক ঈশ্বরের অনুভব করা যায়, তাহা হইলে কি নিরপবাদ বিজ্ঞান হয় না? "দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি"—অবশ্য এ কথা সকলে স্বীকার করে। সকলই ঈশ্বর,—এ জ্ঞান হইলে, দ্বিতীয়ের জ্ঞান কোথায় থাকিল? যাহা কিছু দেখিতেছি, সকলই ঈশ্বর এই এক জ্ঞান, এবং যাহা কিছু দেখিতেছি, সব মিথ্যা—এ অন্য জ্ঞান।

জগৎ যদি মিথ্যা হয়, জীব যদি মিথ্যা হয়, জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, যদি না থাকে, তবে বুদ্ধদেবের শূন্যবাদ কি দোষ করিল? সৎ, চিৎ, আনন্দের তাৎপর্য্য কি? কি লইয়া আনন্দ? কিসের জ্ঞান? জীবের স্বরূপে অবস্থিতির অর্থ কি? মুমুক্ষুর স্বরূপে অবস্থিতির নাম যদি তাহার ব্রহ্ম সমুদ্রে অস্তি-লোপ, তাহা হইলে মুমুক্ষুর কি এল, গেল? মুমুক্ষুর নিরপবাদ জ্ঞানের নাম কি জ্ঞানাভাব? তাহার সুনিশ্চিত অর্থের তাৎপর্য্য কি অর্থাভাব? যেখানে জীব নাই জগৎ নাই, সেখানে জ্ঞানই বা কি, অর্থই বা কি?

নির্গুণ ব্রহ্মে মুমুক্ষুর সাযুজ্য মুক্তি হইতে পারে না, এ কথা আমরা

বলি না। নির্গুণ ব্রহ্মে মুমুক্ষুর স্বরূপে অবস্থিতি সম্ভব। তবে ইহা দ্বারা এ কথা প্রতিপন্ন হয় না যে, সগুণ ব্রহ্ম নাই, জগৎ নাই, জীব নাই,—এ সকল কেবল মিথ্যা কল্পনা। নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ ব্রহ্মেরই বিশেষ হীন ভাব। ইহাই চৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত। তিনি নির্গুণ ব্রহ্মের অস্বীকার করেন না। কিন্তু সগুণ ব্রহ্মও স্বীকার করেন। তিনি ভেদ স্বীকার করেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলেন, সে ভেদ ব্রহ্মাত্মক—ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। তিনি ভেদ কল্পিত—এ কথা স্বীকার করেন না।

এই মাত্র চৈতন্যদেবে ও শঙ্করাচার্য্যে ভেদ।

১৩। ভেদবাদীর মোক্ষকার্য্য ও অনিত্য।

যাহা কার্য্য তাহা অনিত্য স্বীকার করি।

কিন্তু মোক্ষ নিত্য হউক অনিত্য হউক, চৈতন্যদেবের শিক্ষা-অনুসারে মোক্ষ অতীব তুচ্ছ পদার্থ।

ভেদ-অঙ্গীকার মোক্ষের জন্য নহে—সেবার জন্য। জগতের সেবা এবং সেই সেবা দ্বারা জগতে ঈশ্বরের সেবা। যে সেবক নহে, যে সেবক হইতে চাহে না, সে অনিত্য মোক্ষলাভ করুক, বা নিত্য নির্ব্বাণমুক্তিলাভ করুক—জগতের পক্ষে একই কথা। সেবকের ভেদপ্রবাহ নিত্য, সে কোন শরীরে, বা কোন অধিকারে নিত্যসেবা করিতে পারিবে।

দ্বিতীয়তঃ রামানুজাচার্য্য।

১। সূর্য্যকিরণ যেরূপ সূর্য্য হইতে উদ্ভূত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে যদি জীব উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে বিষম সৃষ্টি হইতে পারে না।

ইহার উত্তর এই যে—আদি সৃষ্টির কথা বলা হয় না। জীবসৃষ্টি অনাদি। রামানুজ এ কথা স্বীকার করেন। প্রলয়ে যদিও জীব সকল পুরুষে মিলিত হয়, যদিও প্রকৃতি অব্যাকৃত অবস্থায় পরিণত হয়, তথাপি জীবের সংস্কার অব্যাকৃত প্রকৃতিতে বীজস্বরূপ থাকে এবং সেই সংস্কারগত

চৈতন্য প্রসুপ্তভাবে ঐশ্বরিক চৈতন্যের সহিত মিলিত হইলেও, সৃষ্টিকালে, সংস্কার পরিচ্ছিন্ন হয়। যেমন সুষুপ্তি অবস্থায় জ্ঞানের তারতম্য থাকে না, তথাপি সংস্কারবশতঃ জাগ্রৎ অবস্থায় জ্ঞানের তারতম্য হয়। প্রলয়ের অদ্বয় জ্ঞান, সংস্কারবশতঃ বিভিন্ন জ্ঞান হয়। এইজন্যই বিষম সৃষ্টি। ভেদাভেদ-মতে বিষম সৃষ্টির বাধ হয় না।

২। জীব যদি ব্রহ্মের কার্য্য হয়, তাহা হইলে মুক্তি-অবস্থায় জীব ব্রহ্মে লীন হইবে। বিনাশরূপী মোক্ষে কি লাভ ?

জীব অবশ্য ব্রহ্মের কার্য্য, এবং জীব ব্রহ্মে লীন হইতেও পারে। তবে মুক্তিলাভ করিলেই যে জীব লীন হইবে এমন নহে। সাযুজ্য মুক্তি ভক্ত ও জ্ঞানীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যে ইচ্ছা করে না, তাহার সাযুজ্য হয় না। যে ইচ্ছা করে তাহার হইতে পারে।

৩। শঙ্করাচার্য্যের অপারমার্থিক বা কাল্পনিক ভেদ সম্বন্ধে রামানুজ যাহা বলিয়াছেন, চৈতন্যদেব সে যুক্তি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন।

৪। রামানুজের সিদ্ধান্ত, জীব, চিৎ বা আত্মা অন্তর্যামী পরমেশ্বরের শরীর।

শরীর শরীরী হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। শরীর কখনও শরীরীর সহিত এক হইতে পারে না। "নদ্যঃ সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি" হইতে পারে না। "সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ" হইতে পারে না। শরীর ও শরীরীর সম্বন্ধে তত্ত্বমসি বলা চলে না।

"অহং বীজপ্রদঃ পিতা"—ভগবানের বীজ কি ভগবানের শরীর মাত্র ?

আমাদের শেষ অবস্থা, আমাদের নিদান, আমাদের চরম কি, ভগবানের শরীর মাত্র ?

শরীরে আবার নিজত্ব কি ? শরীরের আবার সত্তা কি ?

রামানুজের সিদ্ধান্ত রামানুজের কাছে থাকুক। মনুষ্যের অভিমান আছে। সেই অভিমানের বন্যায় রামানুজের সিদ্ধান্ত একবারে ভাসিয়া যাউক। শ্রুতি, স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকুক। তাহারা একবাক্যে রামানুজের সিদ্ধান্ত অস্বীকার করিবে।

পণ্ডিতবর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, সন্ন্যাসি-শ্রেষ্ঠ প্রকাশানন্দ, তোমরা যদি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য করিয়া যাইতে, তাহা হইলে চৈতন্যের চরম সিদ্ধান্তে এতদিন জগৎ আলোকিত হইত। কিংবা যদি ছয় গোস্বামীর মধ্যে একজন এ বিষয়ে ধ্যান দিতেন, তাহা হইলে জ্ঞানের ভাণ্ডার সম্পূর্ণ হইত।
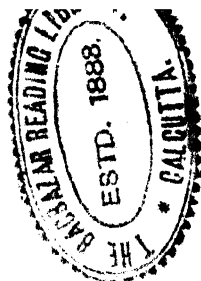
ব্রহ্মসূত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পরিণাম ও অদ্বৈতবাদ।

The first adhyaya has proved that all the Vedanta texts unanimously teach that there is only one cause of the world, viz. Brahman, whose nature is intelligence, and that there exists no scriptural passage which can be used to establish systems opposed to the Vedanta, more specially the Sankhya system. The task of the two first padas of the second adhyaya is to rebut any objections which may be raised against the Vedanta doctrine on purley speculative grounds apart from scriptural authority, and to show, again on purely speculative grounds, that none of the systems irreconcilable with the Vedanta, can be satisfactorily established.

Thibaut.

প্রথম অধিকরণ—১-২ সূত্র

সাংখ্য-স্মৃতি অবলম্বন করিতে হইলে অন্য স্মৃতি ত্যাগ করিতে হয়।

দ্বিতীয় অধিকরণ—৩য় সূত্র

সেইরূপ যোগ-স্মৃতি অবলম্বন করিলেও অন্য স্মৃতির সহিত বিরোধ হয়। তাৎপর্য্য কেবল প্রধান বলিয়া ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব লইয়া।

তৃতীয় অধিকরণ—৪-১১ সূত্র

ধর্ম্মজিজ্ঞাসায় কেবলমাত্র শ্রুতিপ্রমাণ সম্ভবপর হইতে পারে। কারণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিধি নিষেধ কেবল শাস্ত্র দ্বারাই জানিতে পারা যায়। কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় কেবলমাত্র শ্রুতির দোহাই মানিব কেন? গোটাকতক উপনিষদ্বাক্য উদ্ধৃত করিয়া সাংখ্যবাদীকে নিরস্ত করিল। কিন্তু যুক্তি ত হার মানিল না। ব্রহ্মত কেবল শ্রোতব্য নয়, মন্তব্যও বটে। এখন ব্রহ্ম হ'ল চেতন পদার্থ। জগৎ হ'ল জড় পদার্থ। এই বৈলক্ষণ্য থাকিতে ব্রহ্ম কিরূপে জগতের উপাদান কারণ হইতে পারে? আর তোমার শ্রুতিতেও জগৎকে জড় বলে।

"ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ"—চতুর্থ সূত্র।

পঞ্চম সূত্রের সূচনায়, শঙ্করাচার্য্য সনাতন ধর্ম্মের এক মহৎ সত্যের উল্লেখ করিতেছেন। ভাষ্যকারের ভাষায় আমি সেই সত্য পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

"শ্রুত্যা জগতশ্চেতনপ্রকৃতিকতাং তদ্বলেনৈব সমস্তং জগৎ চেতনং ইত্যবগমিষ্যামি প্রকৃতিরূপস্য বিকারেঽন্বয়দর্শনাৎ।"

বেদদ্বারায় জানা যায় যে, জগৎ চেতন-প্রকৃতি-বিশিষ্ট এবং প্রকৃতির রূপ, সেই প্রকৃতির বিকারে দেখা যায়। এইজন্য সমস্ত জগৎ চৈতন্যময়।

"অবিভাবনং তু চৈতন্যস্য পরিণামবিশেষাৎ ভবিষ্যতি।"

তবে যে, কোন পদার্থে চৈতন্যের বিভাবন অর্থাৎ স্ফুর্ত্তি হয় না, সে কেবল কোন পরিণামবিশেষের জন্য; অর্থাৎ জড় পদার্থের এরূপ প্রাকৃতিক পরিণাম যে, সেই পরিণামের জন্য চেতনতা প্রকট হইতে পারে না।

"যথা স্পষ্টচৈতন্যানাং অপি আত্মনাং স্বাপমূর্চ্ছাদ্যবস্থাসু চৈতন্যং ন বিভাব্যতে এবং কাষ্ঠলোষ্ট্রাদীনামপি চৈতন্যং ন বিভাবয়িষ্যতে।"

যাহারা স্পষ্টচৈতন্য, যেমন মনুষ্যাদি, তাহাদেরও চৈতন্য নিদ্রা কিংবা মূর্চ্ছা আদি অবস্থায় অপ্রকট হয়। সেইরূপ কাষ্ঠ ও লোষ্ট্র আদি পদার্থেরও চৈতন্য অপ্রকট থাকে।

"অন্তঃকরণান্যপরিণামত্বাৎ সতোঽপি চৈতন্যস্য অনুপলব্ধিঃ"—

আনন্দগিরি।

অন্তঃকরণ দ্বারাই চৈতন্যের উপলব্ধি হয়। যেখানে অন্তঃকরণ পরিণাম থাকে না, সেখানে চৈতন্যের উপলব্ধি হইতে পারে না। জড়পদার্থে অন্তঃকরণ নাই, এইজন্য চৈতন্যের উপলব্ধি হইতে পারে না।

এ কথা সত্য হইলেও ইহা বলা চলে যে, ব্রহ্ম শুদ্ধ, জগৎ অশুদ্ধ। শুদ্ধ পদার্থ হইতে অশুদ্ধ পদার্থের কিরূপে উৎপত্তি হইতে পারে? আর যদিও শ্রুতিতে পৃথিবী আদিকে চেতন বলা হইয়াছে, তথাপি "অভিমানী" শব্দের ব্যবহার আছে; যেমন "পৃথিব্যভিমানিনা দেবতা", "আকাশাভিমানিনী দেবতা।"

"অভিমানি-ব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্"—পঞ্চম সূত্র।

কিন্তু ব্যাসদেব বলিতেছেন—"দৃশ্যতে তু"

পূর্ব্বপক্ষী যে বলে এক স্বভাবের কারণ হইতে অন্য স্বভাবের কারণ উদ্ভুত হইতে পারে না, সে কথা প্রামাণিক নহে। কারণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, চেতন মনুষ্যের শরীর হইতে অচেতন কেশ-নখাদির উদ্ভব হয়, এবং অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিকাদির শরীর নির্ম্মিত হয়। কারণ ও কার্য্য কখনও এক রূপ হয় না, তবে কোন না কোন সাম্য থাকে। সেইরূপ ব্রহ্ম ও জগতে অস্তিত্ব বা সত্তার সমানতা আছে।

আর এক কথা দৃষ্ট পদার্থের উদাহরণ রূপাদিশূন্য ব্রহ্মে কিরূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে?

ব্রহ্ম মন্তব্য বটে। তাই বলিয়া যে কোন তর্ক তোমার বুদ্ধিতে আসে,

সেই তর্ক অনুসারে ব্রহ্মের মনন অভিপ্রেত নহে। ব্রহ্মের মনন শাস্ত্র অনুসারে মনন।

আর যদি বল, শুদ্ধ ব্রহ্ম অশুদ্ধ জগতের কারণ হইলে, বেদান্তীকে মানিতে হইবে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে অশুদ্ধ জগৎ ছিল না। কিন্তু বেদান্তের মতে কার্য্য সৎ। সৎকার্য্যবাদী বেদান্তী কিরূপে বলিবে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ছিল না।

"অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ"—সপ্তম সূত্র।

কার্য্য সর্ব্বদাই কারণাত্মক। উৎপত্তির পূর্ব্বে যদি কারণ থাকে ত কার্য্য থাকিবে না কেন? পূর্ব্বপক্ষী এ কথা বলিতে পারেন যে,

"অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্"—অষ্টম সূত্র।

প্রলয়কালে অশুদ্ধ জগৎ ব্রহ্মে লীন হইলে, জগতের অশুদ্ধি ব্রহ্মে অর্পিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রলয়ে অশুদ্ধির যদি নাশ হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার জগতের উৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে? তৃতীয়তঃ, মুক্ত জীবেরও পুনরুদ্ভব হইতে পারে? চতুর্থতঃ, আর যদি বল প্রলয়কালেও জগৎ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র থাকে, তাহা হইলে প্রলয় কিরূপে হইল?

"নতু দৃষ্টান্তাভাবাৎ"—নবম সূত্র।

বেদান্ত বাক্যের দৃষ্টান্ত আছে। পূর্ব্বপক্ষীর দৃষ্টান্ত নাই।

১। ঘটাদি নষ্ট হইলে মৃত্তিকা ঘটাদির সঙ্কীর্ণতা দোষে দূষিত হয় না। সুবর্ণ অলঙ্কার নষ্ট হইলে সুবর্ণই অবশিষ্ট থাকে।

আর কার্য্য দোষে যদি কারণ দূষিত হয়, তাহা হইলে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—তিন অবস্থাতেই কারণ দূষিত হইবে। কেবল প্রলয় অবস্থাতে কেন দূষিত হইবে? কার্য্য কারণের একতা ত সকল অবস্থাতেই আছে।

এই ত গেল ব্যাসদেবের সূত্র অনুযায়ী দৃষ্টান্ত। এই ত গেল সৎকার্য্য-বাদের দৃষ্টান্ত। এই ত গেল পরিণামবাদের দৃষ্টান্ত। এইজন্য যেখানে

পরিণামের কথা বলা হইয়াছে, সেখানে শঙ্করাচার্য্য কিছুই বলেন নাই। তিনি ব্যাসদেবের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। ভাষ্যকার ভাল রূপেই জানিতেন, ব্যাসের সিদ্ধান্ত পরিণাম। কিন্তু তাঁহার নিজের সিদ্ধান্ত বিবর্ত্ত। এইজন্য তিনি পরিণামবাদের কথা স্বয়ং অনেকস্থলেই লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে বিবর্ত্তবাদ স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যেখানে ব্যাসসূত্রের পরিণামবাদ ভিন্ন অন্য অর্থ হইতে পারে না, সেখানে তিনি কোনরূপ হঠতা দেখান্ নাই। কিন্তু যেখানে দুই পক্ষেই অর্থ করা যায়, সেখানে তিনি বিবর্ত্তবাদ অবলম্বন করিয়াছেন এবং রামানুজ পরিণাম-বাদ অবলম্বন করিয়াছেন।

এই সূত্রের আনুপূর্ব্বিক প্রসঙ্গে, পরিণামবাদ অভিপ্রেত, এইজন্য শঙ্করাচার্য্য অতি সাবধনতার সহিত বিবর্ত্তবাদের উল্লেখ করিতেছেন।

যে মত অনুসারে কি সৃষ্টি কি স্থিতি উভয় কালেই কার্য্য ও কার্য্যের ধর্ম্ম সকল অবিদ্যা দ্বারা অধ্যারোপিত, যে মত অনুসারে কার্য্যের সহিত কারণের সংসর্গ নাই, যে মত অনুসারে প্রলয়কালেও কার্য্যের সংসর্গ নাই, সেই মত অনুসারে এই অপর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। স্বয়ং ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজাল-মায়া বিস্তারিত করিয়া তিনকালেও সেই মায়া দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না, সেইরূপ পরমাত্মাও সংসার-মায়াদ্বারা সংস্পৃষ্ট হন্ না। কারণ, মায়া অবস্তু। স্বপ্নদ্রষ্টা জাগ্রৎ অবস্থায় স্বপ্নদর্শনরূপ মায়াদ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না; সেইরূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও'সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার সাক্ষী পরমাত্মা তিন অবস্থার ব্যভিচার দ্বারা সংস্পৃষ্ট হন্ না। পরমাত্মার অবস্থাত্রয়ে আত্ম-কর্ত্তৃক অবভাসন কেবলমাত্র মায়া; যেমন রজ্জুর সর্পাদিভাবে অবভাস। বেদান্তার্থ সম্প্রদায়বেত্তা গৌড়পাদ আচার্য্য এ বিষয়ে বলিয়াছেন,—

অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥

ব্যাসের সূত্রে পরিণামবাদ থাকিলেও, পরম্পরাগত দুই সাম্প্রদায়িক বেদান্তার্থ প্রচলিত ছিল। এক বোধায়নাদিক্রমে পরিণামবাদ, এক গৌড়পাদাদিক্রমে বিবর্ত্তবাদ। গৌড়পাদ শঙ্করাচার্য্যের পরম গুরু। তাঁহার পূর্ব্বে মায়াবাদ প্রচলিত ছিল কি না, জানি না। কিন্তু গৌড়পাদের অদ্বৈত জীবের অনুভবাত্মক অদ্বৈত। কোন জীব সাধনবলে মায়ার সীমা অতিক্রম করিয়া মুক্তির অবস্থায় জাগরিত হইলে, মায়ার দ্বৈতজ্ঞান অনুভব করে না। সে কেবল স্বরূপস্থ হইয়া কেবলমাত্র আত্মাকে অনুভব করে। আত্মাতে অবস্থিত হইয়া অদ্বয়, অখণ্ড আনন্দ অনুভব করে। এই আত্মানুভবাত্মক অদ্বৈতের সঙ্গে জগতের সত্যত্ব কি মিথ্যাত্বের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। শঙ্করাচার্য্য অনেকস্থলে এই অনুভবাত্মক অদ্বৈতবাদের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু স্থানে স্থানে এই অদ্বৈতবাদের সীমা অতিক্রম করিয়া জগৎ মিথ্যা, জীব মিথ্যা এই সর্ব্বনাশী অদ্বৈতবাদের অবতারণা করিয়াছেন।

চৈতন্যদেব জীবের অনুভবাত্মক অদ্বৈতবাদ স্বীকার করেন। ব্রহ্মসাযুজ্য বা নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত একত্ব অনুভব তাঁহার মতে অসম্ভব নহে, কিন্তু প্রার্থনীয় নয়। তবে জীবনাশী, জগৎনাশী অদ্বৈতবাদকে তিনি ভ্রান্ত মায়াবাদ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন।

রামানুজের কাছে অনুভবাত্মক অদ্বৈতবাদও ভ্রমমূলক। তাঁহার চিৎরূপী জীবের সাযুজ্য সম্পূর্ণ অসম্ভব। শরীর অনন্তকালের তরে শরীর থাকিবে এবং শরীরী শরীরী থাকিবেন।

২। প্রলয়কালের একতা হইতে নানাত্বময় জগৎ কিরূপে উদ্ভূত হইতে পারে? দৃষ্টান্ত, সুষুপ্তি কাল হইতে জাগ্রৎ অবস্থায় উদ্ভব।

শঙ্করাচার্য্যমতে মিথ্যাজ্ঞান ইহার কারণ।

৩। মুক্তের মিথ্যাজ্ঞান থাকে না। এই জন্য তাঁহার পুনরুৎপত্তি হইতে পারে না।

৪। প্রলয়কালে জগৎ নষ্ট হয় না—এ কথা বেদান্তীরা স্বীকার করেন না। এজন্য সে কথার প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না।

"স্বপক্ষদোষাচ্চ"—

সাংখ্যমত সম্বন্ধেও এই সকল তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে। সাংখ্য ও বেদান্ত—এই দুই মতের মধ্যে এক মত ত অভ্রান্ত হইবে। সাংখ্যমত ভ্রান্ত পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, অতএব বেদান্তমত অভ্রান্ত।

রামানুজ এই অধিকরণের ভাষ্য করিতে গিয়া নিজের শরীরবাদ প্রতিপন্ন করিতে অতিরিক্ত চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বনাশী বিবর্ত্ত ছাড়িয়া অন্য অংশে শাঙ্করভাষ্যই অবলম্বন করিব।

অনুভবাত্মক অদ্বৈতবাদ ও সর্ব্বনাশী অদ্বৈতবাদ।

একজন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু আমাকে বলেন যে, শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ আমার প্রবন্ধে প্রস্ফুটিত হয় নাই। আর একজন বলেন, আমার ভ্রম দ্বারা আমি ঐ মতকে বিকৃত করিয়াছি। কেহ কেহ বলেন আমি শঙ্করাচার্য্যের প্রতি বিদ্বেষভাব দেখাইয়াছি। অনেকের ধারণা আমি শঙ্করাচার্য্যের মত বুঝিতে পারি নাই।

অন্তর্যামী ভগবান্ জানেন, জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ ভাব নাই। অন্য অভিযোগগুলি সকলই সত্য হইতে পারে এবং সম্ভবতঃ সত্য।

তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, শঙ্করাচার্য্যের মত সত্য কিনা, সে সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলি নাই। বলিবার অধিকারও নাই। ঈশ্বর, জগৎ ও জীব মায়ার কল্পনা কিনা, তাহা ঈশ্বরপ্রণোদিত বেদবাক্য দ্বারা জানিবার উপায় নাই। ঈশ্বর অজ ও অনাদি। জগৎ ও জীবের প্রবাহও অনাদি; সেই প্রবাহ যদি মায়াময় হয়, যদি সেই প্রবাহের ঈশিতা মায়াময় হয়, তাহার শাস্ত্রপ্রমাণ অসম্ভব। কারণ যেখানে "শাস্ত্রযোনি"র আসন টলমল করে, সেখানে শাস্ত্র কি করিতে পারে? যদি সগুণ ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্মের বিবর্ত্তমাত্র হয়, তাহাতে শাস্ত্রের হানি হইতে পারে, ঈশ্বরত্বের হানি হইতে পারে, কাল, কর্ম্ম, স্বভাবের হানি হইতে পারে, কার্য্যকারণের অভাব হইতে পারে, ক্রমোদ্ভব ও ক্রমলয়ের কল্পনা তিরোহিত হইতে পারে, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান, উপাসনার ত্রিপুটি নাশ হইতে পারে, তথাপি জগতের সম্পূর্ণ বিবর্ত্ত, জীব ও ঈশ্বরব্যাপী বিবর্ত্ত অসত্য, একথা কেহ বলিতে পারে না।

অনুভবাত্মক অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য উপনিষদের দোহাই দিয়াছেন, শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বনাশী অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে তাঁহার একমাত্র বল যুক্তি। সে যুক্তি এই যে, জীব ও ঈশ্বর যদি মায়ার কল্পনা না হয়, তাহা হইলে মুক্তির অনবস্থা দোষ হয়। "মুক্তি" এই কথা কেবল মিথ্যা প্ররোচনা হয়।

জীব মরিলেই তাহার দেহ হইতে মুক্তি হয়। কিন্তু সে মুক্তি কোন্ কাজের মুক্তি? আবার কিছুকাল পরে পুনর্জন্ম হয়। আবার দেহের বন্ধন হয়।

স্বর্গকাম হইয়া যজ্ঞ করিলে, স্বর্গে অমর হয়। অমর হইয়া দেহবন্ধন বিমুক্ত জীব স্বর্গভোগ লাভ করে।

"অপাম সোমমমৃতা অভূম"।

শ্রীকৃষ্ণ বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন—

সে কেবল কথার কথা।

"ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপাঃ
যজ্ঞৈ রিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে," কিন্তু
"গতাগতং কামকামা লভন্তে।"

আচ্ছা, সকাম কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলাম, নিষ্কাম কর্ম্ম করিলাম, ভগবানের উপাসনা করিলাম, ব্রহ্মলোকে গমন করিলাম, এইবার ত মুক্তি লাভ করিলাম।

সে কি কথা? যতদিন ব্রহ্মার জীবন থাকিবে, ততদিনই ব্রহ্মলোক থাকিবে। যখন ব্রহ্মার জীবনের অবসান হইবে, তখন তুমি ব্রহ্মাণ্ডগত প্রকৃতির হাত হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

যা গেল! ব্রহ্মাণ্ডগত প্রকৃতি আবার কি? আবার অন্যরূপ প্রকৃতি আছে? কেন শুদ্ধ সত্ত্ব? বৈকুণ্ঠে সকলই শুদ্ধসত্ত্বময়। সেখানে

গেলে সত্য সত্যই মুক্তিলাভ। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

শাস্ত্রের কথা কে বিশ্বাস করিবে? এককালে স্বর্গ চরম ছিল। পরে মহর্লোক 'চতুর্থ'ও চরম হইল। পরে ব্রহ্মলোক চরম হইল। আবার "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ" হইয়া বৈকুণ্ঠলোক চরম হইল। শাস্ত্রের এ ধোঁকায় কে বিশ্বাস করিবে? ক্রমমুক্তির স্থিরতা নাই। ক্রম-মুক্তির ভরসা নাই। শাস্ত্রের চরমতা নাই। শাস্ত্রের সকল সিদ্ধান্তই "অরুন্ধতী ন্যায়ে"র সিদ্ধান্ত।

যদি মুক্তির এইরূপ অনবস্থা দোষ হয়, তাহা হইলে মুক্তি কেবল কল্পনামাত্র। আর মুক্তি যদি কল্পনা না হইয়া সত্য হয়, তাহা হইলে জগৎ, জীব ও ঈশ্বর কল্পনামাত্র। এই যুক্তি দ্বারা শঙ্করাচার্য্যের সর্ব্বনাশী অদ্বৈতবাদ metaphysical necessity হইয়া পড়ে। এ যুক্তি কেহ খণ্ডন করিতে পারেন নাই। কাজে কাজে শঙ্করাচার্য্যের সর্ব্বনাশী অদ্বৈতবাদ অসত্য একথা কেহ বলিতে পারেন না।

তবে উপনিষদে এই সর্ব্বনাশী অদ্বৈতবাদ নাই, ব্যাসের উপনিষৎ-সমন্বয়-রূপ শারীরক সূত্রে এই অদ্বৈতবাদ নাই। একথা রামানুজস্বামী প্রতিপন্ন করিয়াছেন; একথা চৈতন্য মহাপ্রভুও বলিয়াছেন এবং আজ থিব সাহেবও সেই কথা বলিতেছেন।

শাস্ত্রে এ অদ্বৈতবাদের কথা বলে না, বেদে এ অদ্বৈতবাদের কথা বলে না। বেদ ও শারীরক সূত্র মোচড়াইয়া এরূপ অর্থ বাহির করা অনুচিত।

শঙ্করাচার্য্যের সহিত চৈতন্যদেবের এইমাত্র বিবাদ।

অনুভবাত্মক অদ্বৈতবাদ উপনিষদে আছে, শারীরক সূত্রে আছে, পুরাণে আছে, এবং চৈতন্যদেবও সে অদ্বৈতবাদ স্বীকার করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত চৈতন্যদেবের মতে উপনিষদ্ ও গীতার প্রামাণিক ভাষ্য। ভাগবত পুরাণেও এই অনুভবাত্মক অদ্বৈতবাদের কথা আছে।

আত্মমায়ামৃতে রাজন্
পরস্যানুভবাত্মনঃ।
ন ঘটেতার্থ সম্বন্ধঃ
স্বপ্নদ্রষ্টু রিবাঞ্জসা॥ ২।৯।১

অনুভবাত্মক পরমাত্মার মায়া ব্যতিরেকে অর্থের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না। যতক্ষণ আমরা অনুভব করি, ততক্ষণ দ্বৈতের সহিত সম্বন্ধ থাকে। যখন আমরা অনুভব না করি, তখনই সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়।

স্বপ্নাবস্থায় আমাদের স্থূলদেহের সহিত বা স্থূলপদার্থের সহিত সম্বন্ধ থাকে না। কারণ স্বপ্নাবস্থায় আমরা সূক্ষ্মদেহ ও সূক্ষ্মজগতের অনুভব করি। এইরূপ জাগ্রৎ অবস্থায়, আমরা স্বপ্নাত্মক পদার্থের অনুভব করি না।

যখন আমরা একান্ত এই দেহের অনুভব করি না, তখন এই দেহের মৃত্যু হয়। তখন আমাদের নূতন অনুভবে দেহ মিথ্যা পদার্থ হয়।

ঈশ্বর জগতের অনুভব করিতেছেন বলিয়া জগতের প্রবাহ চলিয়া যাইতেছে। ঈশ্বর প্রলয়ানুভবে মগ্ন হইলেই, জগতের নাশ হয়। অনুভবের তারতম্যে নৈমিত্তিক প্রলয় কিংবা প্রাকৃতিক প্রলয় হয়।

জীবও ক্ষুদ্র ঈশ্বর। জীব যদি জগতের অনুভবকে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা একেবারে স্থান না দেয়, তাহা হইলে, জগৎ তাহার পক্ষে মিথ্যা হইবে, সে অদ্বৈতানুভবে স্থিত হইবে, ইহার আর বিচিত্রতা কি?

যদ্ বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি
নহি দ্রষ্টু দৃষ্টের্বি-পরিলোপো বিদ্যতে,

অবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি
ততোঽন্যদ্ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ ॥ বৃহদারণ্যক—৪-৩-২৩

যখন অদ্বৈতানুভব হয়, তখন জীবন্মুক্ত পুরুষ দেখিয়াও দেখেন না। দৃশ্য বিষয় সম্মুখে থাকিলেও তিনি দেখেন না। দ্রষ্টার দৃষ্টিশক্তির লোপ হয় না; কিন্তু তাঁহার অনুভবে সকলই আত্মময়। সেই অদ্বৈতানুভবে কোন ভেদ থাকে না, কোন বিভাগ থাকে না, কোন দ্বিতীয় পদার্থ থাকে না, যাহার তিনি অনুভব করিতে পারেন।

ঈশ্বরেও এই শক্তির নাশ হয় না। এই শক্তির বলে অনুভবদ্বারা জগৎ আছে, অনুভবদ্বারা জগৎ নাই। এই শক্তিই মায়া-শক্তি।

যত্রান্যদিব স্যাৎ তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেৎ। বৃঃ আঃ ৪-৩-৩১।

যখন অন্য পদার্থের অনুভব হয়, তখন অন্য অন্যকে দেখে। যখন সকলই আত্মময় হয়, তখন—

"সলিল একো দ্রষ্টাঽদ্বৈতো ভবতি।"

অনুভবসাপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব লইয়াই অনুভবাত্মক অদ্বৈতবাদ। অনুভব করি না করি,—জগৎ নাই, জীব নাই, ঈশ্বর নাই,—এরূপ অদ্বৈতবাদের অবতারণা উপনিষদে নাই, ব্রহ্মসূত্রে নাই, শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রে নাই। এই সর্ব্বনাশী অদ্বৈতবাদ ধর্ম্মের বিরোধী, কর্ম্মের বিরোধী, উপাসনার বিরোধী, ভক্তির বিরোধী। এই "অসৎ-শাস্ত্র মায়াবাদ খণ্ডন" করিবার জন্য পুরাণের উদ্যম, রামানুজাদি আচার্য্যের উদ্যম এবং মহাপ্রভু চৈতন্যদেবেরও উদ্যম। কিন্তু এ উদ্যম চৈতন্যদেবের অবান্তর উদ্যম। তাঁহার মুখ্য উদ্যমের কথা পরে বলিব। সেই মুখ্য উদ্যম সাধনার্থই তাঁহার শঙ্করাচার্য্যের প্রতি কটাক্ষ।

রস ও ভাব।

জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম। 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'—এই জিজ্ঞাসার উত্তরে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' বলিয়া যে ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, সেই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়কারী সগুণ ব্রহ্মকেই আমরা এখন ব্রহ্ম বলিব।

এই জগৎরূপ ক্ষেত্রে জীবরূপী ব্রহ্মের অংশ নিহিত রহিয়াছে। কেন? এই বিচিত্র ক্ষেত্রের বিচিত্র তাড়নায় অংশ সকলের অংশীর প্রতি এক ভাব প্রবাহিত হইবে বলিয়া,—অংশসকল অংশীকে জগতের প্রফুল্ল মধুগন্ধি পারিজাত কুসুম অর্পণ করিবে বলিয়া। এই ভাবপ্রবাহ এক বিচিত্র লীলা। এই লীলার জন্যই জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম। অনাদিকাল হইতে এই লীলার তরঙ্গ অনন্ত কালসমুদ্রে ভাসিয়া যাইতেছে। সেই লীলাতরঙ্গের বিচিত্র সঙ্গীতে দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এই লীলাপ্রবাহের ঊর্ম্মিমালা কখনও দৃশ্য, কখনও অদৃশ্য। এই দৃষ্ট ও অদৃষ্টের ধারা, এই অতীত, আগত ও অনাগতের স্রোত কোথা হইতে আরম্ভ হইয়াছে ও কোথায় গিয়া শেষ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? এই অনাদি ও অনন্তের প্রসঙ্গে, কেহ বলে—'যাছিলিরে ভাই তাই হবি তুই'; কেহ বলে—'কিছুই ছিলিনে, কিছুই হবিনে, সকলি মায়ার মোহ'; কেহ বলে—'তুই যুক্ত হবি স্তরে স্তরে, শেষে যাবি ব্রহ্মপুরে।' যেই যাহা বলুক্, জগদীশ্বরের এই অনন্তলীলা যে কিছুই নয়, এই স্থির নিয়মে আবদ্ধ ঘটনা-পরম্পরা যে মায়ার কুহকমাত্র, এই ভালবাসা-ময়, হৃদয়ের আবেগময়, পবিত্রতাময়, জীবের উদ্যম যে একটি সুদীর্ঘ স্বপ্ন, জগৎপিতার এই আশ্চর্য্য কারিগরী যে মরীচিকা ও আকাশকুসুম, ইহা শ্রবণ করিতেও হৃদয় কুণ্ঠিত হয়,—ইহা ধারণা করিতে গেলে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়।

জীব ও জগতের ইতিহাস এক লীলার কাহিনী। লীলাময় জগদীশ্বর এই লীলার একমাত্র নায়ক। জীব এই লীলার অসংখ্য নায়িকা। জগৎ এই লীলার রঙ্গক্ষেত্র। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥'—এই মন্ত্র লইয়াই জগতের বিচিত্র অভিনয়।

সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বতাড়িত জীব এমন স্থানে যাইতে চাহে, যেখানে দুঃখ নাই। জীবন-মরণের অনিবার্য্য ঠেলাঠেলিতে পরিতপ্ত জীব সংসরণ অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিতে চাহে। এই ভাব—এই সুখ ও অমৃতলাভের অতৃপ্তবাসনা, নীচ হইতে উপরে উঠিয়া ভগবান্‌কে আক্রমণ করে। ভগবান্ তখন 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' এই মন্ত্র অনুসরণ করিয়া ভাবের উপযোগী লীলামূর্ত্তি ধারণ করেন এবং এই ভাবের পূর্ণ পরিস্ফূর্ত্তি-রূপ শক্তি আশ্রয় করিয়া জীববাসনার কেন্দ্রস্থল হন। সেই মূর্ত্তি হিরণ্যগর্ভ মূর্ত্তি। সেই শক্তি সাবিত্রী শক্তি। সবিতৃমণ্ডল (Solar System) মধ্যবর্ত্তিনী সেই শক্তি অবলম্বন করিয়া জীব ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারে এবং সেখানে গেলে 'ন স পুনরাবর্ত্ততে, ন স পুনরাবর্ত্ততে, ন স পুনরাবর্ত্ততে।'

> ন যত্র শোকো ন জরা ন মৃত্যু
> র্নার্ত্তি র্নচোদ্বেগ ঋতে কুতশ্চিৎ।
> যচ্চিত্ততোদঃ কৃপয়াঽনিদং বিদাং
> দুরন্তদুঃখপ্রভবানুদর্শনাৎ॥
>
> ভা, পু, ২-২-২৭

> পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি
> ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।—পুরুষ-সূক্ত
> 'আদিত্যমণ্ডলান্তঃস্থা ব্রহ্মলোকগতা শুভা।'—গায়ত্রী-ধ্যান।

ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের এই চরম। ব্রাহ্মণভাবের এই ভজন। এই সুখদুঃখময় দ্বন্দ্বপূর্ণ জগতে জীবের অত্যুৎকৃষ্ট ভাব ব্রাহ্মণভাব। ভগবান্ হিরণ্যগর্ভরূপে এই ভাবকে ভজনা করেন। এই ভজনার শক্তি সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী সাবিত্রী। ব্রহ্মলোকে গিয়া ভক্ত জানিতে পারেন যে, যদিও সে লোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন নাই, যদিও সে লোকে জরামৃত্যুরহিত অমৃতত্বলাভ হয়, তথাপি সেখানেও ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্কীর্ণতা আছে। সেখানে ঐশ্বর্য্য সঙ্কীর্ণ, জ্ঞানও সঙ্কীর্ণ। যাঁহারা ক্রমমুক্তির দ্বার দিয়া ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ব্রহ্মার জীবনের অবসানে তাঁহারা ব্রহ্মলোকের সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন এবং অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরের বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিয়া জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ বিকাশলাভ করিতে পারিবেন। তখন তাঁহাদের জানিবার আর কিছুই বাকি থাকিবে ন। অনন্তকোটী জগৎব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদের করতলগত হইবে।

"যে সকল জীব ব্রহ্মলোকে গমন করে, তাহারা তিন প্রকার গতি লাভ করে। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা উৎকৃষ্ট পুণ্যবলে সেখানে গমন করে, তাহারা পুণ্যের তারতম্য অনুসারে কল্পান্তরে নূতন জগতে ঋষি কিংবা দেবতার অধিকার লাভ করে। যাহারা হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনাবলে ব্রহ্মলোকে গমন করে, তাহারা ব্রহ্মার জীবনকাল পর্য্যন্ত সেই লোকে অবস্থান করে, পরে ব্রহ্মার সহিত মুক্তিলাভ করে। কিন্তু যাহারা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর ভগবানের উপাসনা করে, তাহারা স্বেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া, সেই বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করে।" (ভাগবতের ২-২-২৮ শ্লোকের উপর শ্রীধর স্বামীর টীকা)। যখন ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ গম্ভীর নিনাদ করিয়া বলিলেন, 'তদ্ধাম পরমং মম', তখনই ভক্তিমার্গে, জ্ঞানমার্গে, ধর্ম্মমার্গে আর একটি দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। ভক্ত বৈকুণ্ঠের ভাব হৃদয়ে ধারণ করিলেন। অমনি 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব

ভজাম্যহম্'—এই প্রতিজ্ঞার বশে ভগবান্ লক্ষ্মীনারায়ণরূপে ভক্তের হৃদয়ে বিরাজ করিলেন। লক্ষ্মীর কৃপায় ভক্ত তখন সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়া, সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য অবগত হইয়া, বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণের সহিত সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীদেবী সম্বিৎ-শক্তির পরাকাষ্ঠা।

জ্ঞানের স্তরে, স্তরে, ঐশ্বর্য্যের প্রতি সোপানে—জীব, লক্ষ্মী ও নারায়ণ লইয়া এক অত্যাশ্চর্য্যময় বিচিত্র মহালীলার অভিনয় হইতেছে। এই লীলার আর অবসান দেখা যায় না। এই লীলায় জগৎ মাতিয়া রহিয়াছে। হায়! ঐশ্বর্য্যের জন্য, জ্ঞানের জন্য ভগবান্‌কে ভজন! ভগবানের জন্য ভগবান্‌কে কি কেহ ভজনা করিবে না? হাঁগো, বিশ্বই কি এত মধুর, জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যই কি এত মধুর? যাঁহার মধুরতায় বিশ্ব মধুর, যাঁহার মধুরতায় জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য মধুর, তিনি কি কাহারও কাছে মধুর হইবেন না? সৎ ও চিৎ, সন্ধিনী ও সম্বিৎ, ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞানের মধ্য দিয়া আনন্দ দেখিয়া কি ভুলিয়া থাকিবে? আনন্দময়ের আনন্দমূর্ত্তির অদ্বয় আনন্দ কি কেহ আস্বাদ করিবে না? কেন, ইচ্ছা করিয়াই ত তাঁকে দূরে রাখিয়াছ। ইচ্ছা করিয়াই তাঁকে বড় করিয়াছ। তুমি তাঁহাকে বড় বলিয়া ভাবনা করিয়াছ, তাই তিনি বড়। তাঁহার কি বড় হইবার সাধ? তাঁহার কি অভিপ্রেত যে তাঁহারই অংশ জীব তাঁহার জন্য তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবে না এবং তিনিও আপন রসরাজমূর্ত্তিতে তাঁহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দিবেন না?

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত।
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥

আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি॥
আপনারে বড় মানে আমারে সমহীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন-জ্ঞানে করে লালন-পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড়লোক তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥—চৈঃ চঃ-আদি-৪

তবে সেই মধুর হইতে মধুরকে জীব কেন না ভালবাসিবে? কেন তাহাদের 'মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ' না হইবে? যদি কাহারও না হয়, তবে গোপগোপীদের এইরূপ মনের ভাব হইবে।

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ
স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং
শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যু র্ভোজপতে র্বিরাড়বিদুষাং
তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো
রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥ ভা, পু, ১০-৪৩-১৭

যাহারা তাঁহার সহিত মল্লের ন্যায় যুদ্ধ করিতে চাহে, তাহাদের পক্ষে

তিনি অশনিস্বরূপ। সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে তিনি রাজা। স্ত্রীভাবে যাহারা তাঁহাকে ভজনা করে, তিনি তাঁহাদের পক্ষে মূর্ত্তিমান্ কন্দর্পস্বরূপ। গোপদিগের তিনি স্বজন। অসৎ রাজাদিগের তিনি শাস্তা। তিনি পিতামাতার কাছে শিশু। কংসের তিনি মৃত্যু। যাহারা মূর্খ তাহাদিগের নিকট তিনি সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় সঙ্কীর্ণ। যোগীদিগের নিকট তিনি পরতত্ত্ব।

তবে তিনি গোপগোপীদের নিকট কোন্ রূপে আবির্ভূত হইবেন? সেই গোপগোপীভাবের প্রতিভাব তাঁহার কি হইবে? যখন গোপীরা তাঁহাকে পতি বলিয়া ডাকিবে, তখন কোন্ মূর্ত্তিতে তিনি তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবেন? যখন গোপবালকেরা সখাভাবে তাঁহার স্কন্ধে উঠিতে চাহিবে, তখন কোন্ বেশে তিনি তাহাদের নিকট দাঁড়াইবেন?

এইবার ভগবান্‌কে নিজের আনন্দময়রূপ ধারণ করিতে হইবে। সেই আনন্দ হইতে অজস্র রসের ধারা প্রবাহিত হইতেছে। মধুররসেই সকল রসের পর্য্যবসান হইতেছে। এক এক রস এক এক ভাবকে আশ্রয় করিতেছে। জীবের নিকট হইতে শুদ্ধ বাৎসল্যভাব প্রবাহিত হইতেছে। অমনি ভগবানে বাৎসল্যরসের ফোয়ারা ছুটিতেছে। সখা সখ্যভাবে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছে, অমনি সখ্যরস ছুটিতেছে। ভাবের উপর ভাব, যখন শ্রীমতীর মহাভাব ভগবান্‌কে আকুলিত করিতেছে, তখন সকল রস একত্রীভূত করিয়া সান্দ্রঘন রসরাজ মূর্ত্তি সেই মহাভাবের প্রতিদান করিতেছেন। এই রসরাজ ও এই মহাভাব বিশ্বজগতের চরমলীলা। সেই লীলা যদি নিত্য না হয়, তাহা হইলে জীবের সত্তা কেন? দ্বন্দ্বের আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়াই কি তাহার একমাত্র ভাগ্য? মেষের ন্যায় চক্ষু মুদিয়া আমি নাই বলিয়াই কি তাহার সত্তার শেষ? এই সুখদুঃখের মিশ্রভাবই কি তাহার প্রধান অবলম্বন—অবশেষে সুখদুঃখবিহীন, নির্গুণ, স্বাদশূন্য,

রসশূন্য ব্রহ্মসমুদ্রে পতন! সে ব্রহ্মসমুদ্রে জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় নাই। সেখানে আর জীব থাকিল কোথায়?

নিরাশার এই কাতর রোদনে ভগবান্ স্থির থাকিতে পারিলেন না। রসরাজ ও মহাভাব এক নিত্যতত্ত্ব, এই কথা জীবকে জানাইবার জন্য, জীবের নীরস হৃদয় চিররসে আপ্লুত করিবার জন্য, জীবে মহাভাব জাগরিত করিবার জন্য, একাধারে রসরাজ ও মহাভাব মূর্ত্তিতে ভগবান্ চৈতন্যদেহে আবির্ভূত হইলেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব জগৎকে জানাইলেন, মায়াবাদ শাস্ত্রসম্মত নহে। মায়াবাদ লইয়া জীবকে ব্যথিত-হৃদয় হইবার প্রয়োজন নাই।

রসরাজ ও মহাভাব নিত্য, শুদ্ধ ও সত্য। রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব জগতের চরম-তত্ত্ব ও চরম সত্য। এই শিক্ষা দৃঢ় করিবার জন্য, প্রেমে জগত মাতাইবার জন্য, মহাভাবের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া রসরাজের প্রতি নির্গুণ প্রেম-ভক্তি হুহুশব্দে প্রবলবেগে প্রধাবিত করাইবার জন্য, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। মায়াবাদে প্রেমভক্তি শুকাইয়া যায়, রসরাজের আস্বাদন হইতে জীব বঞ্চিত হয় এবং মহাভাবের উৎস একেবারে অবরুদ্ধ হয়। তাই বিষ্ণুপুরাণে, শ্রীমদ্ভাগবতে, মহাপ্রভুর শিক্ষায় মায়া ভগবানের শক্তি। মায়াবাদ লইয়া শুষ্ক অদ্বৈতজ্ঞান, শক্তিবাদ লইয়া সরস প্রেমভক্তি। একের লক্ষ্য নির্গুণ ব্রহ্ম, অন্যের লক্ষ্য রসরাজ মূর্ত্তিতে ভগবান্।

ভগবান্ ভক্ত হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন, জীব হইতে দূরে নহেন। তাই ভগবৎপ্রেম বিতরণের জন্য, জীবকে সরস করিবার জন্য, কর্ষণকারী কৃষ্ণের আকর্ষণ মধ্যে সকলকে ফেলাইবার জন্য, রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরূপ এক মহাসমুদ্র। সেই মহাসমুদ্রে সমগ্র জীব মগ্ন আছে। কিন্তু সেই মহাসমুদ্র মধ্যে জগৎ অসংখ্য বাঁধ দিয়াছে, এবং মায়াশক্তির বিচিত্র রচনা বিবিধ দ্বীপ

ও দেশ নির্ম্মাণ করিয়াছে। প্রেমসমুদ্রে গভীর নিমগ্ন হইয়া ভক্ত সেই সমুদ্র মধ্যে মায়ার রচনা দেখিতে পান্ এবং তখন সেই রচনার মধ্যে গিয়া প্রেম-সমুদ্রে প্রেমবারি অজস্র সেচন করেন। সেই অজস্র সেচনে কত রচনা ভাঙ্গিয়া যায়, গলিয়া যায়। ভক্তের হৃদয়ও সেই সঙ্গে গলিয়া গিয়া ভগবান্‌কে আশ্রয় করে এবং ভক্ত অদ্বয় আনন্দ-চিন্ময় রসের আস্বাদন করে।

এই প্রেমসমুদ্রের প্রেমবারিদ্বারা জগৎ প্লাবিত করিবার জন্যই শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীশ্রীচৈতন্য-কথা।

—:*:—

দ্বিতীয় খণ্ড।

—:*:—

মাধবেন্দ্রপুরী।

কোন মহাপুরুষ আগমন করিবার অনতিপূর্ব্বে তাঁহার মহিমার ছটা গগনে প্রতিভাত হয়। কি জানি কোন্ এক নূতন ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। সে ভাব অস্ফুট হইলেও এক নূতন আশার সৃষ্টি করে। তখন আশার মোহিনী শক্তি এক কল্পনার রাজ্য বিস্তার করে। সেই কল্পনার রাজ্য নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া অবশেষে অভাবনীয় সত্যে পরিণত হয়।

চাঁদের আলোকে অভ্যস্ত জীব চাঁদনীর মায়ায় ভুলিয়া থাকে। বিজ্ঞানের ভেল্‌কিতে মোহিত মানুষের কাছে দেবতা, ঋষি, বেদ এমন কি ভগবান্ পর্য্যন্ত অস্তমিত হন। জীব আপনার প্রতিভাবলে কত কি ভাঙ্গে গড়ে, প্রকৃতি লইয়া কত কি খেলা করে, প্রতিপদে আত্মবল প্রতীক্ষা করে এবং তর্কের ঝঞ্ঝায় সতত সত্যকে অসত্যে ও অসত্যকে সত্যে বিক্ষিপ্ত করে।

তথাপি এই চাঁদের আলোকের পরই সূর্য্যের আলোক প্রকাশ পায়। গভীর অমানিশায় যখন মানুষ অজ্ঞানতিমিরান্ধ, তখন সে ভগবান্‌কে জানিবার প্রয়াসও করে না এবং সত্যমিথ্যার বিচারেও সমর্থ হয় না।

তাই দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জগতে যখন শশিশোভনা গতঘনী পূর্ণিমা

রজনীর বিকাশ হয়, তখনই প্রভাত-কল্পা শর্ব্বরী দিবার শুভ্র আলোকে নিমীলিত হয়।

আর চাঁদের আলোক ভাল লাগে না। কি জানি কোথা হইতে সেই আলোকে অসম্পূর্ণতা আসিয়া পড়ে। মনে হয়, আরও কিছু সত্য আছে। মনে হয়, দর্শন ও বিজ্ঞান হয়ত সত্যের শেষ দ্বার উদ্ঘাটিত করিতে পারে নাই। মনে হয়, হয়ত বেদবাক্যে কিছু বা আছে, হয়ত দেবতা আছেন, হয়ত বেদমার্গে ঈশ্বরকে জানিতে পারা যায়।

তাই চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা ও নবদ্বীপের বিশ্ববিদ্যালয়—গুরু ও শিষ্যমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তখন বিদ্যার চর্চ্চায়, শাস্ত্রের আন্দোলনে, ন্যায়ের বিতণ্ডায় অসংখ্য চতুষ্পাঠী প্রতিধ্বনিত হইত এবং বিদ্যার্থিগণ অভূতপূর্ব্ব উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া পূর্ব্বপক্ষ ও অপর-পক্ষের বাদ-প্রতিবাদে নিযুক্ত হইত। বিশেষ করিয়া ঐ সময়ে নবদ্বীপে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিত-মণ্ডলীর অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছিল।

নবীন উৎসাহে পুরাতন স্মৃতি ভাঙ্গিয়া নূতন স্মৃতি, পুরাতন ন্যায় ভাঙ্গিয়া নব্য ন্যায়, পুরাতন তন্ত্রের রস নির্য্যাস করিয়া নূতন তন্ত্র গঠিত হইতেছিল। ধর্ম্মই কি কেবল মঙ্গলচণ্ডীর গীতে ও বিষহরির পূজায় পর্য্য-বসিত থাকিবে? পণ্ডিতগণ কেবল কি খণ্ডনই করিতে থাকিবেন? মণ্ডনের কি কোন উপায় হইবে না?

"যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তাহারা তো না জানয়ে গ্রন্থ অনুভব॥
* * * *
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বহি গুণ কারো না করে কথন॥"

চৈতন্যভাগবত আদি—২।

সেই সন্ধিক্ষণে ভাবী নূতন ধর্ম্ম-সংস্থাপনের পূর্ব্ব-সূচী মাধবেন্দ্রপুরী আবির্ভূত হন।

জয় জয় মাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর।
ভক্তি কল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর॥

চৈতন্যচরিতামৃত। আদি—৯।

'ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র—সূত্রধার'।
গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বারে বার।

চৈতন্যভাগবত, আদি—৬।

যে সময়ে না ছিল চৈতন্য অবতার।
বিষ্ণু-ভক্তিশূন্য সব আছিল সংসার।
তখনেও মাধবেন্দ্র চৈতন্য কৃপায়।
প্রেম-সুখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসেন সদায়॥
নিরবধি দেহে রোমহর্ষ, অশ্রু, কম্প।
হুঙ্কার, গর্জ্জন, মহাহাস্য, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম॥
নিরবধি গোবিন্দের ধ্যানে নাহি বাহ্য।
আপনেও না জানেন কি করেন কার্য্য॥

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

লোক দেখি দুঃখ ভাবে শ্রীমাধব পুরী।
হেন নাহি, তিলার্দ্ধ সম্ভাষা যারে করি॥
সন্ন্যাসীর সনে বা করেন সম্ভাষণ।
সেহো আপনারে মাত্র বোলে 'নারায়ণ'॥
এ দুঃখে সন্ন্যাসিসঙ্গে না কহেন কথা।
হেন স্থান নাহি, কৃষ্ণভক্তি শুনি যথা

'জ্ঞানী যোগী তপস্বী বিরক্ত' খ্যাতি যার।
কারো মুখে নাহি দাস্য-মহিমা প্রচার॥
যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে।
তারা সব কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে॥
দেখিতে শুনিতে দুঃখী শ্রীমাধবপুরী।
মনে মনে চিন্তে—বনবাস গিয়া করি॥

*　　*　　*

এতেক সে বন ভাল এ সব হইতে।
বনে কথা নহে অবৈষ্ণবের সহিতে॥

—চৈতন্য-ভাগবত। অন্ত্য ৪

এরূপ একান্ত ভক্তের কাছে শ্রীকৃষ্ণ কতদিন লুক্কায়িত থাকিতে পারেন? বন ভ্রমণ করিতে করিতে মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত। বৃন্দাবন-বিহারি! এখনও কি দাসকে উপেক্ষা করিতে পার?

পূর্ব্বে শ্রীমাধবপুরী আইলা বৃন্দাবন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা গিরি গোবর্দ্ধন॥
প্রেমে মত্ত নাহি তাঁর দিবা-রাত্রি জ্ঞান।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাহি স্থানাস্থান॥
শৈল পরিক্রমা করি গোবিন্দকুণ্ডে আসি।
স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি॥
গোপাল-বালক এক দুগ্ধভাণ্ড লইয়া।
আসি আগে ধরি কিছু বলিলা হাসিয়া॥
পুরী! এই দুগ্ধ লইঞা কর তুমি পান।
মাগি কেনে নাহি খাও কিবা কর ধ্যান॥

বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইল সন্তোষ।
তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোগ শোষ॥
পুরী কহে কে তুমি কাঁহা তোমার বাস।
কেমনে জানিলে আমি করি উপবাস॥
বালক কহে গোপ আমি এই গ্রামে বসি।
আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসী॥
কেহ মাগি খায় অন্ন কেহ দুগ্ধাহার।
অযাচক জনে আমি দিয়েত আহার॥
জল লৈতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি গেলা।
স্ত্রীসব দুগ্ধ দিয়া আমাকে পাঠাইলা॥
গোদোহন করিতে চাহি শীঘ্র আমি যাব।
আর বার আসি এই ভাণ্ডটী লইব॥
এত বলি বালক গেলা না দেখিয়ে আর।
মাধবপুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার॥
দুগ্ধপান করি ভাণ্ড ধুইয়া রাখিল
বাট দেখে সেই বালক পুনঃ না আইল॥
বসি নাম লয় পুরী নিদ্রা নাহি হয়।
শেষরাত্রে তন্দ্রা হৈল বাহ্য বৃত্তি লয়॥
স্বপ্নে দেখে সেই বালক সম্মুখে আসিয়া।
এক কুঞ্জে লইয়া গেলা হাতেতে ধরিয়া॥
কুঞ্জ দেখাইয়া কহে আমি কুঞ্জে রই।
শীত-বৃষ্টি দাবাগ্নিতে বড় দুঃখ পাই॥

* * *

বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন॥
তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার॥
শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্দ্ধনধারী।
বজ্রের স্থাপিত আমি ইহাঁ অধিকারী॥
শৈল উপর হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া।
ম্লেচ্ছ ভয়ে সেবক আমার গেল পলাইয়া॥
সেই হইতে রহি আমি এই কুঞ্জস্থানে।
ভাল হৈল আইলা আমা কাঢ় সাবধানে॥
এত বলি' সে বালক অন্তর্দ্ধান কৈল।
জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল॥
কৃষ্ণকে দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে।
এতবলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে॥

—চৈতন্যচরিতামৃত। মধ্য ৪

শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হইবেন, তাই ভক্তের অপেক্ষা করিতেছিলেন। জীব-ভাবে ও কৃষ্ণভাবে কত পার্থক্য! কৃষ্ণ আনন্দময়। জীবের প্রেমানন্দ তাঁহার বাসভূমি। মধুর বংশীরবে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের জল, স্থল, অন্তরীক্ষ প্রেমময় করিয়াছিলেন. ব্রজবাসীর ত কথাই নাই। সেই বংশীর কলনিঃস্বন, 'ইতররাগবিস্মারণং নৃণাম্'। কেবলই কৃষ্ণ-অনুরাগে ব্রজবাসীর হৃদয় পরিপূর্ণ থাকা চাই। তবে ত শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রকট থাকিবেন। তবে ত বৃন্দাবন হইতে প্রেমের স্রোত বহিয়া জগৎ প্লাবিত করিবে।

হায়, ম্লেচ্ছের ভয়ে গোপাল-সেবক গোপালকে গভীর বনে রাখিয়া পলায়ন করিলেন। ব্রজে আর প্রেমভাব থাকিল না।

কবে ভক্ত আসিয়া প্রেমের প্রদীপ জ্বালিবে? কবে ভক্তের সহিত ভগবান্ মিলিত হইবেন? গোবর্দ্ধনে গোপাল-প্রতিষ্ঠা কেবল নিমিত্ত মাত্র। মাধবেন্দ্র প্রেমের হৃদয় কৃষ্ণকে অর্পণ করিলেন; কৃষ্ণ প্রেম ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। আবার বৃন্দাবন প্রেমপূর্ণ হইল। রূপ সনাতনের জন্য প্রেমসিক্ত স্থান গঠিত হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের জন্য, অন্যান্য গোস্বামীদিগের জন্য, ভক্তমণ্ডলীর জন্য নানাবিধ উত্তেজনা ও প্রেমের উদ্দীপ্ত প্রেরণা রচিত হইতে লাগিল।

মাধবেন্দ্র কর্তৃক বৃন্দাবনের কার্য্য শেষ হইল। এখন নবদ্বীপে, শান্তিপুরে, নীলাচলের পথে, পুরুষোত্তমক্ষেত্রে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত করিয়া রাখার প্রয়োজন। তবে ত চৈতন্যমূর্ত্তির আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণ এই সকল স্থানে প্রেমের বৃক্ষ পুষ্পিত করিবেন এবং প্রেমের সৌরভে জগৎ উন্মাদিত করিবেন।

তাই মাধবেন্দ্রকে আদেশ হইল, তুমি নীলাচলে গমন কর।

> একদিন পুরী গোসাঞি দেখিল স্বপন।
> গোপাল কহে পুরী আমার তাপ নাহি যায়॥
> মলয়জ-চন্দন লেপ তবে সে জুড়ায়॥
> মলয়জ আন গিয়া নীলাচল হৈতে।
> অন্য হৈতে নহে তুমি চলহ ত্বরিতে॥—চৈতন্যচরিত, মধ্য ৪

ঠাকুরের লীলা বুঝা ভার। চন্দনলেপ কথার কথা। গোপালের ইচ্ছা নয় যে, মাধবেন্দ্র চন্দন লইয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার ইচ্ছা, পুরী গোস্বামী শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যকে আত্মরহস্তে দীক্ষিত করেন, এবং প্রেমের বীজে জলসেক করিবার জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। কারণ, অদ্বৈত আচার্য্য ভক্তমণ্ডলী লইয়া কতকটা প্রেমভাবের পূর্ব্বরাগ না করিলে মহাপ্রভুর আবির্ভাবই যে হইতে পারে না! মাধবেন্দ্র নীলাচল পর্য্যন্ত

মহাপ্রভুর জন্য পথ হইতে প্রেমবিরোধী কণ্টকবৃক্ষ সকল কতক পরিমাণে উৎপাটিত করেন, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়।

প্রভুর আজ্ঞা পালনের জন্য মাধবেন্দ্র নিজের বার্দ্ধক্য ও আতুরতার উপর একবারও লক্ষ্য করিলেন না। অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে তিনি পূর্ব্বদেশে দিয়া ভাসিয়া পড়িলেন।

শান্তিপুর আইলা শ্রীল অদ্বৈতের ঘরে।
পুরীর প্রেম দেখি আচার্য্য আনন্দ অন্তরে॥
তাঁর ঠাই মন্ত্র লৈল যতন করিয়া।
চলিলা দক্ষিণে পুরী তাঁরে দীক্ষা দিয়া॥

—চৈতন্যচরিত, মধ্য ৪

মাধবেন্দ্র মহা ভাগ্যবান্ ভক্ত। রেমুনার গোপীনাথ তাঁহার জন্য ক্ষীর চুরি করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ যে তাঁহাকে কত কথা স্বপ্নে বলিয়াছিলেন, তাহা কে জানে? তবে এ কথা নিশ্চিত যে, মাধবেন্দ্রের প্রিয় শিষ্যগণ জানিতেন যে, সত্বর নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইবে।

"শুন শ্রীনিবাস! গঙ্গাদাস! শুক্লাম্বর!
করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ব-নয়ন-গোচর॥
সভা উদ্ধারিব কৃষ্ণ, আপনে আসিয়া।
বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোমা সভা লৈয়া॥

* * *

এইমত অদ্বৈত বোলেন অনুক্ষণ॥
"আসিতেছে এই মোর প্রভু চক্রধর।
দেখি বা কি হয় এই নদীয়া ভিতর॥
করাইমু কৃষ্ণ সর্ব্ব-নয়নগোচর।
তবে সে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর॥

আর দিন কথো গিয়া থাক ভাই সব।
এথাই দেখিবা সব কৃষ্ণ অনুভব॥"

—চৈতন্যভাগবত, আদি ২

মাধবেন্দ্রের প্রিয় শিষ্য ঈশ্বরপুরী চৈতন্যদেবের অধ্যাপনাকালে অলক্ষিতে তাঁহাকে দেখিতে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন।

চাহেন ঈশ্বরপুরী প্রভুর শরীর।
সিদ্ধপুরুষের প্রায় পরম গম্ভীর॥
জিজ্ঞাসেন "তোমার কি নাম বিপ্রবর।
কি পুঁথি পড়াও পড়, কোন্ স্থানে ঘর?"
শেষে সভে বলিলেন "নিমাঞি পণ্ডিত!"
"তুমি সে!" বলিয়া বড় হৈলা হরষিত॥

—চৈতন্যভাগবত, আদি ৭

নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্রের শিষ্য ছিলেন না। তথাপি তিনি তাঁহার প্রতি গুরুভাব করিতেন এবং মাধবেন্দ্রও নিত্যানন্দকে সকল রহস্য কথা বলিয়াছিলেন।

মাধবেন্দ্র সঙ্গে যত হইল আখ্যান।
কে জানয়ে তাহা, কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ॥

* * *

মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরুবুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়॥

—চৈতন্যভাগবত, আদি ৬

নিত্যানন্দ জানিতেন যে, চৈতন্যদেবের জন্মমাত্রই শ্রীকৃষ্ণ সেই দেহে প্রকট হইবেন না, এবং যতদিন শ্রীকৃষ্ণ সেই দেহে প্রকট না হন, ততদিন তিনি নবদ্বীপ যাইবার ইচ্ছামাত্র প্রকাশ করেন নাই।

নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছে গুপ্তভাবে,
ইহা নিত্যানন্দ স্বরূপের মনে জাগে ॥
"আপন ঐশ্বর্য্য প্রভু প্রকাশিবে যবে।
আমি গিয়া করিমু আপন সেবা তবে ॥"
এই মানসিক করি নিত্যানন্দ রায়।
মথুরা ছাড়িয়া নবদ্বীপে নাহি যায় ॥

* * *

বৃন্দাবন আদি করি ভ্রমে নিত্যানন্দ।
যাবত না আপনা' প্রকাশে গৌরচন্দ্র ॥

—চৈতন্যভাগবত, আদি ৬

নিত্যানন্দ।

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ভক্তবৃন্দের মধ্যে কয়েকটি অসাধারণ মহাপুরুষ ছিলেন। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরিদাস, রামানন্দ, স্বরূপদামোদর ও গদাধর তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান।

রাঢ়দেশে একচাকা গ্রামে নিত্যানন্দপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন। প্রবাদ আছে যে, যে দিন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইদিন রাঢ়ে থাকিয়া নিত্যানন্দ প্রভু অতি উচ্চৈঃস্বরে হুঙ্কার করিয়াছিলেন।

যে দিনে জন্মিলা নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র।
রাঢ়ে থাকি হুঙ্কার করিলা নিত্যানন্দ॥ চৈ-ভা-আদি ৬

তাঁহার খেলা ছিল কেবল কৃষ্ণলীলা। শিশু সঙ্গী লইয়া তিনি কেবল মাত্র কৃষ্ণলীলার অভিনয় করিতেন।

সভে বোলে নাহি দেখি হেন মত খেলা।
কেমনে জানিল শিশু এত কৃষ্ণলীলা॥ চৈ, ভা, আদি ৬

যখন নিত্যানন্দের বয়স দ্বাদশ বৎসর তখন একজন সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার পিতার নিকট এইরূপ ভিক্ষা করিলেন—

ন্যাসী বোলে করিবাঙ তীর্থ পর্য্যটন।
সংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ॥
এই যে সকল জ্যেষ্ঠ নন্দন তোমার।
কথোদিন লাগি দেহ সংহতি আমার॥
প্রাণ অতিরিক্ত আমি দেখিব উহানে।
সর্ব্বতীর্থ দেখিবেন বিবিধ বিধানে॥ চৈ, ভা, মধ্য ৩

দ্বাদশবর্ষীয় বালক এইরূপে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া বিংশতি বৎসর তীর্থযাত্রায় কালাতিপাত করেন। অবশেষে তিনি নবদ্বীপে আসিয়া চৈতন্য-দেবের সহিত মিলিত হন। এই বিংশতি বৎসরের কাহিনী এক অপূর্ব্ব রহস্য। তাঁহার ভক্তির মহাভাবও অসাধারণ। তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে তিনি গুহক চণ্ডালের স্থানে গমন করিয়া এবং চণ্ডালরাজের ভক্তি স্মরণ করিয়া, তিনদিন আনন্দে অচেতন ছিলেন।

শ্রীপর্ব্বতে এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর রূপে দুইজন বাস করিতেন। তাহাদের গূঢ় রহস্য কেহই অবগত ছিলেন না। তাঁহারা পরম আদরে নিত্যানন্দকে ভিক্ষা দিলেন।

পরম আদরে ভিক্ষা দিলেন প্রভুরে।
হাঁসি নিত্যানন্দ দোঁহাকারে নমস্করে॥
কি অন্তর কথা হৈল, কৃষ্ণ সে জানেন।
তবে নিত্যানন্দ প্রভু দ্রাবিড়ে গেলেন॥

নিত্যানন্দ কেবল মাত্র বদরিনাথের দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হন নাই। তিনি রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিবার জন্য পবিত্র বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া-ছিলেন, এবং অত্যন্ত নির্জ্জনে সেই আশ্রমে বাস করিয়া আশ্রমাধিকারী ব্যাস ঋষির সহিত গোপনে রহস্য আলাপ করিয়াছিলেন।

বদরিকাশ্রম গেলা পরম আনন্দ॥
কথোদিন নর-নারায়ণের আশ্রমে।
আছিলেন নিত্যানন্দ পরম নির্জ্জনে॥
তবে নিত্যানন্দ গেলা ব্যাসের আলয়।
ব্যাস চিনিলেন বলরাম মহাশয়॥
সাক্ষাৎ হইয়া ব্যাস আতিথ্য করিলা।
প্রভুও ব্যাসেরে দণ্ড প্রণত হইলা॥

দৈবযোগে মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ হয়, এবং কতিপয় দিন তিনি তাঁহার সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণ করেন। অবশেষে সকল তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া নিত্যানন্দ মথুরায় প্রত্যাগমন করেন।

এইমত তীর্থ ভ্রমি নিত্যানন্দরায়।
পুনর্ব্বার আসিয়া মিলিলা মথুরায়॥
নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি।
কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবারাতি॥
আহার নাহিক—কদাচিৎ দুগ্ধপান।
সেহো যদি অযাচিত কেহো করে দান॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছে গুপ্তভাবে।
ইহা নিত্যানন্দ স্বরূপের মনে জাগে॥
"আপন ঐশ্বর্য্য প্রভু প্রকাশিব যবে।
আমি গিয়া করিমু আপন সেবা তবে॥"
এই মানসিক করি নিত্যানন্দ রায়।
মথুরা ছাড়িয়া নবদ্বীপে নাহি যায়॥
নিরবধি বিহরয়ে কালিন্দীর জলে।
শিশু সঙ্গে বৃন্দাবনে ধূলাখেলা খেলে॥ চৈ, ভা, আদি ৬

যখন চৈতন্যদেব প্রকট হইয়া শ্রীবাসের মন্দিরে কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং যখন তাঁহার ঐশ্বরিক ভাব দিন দিন নবদ্বীপে প্রকাশিত হইতে লাগিল, তখন আর নিত্যানন্দ মথুরায় থাকিতে পারিলেন না। এক প্রবল আকর্ষণে তিনি নবদ্বীপের পথে ধাবিত হইলেন। চৈতন্য মহাপ্রভুও মনে মনে জানিলেন যে, নিত্যানন্দ আসিতেছেন।

এইমত বৃন্দাবনে বৈসে নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র॥

নিরন্তর সংকীর্ত্তন পরম আনন্দ।
দুঃখ পায় প্রভু না দেখিয়া নিত্যানন্দ॥
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর প্রকাশ।
যে অবধি লাগি করে বৃন্দাবনে বাস॥
জানিঞা আইলা ঝাট নবদ্বীপ পুরে।
আসিয়া রহিলা নন্দন-আচার্য্যের ঘরে॥

এদিকে মহাপ্রভু তাঁহার আগমনের পূর্ব্ব হইতেই বলিতে লাগিলেন—

আরে ভাই! দিন দুই তিনের ভিতরে।
কোন মহাপুরুষ এক আসিব এথারে॥

একদিন তিনি ভক্তবৃন্দকে বলিলেন—

হেন বুঝি, মোর চিত্তে লয় এই কথা।
কোন মহাপুরুষেক আসিয়াছে এথা॥
পূর্ব্বে মুঞি বলিয়াছোঁ তোমা সভার স্থানে।
কোন মহাজন সনে হৈব দরশনে॥
চল হরিদাস! চল শ্রীবাস পণ্ডিত।
চাহ গিয়া দেখি কে আইলা কোন ভিত॥

শ্রীবাস ও হরিদাস নবদ্বীপের ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করিলেন। কোন মহাপুরুষের উদ্দেশ পাইলেন না। অবশেষে তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে এবিষয় নিবেদন করিলেন। তখন মহাপ্রভু সকলকে সঙ্গে লইয়া নন্দন-আচার্য্যের গৃহে গমন করিলেন।

বসিয়া আছয়ে এক পুরুষ রতন।
সভে দেখিলেন—যেন কোটি-সূর্য্যসম॥
অলক্ষিত-আবেশ—বুঝন নাহি যায়।
ধ্যান সুখে পরিপূর্ণ, হাসয়ে সদায়॥

মহাভক্তিযোগ প্রভু বুঝিয়া তাঁহার।
গণ-সহ বিশ্বম্ভর হৈলা নমস্কার ॥
সম্ভ্রমে রহিলা সর্ব্বগণ দাণ্ডাইয়া।
কেহো কিছু না বোলয়ে রহিল চাহিয়া ॥
সম্মুখে রহিলা মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ—প্রাণের ঈশ্বর ॥ চৈ, ভা, মধ্য ৩

মাধবেন্দ্র আগমনী গাইয়া চলিয়া গেলেন। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রভুর কার্য্যে যোগদানের জন্য থাকিয়া গেলেন। এই কার্য্যের জন্য নিত্যানন্দকে নরনারায়ণ ঋষির আশ্রমে যাইতে হইল, ব্যাসদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইল, শ্রীপর্ব্বতে ব্রাহ্মণের চরণ আশ্রয় করিতে হইল।

বিশ্বরূপ।

চৈতন্যলীলার অভিনয়ে নায়ক নায়িকার অভাব নাই। প্রতাপশালী মহারাজ, প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিত, প্রেমময় ভক্ত, জ্যোতির্ম্ময় সন্ন্যাসী, আপন আপন তেজে সকলেই প্রদীপ্ত। যেখানে নয়ন যায়, সেইখানেই পরিতৃপ্ত। মন সর্ব্বত্র রসের সাগরে হাবুডুবু খায়। সকলই অদ্ভুত, সকলই অসাধারণ। কিন্তু এই বিচিত্র অভিনয় মধ্যে কেহ কি সেই ঊষা-বিভাষিত অরুণকিরণময়, মধুর হইতে মধুর, অর্দ্ধস্ফুট বিশ্বরূপের প্রতি একমনে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন? সে মধুরিমায় অমৃতধারা প্রবাহিত হয়, হৃদয় আপ্লুত হয়, এবং জগৎ কোমলতাময় হয়।

বিশ্বরূপ যেন বিশ্বম্ভরের জন্যই অবতীর্ণ। তাঁহারই অঙ্কে অবস্থিত হইয়া চৈতন্যদেব লীলা করিয়াছেন। তিনিই চৈতন্যদেবের মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। শয়নে-স্বপনে, দেহে বিদেহে চৈতন্যদেবই তাঁহার একমাত্র চিন্তা। কেমনে বিশ্বম্ভর স্থিরভাবে, বিনাবিঘ্নে আবেশ গ্রহণ পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট লীলা সুসম্পন্ন করিবেন, এই তাঁহার নিয়ত ভাবনা। যথাকালে তাঁহার প্রেরণাবাক্য, যথাকালে তাঁহার দৈববাণী। তিনি যে কে, জগৎকে দেখিবার জন্য তাহার অবকাশ দেন নাই। তবে এইমাত্র জানি যে, তিনি নিষ্কলঙ্ক শশী, দেবের দুর্ল্লভ মনুষ্য।

পিতামাতা কাহারে না করে প্রভু ভয়।
বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখিলে নম্র হয়॥
প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ ভগবান্।
আজন্ম বিরক্ত সর্ব্বগুণের নিধান॥

সর্ব্বশাস্ত্রে সবে বাখানেন বিষ্ণুভক্তি।
খণ্ডিতে তাঁহার ব্যাখা নাহি কারো শক্তি॥
শ্রবণে, বদনে, মনে, সর্ব্বেন্দ্রিয়গণে।
কৃষ্ণভক্তি বিনে আর না বোলে না শুনে॥
অনুজের দেখি অতি বিলক্ষণ রীত।
বিশ্বরূপ মনে গণে হইয়া বিস্মিত॥
"এ বালক কভো নহে প্রাকৃত ছাওয়াল।
রূপে আচরণে যেন শ্রীবালগোপাল॥
যত অমানুষী কর্ম্ম নিরবধি করে।
এ বুঝি, খেলেন কৃষ্ণ এ শিশু শরীরে॥"
এই মতে চিন্তে বিশ্বরূপ মহাশয়।
কাহারো না ভাঙ্গে তত্ত্ব, স্বকর্ম্ম করয়॥
নিরবধি থাকে সর্ব্ববৈষ্ণবের সঙ্গে॥
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥

* * *

ঊষাকালে বিশ্বরূপ করি গঙ্গাস্নান।
অদ্বৈত সভায় আসি হয় উপস্থান॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বাখানেন কৃষ্ণভক্তি সার।
শুনিঞা অদ্বৈত মুখে করেন হুঙ্কার॥ (চৈতন্যভাগবত)

একদিন বিশ্বরূপ পিতার সহিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সভায় গিয়াছিলেন।

এক ভট্টাচার্য্য বোলে "কি পঢ় ছাওয়াল!"
বিশ্বরূপ বোলে "কিছু কিছু সভাকার"।

বিশ্বরূপ সকল শাস্ত্রে প্রবীণ হইলেও বালক। এই জন্যই তিনি নম্রতার সহিত বলিয়াছিলেন, 'আমি কিছু কিছু সকল শাস্ত্রের জানি।'

জগন্নাথ মিশ্র মনে করিলেন, 'আমার পুত্র অহঙ্কারের কথা বলিতেছে। বাস্তবিক সে সকল শাস্ত্র জানে না। যাহা জানে, তাহাই বলা উচিত ছিল।' তিনি এইজন্য বিশ্বরূপকে শাসন করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ ব্রাহ্মণ-সভায় ফিরিয়া আসিলেন এবং নম্রতার সহিত জানাইলেন যে, তিনি বৃথা জল্পনা করেন নাই। পণ্ডিতেরা পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে, তিনি তিনবার তিন প্রকার উত্তর দিয়াছিলেন, এবং প্রতি উত্তর নিজেই খণ্ডন করিয়াছিলেন।

'পরম সুবুদ্ধি করি সবে বাখানিল।
বিষ্ণুমায়ামোহে কেহ তত্ত্ব না জানিল॥'

যে দিন তৈর্থিক ব্রাহ্মণের নিবেদিত অন্ন, বালক বিশ্বম্ভর দুইবার ভোজন করেন, সেদিন কেবলমাত্র বিশ্বরূপের চিত্ত-বিমোহন বাক্যে সেই ব্রাহ্মণ তৃতীয়বার রন্ধন করিয়াছিলেন।

না ভায় সংসার সুখ বিশ্বরূপ মনে।
নিরবধি থাকে কৃষ্ণ-আনন্দ কীর্ত্তনে॥
গৃহ আইলেও গৃহ-ব্যাভার না করে।
নিরবধি থাকে বিষ্ণুগৃহের ভিতরে॥
বিবাহের উদ্যোগ করয়ে পিতামাতা।
শুনি বিশ্বরূপ বড় মনে পায় ব্যথা॥
'ছাড়িব সংসার' বিশ্বরূপ মনে ভাবে।
চলিবাঙ বনে নিত্য এই মনে জাগে॥
ঈশ্বরের চিত্তবৃত্তি ঈশ্বর সে জানে।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা কথো দিনে॥
জগতে বিদিত নাম 'শ্রীশঙ্করারণ্য'।
চলিলা অনন্ত পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য॥

বিবাহের ভয়ে বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিলেন বটে। কিন্তু চিন্তা তাঁহার বিশ্বম্ভরের ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যৎ প্রকটের জন্যই ত তাঁহার জন্ম। তাই তিনি গৃহত্যাগের পূর্ব্বে অতি গোপনে আপনার মাতার নিকট একখানি পুস্তক রাখিলেন, এবং অনুনয় করিয়া বলিলেন, "মাতঃ, যখন বিশ্বম্ভর পাঠ সমাপন করিবে, তখন আপনি তাহাকে এই পুস্তকখানি দিবেন।"

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের প্রাক্কালে শচীদেবী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস, যথার্থ বল তুমিও কি সন্ন্যাসী হইবে? এই নিমিত্তই তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রদত্ত পুস্তক আমি চুল্লীতে দগ্ধ করিয়াছি।'

মহাপ্রভু বলিলেন, "মাতঃ, কিং পুস্তকং কথং বা প্রদীপিতং।" শচীদেবী বলিলেন,—'বিশ্বরূপ আমাকে কহিয়াছিল, "জননি! এই বিশ্বম্ভর বিজ্ঞ হইলে তাহাকে এই পুস্তকখানি দিবেন। আমি যত্নপূর্ব্বক সেইখানি রাখিয়াছিলাম; কিন্তু সেই বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ভাবিলাম, এই পুস্তক দেখিয়া পাছে বিশ্বম্ভরও সন্ন্যাসী হয়, এই আশঙ্কায় দগ্ধ করিয়াছি।"

চৈতন্যদেব ক্ষণকালের জন্য অনুতাপ করিয়া পরে সহাস্যবদনে বলিলেন, "জননি! যদিচ আপনি সাক্ষাৎ জ্ঞানময়ী, তথাপি পুত্রস্নেহে অজ্ঞানের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন।"

চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৪র্থ অঙ্ক।

পুস্তক ভস্মীভূত হইল বটে, কিন্তু বিশ্বরূপের ভ্রাতৃচিন্তা বিফল হইল না। তিনি নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরপুরীর দেহে নিজ তেজঃ বিন্যস্ত করিলেন। কারণ, চৈতন্যদেবের প্রথমতঃ যাহা আবশ্যক, ঈশ্বরপুরী তাহা তাঁহাকে দিবেন।

অস্যাগ্রজস্ত্বকৃতদারপরিগ্রহঃ সন্
সঙ্কর্ষণঃ স ভগবান্ ভুবি বিশ্বরূপঃ।

স্বীয়ং মহঃ কিল পুরীশ্বর মাপয়িত্বা
পূর্ব্বং পরিব্রজিত এব তিরোবভূব ॥

চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ১ম অঙ্ক।

'ইঁহার অগ্রজ, যিনি জগতে বিশ্বরূপ নামে বিখ্যাত ও যিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ সঙ্কর্ষণের অবতার, তিনিও দার পরিগ্রহ না করিয়া পূর্ব্বেই সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক আপন জ্যোতিঃ ঈশ্বরপুরীতে স্থাপন করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন।'

ঈশ্বরপুরী যখন গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রে বিশ্বম্ভরকে দীক্ষিত করিলেন, তখন তাঁহার জীবনের এক ঘোর সন্ধিস্থল। নবীন অনুরাগে উন্মত্ত হইয়া তিনি মথুরা যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। এদিকে তাঁহার ভবিষ্যৎ ভক্তবৃন্দ নবদ্বীপে পড়িয়া থাকিল। তিনি কাহাদিগের সাহায্যে সংকীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করিবেন, কিরূপে নাম সংকীর্ত্তন প্রচার করিবেন? এ সময়ে তাঁহাকে মথুরা গমনে কে নিষেধ করে?

মুরারি গুপ্ত বলেন, সেই সময়ে অশরীরী বাণী তাঁহাকে বলিল, 'এখন তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও।'

প্রাহাশরীরী নবমেঘনিস্বনা।
বাণী তমাহূয় চল স্বমন্দিরম্ ॥

বিশ্বম্ভরের প্রেরণাস্বরূপ নবমেঘনিস্বনা দৈববাণী অনেকবার হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, এ দৈববাণী কেবলমাত্র বিশ্বরূপের বাণী।

ঈশ্বরপুরীর সহিত বিশ্বম্ভরের গুরু শিষ্য সম্বন্ধ হইল। এজন্য পুরীগোস্বামী সতত বিশ্বম্ভরের সহচর হইতে পারেন না। বিশ্বরূপ নিশ্চিন্ত থাকিলেন না। তাঁহার অপর দেহরূপ নিত্যানন্দকে এইবার তিনি বিশ্বম্ভরের চিরসাথী হইবার জন্য প্রেরণা করিলেন।

বিশ্বম্ভর-শরীরে শ্রীকৃষ্ণের আবেশ ও বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাস—এই দুই লক্ষ্য

সম্মুখে রাখিয়া বিশ্বরূপ সতত বিশ্বম্ভরকে চালনা কিংবা তাঁহার সহায়তা করিয়াছেন। তাই তিনি নিত্যানন্দকে সাথী করিয়া দিয়া চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

একদিন নৈবেদ্য তাম্বুল খাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হইয়া॥
আস্তে-ব্যস্তে পিতা-মাতা মুখে দিলা পানি।
সুস্থ হৈঞা প্রভু কহে অদ্ভুত কাহিনী॥
এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লঞা গেলা।
সন্ন্যাস করহ তুমি আমারে কহিলা॥
আমি কহি আমার অনাথ পিতা মাতা।
আমিহ বালক সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা॥
গৃহস্থ হইয়া করিব পিতা মাতার সেবন।
ইহাতেই তুষ্ট হবেন লক্ষ্মীনারায়ণ॥
তবে বিশ্বরূপ ইহা পাঠাইলা মোরে।
মাতাকে কহিও কোটি কোটি নমস্কারে॥

চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা।

নিত্যানন্দ সাথী হইলে আর এরূপ স্বপ্নে কথা কহিবার প্রয়োজন থাকিল না।

"মূর্ত্তিভেদে জন্মিলা আপনে নিত্যানন্দ"—চৈতন্যভাগবত।

"হেনমতে বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
নিত্যানন্দ স্বরূপের অভেদ শরীর॥"
"নিত্যানন্দ চরিত্র দেখিয়া আই হাসে।
বিশ্বরূপ পুত্র হেন মনে মনে বাসে।

সেইমত বচন শুনয়ে সব মুখে।
মাঝে মাঝে সে-ই রূপ আইমাত্র দেখে॥
কাহারে না কহে আই, পুত্র-স্নেহ করে।
সম-স্নেহ করে নিত্যানন্দ-বিশ্বম্ভরে॥"

যখন মহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থিতি করিলেন, তখন বঙ্গদেশে ভক্তি প্রচারের জন্য নিত্যানন্দকে নিয়োজিত করিলেন। তখন দুই প্রভুর মধ্যে বিচ্ছেদ হইল। এইবার বিশ্বরূপ কি করিবেন? চৈতন্যগতপ্রাণ বিশ্বরূপ তদ্দণ্ডে পরমানন্দ পুরীকে মহাপ্রভুর নিকট প্রেরণ করিলেন। পুরীর আগমন-বার্ত্তা জানিয়া মহাপ্রভু মনে মনে বলিতে লাগিলেন—

অহো পরমানন্দপুরীশ্বরঃ তাবন্মুনীন্দ্রমাধবপুরীশ্বরস্য শিষ্যঃ, যত্র খলু অগ্রজস্য বিশ্বরূপস্য সমগ্রমৈশ্বরং তেজঃ প্রবিষ্টম্॥

চৈতন্যচন্দ্রোদয়।

'এই পরমানন্দ পুরীশ্বর, মুনীন্দ্র মাধবপুরীর শিষ্য, যাঁহাতে আমার অগ্রজ বিশ্বরূপের সমগ্র ঐশ্বরতেজ প্রবিষ্ট হইয়াছে।'

"দামোদর স্বরূপ, পরমানন্দপুরী।
শেষ খণ্ডে এই দুই সঙ্গে অধিকারী॥"
"পরমানন্দ পুরীরে প্রভুর বড় প্রীত।
পূর্ব্বে যেন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন দুই মিত॥
কৃষ্ণকথা বাক্যে বাক্যে রহস্য প্রসঙ্গে।
নিরবধি পুরী সঙ্গে থাকে প্রভু রঙ্গে॥"

পুরীগোস্বামীর কূপে জল ভাল ছিল না।

"পুরীবোলে 'প্রভু! বড় অভাগিয়া কূপ।
জল হৈল যেন ঘোল কর্দ্দমের রূপ'॥"
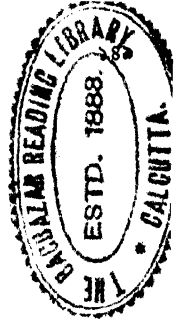
মহাপ্রভু দুই হাত তুলিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"মহাপ্রভু জগন্নাথ! মোরে এই বর।
গঙ্গা প্রবেশুক এই কূপের ভিতর।
ভোগবতী গঙ্গা যেন বহে পাতালেতে।
তাঁরে আজ্ঞা কর এই কূপে প্রবেশিতে॥"
"প্রভাতে উঠিয়া সভে দেখেন অদ্ভুত।
পরম-নির্ম্মল-জলে পরিপূর্ণ কূপ॥" চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩

পুরীগোস্বামীর জন্য মহাপ্রভুর এত যত্ন কেন? এত শ্রদ্ধা কেন, যে তাঁহার জন্য অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন্ নাই?

"প্রভু বোলে 'আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে।
জানিহ কেবল পুরীগোসাঞির প্রীতে॥
পুরীগোসাঞির আমি—নাহিক অন্যথা।
পুরী বেচিলেই আমি বিকাই সর্ব্বথা'॥"

চৈতন্য মহাপ্রভু জানিতেন যে, পরমানন্দ পুরীতে বিশ্বরূপের আবেশ আছে। তিনি জানিতেন, বিশ্বরূপ সঙ্কর্ষণের অবতার। তিনি জানিতেন, সঙ্কর্ষণরূপী বিশ্বরূপ কখনও ঈশ্বরপুরীর দেহে, কখনও নিত্যানন্দের দেহে, কখনও বা অশরীরী বাণীরূপে তাঁহার সেবা করিতেছেন। তিনি জানিতেন, পৃথিবীতে সঙ্কর্ষণ অবতার কে। তিনি জানিতেন, পৃথিবী মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি স্বয়ং চৈতন্যদেবই বা কে। তাই তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি যে পৃথিবীতে আছি, সে কেবল সঙ্কর্ষণের প্রীতি-সেবার বলে।'

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা সঙ্কর্ষণ এবং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের তত্ত্ব জানিতে প্রয়াস করিব।

সঙ্কর্ষণ ও শ্রীকৃষ্ণ।

ভক্ত লোচন-দাস সঙ্কর্ষণের যে অপরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা চিরকাল ভক্তের হৃদয়রঞ্জন করিবে, এবং সেই চিত্ত-উন্মাদক চিত্র হইতে ভক্ত চিরকাল মধুর রস আস্বাদন ও নবীন রহস্যের উদ্ভাবন করিবেন।

চৈতন্যের বাল্য-সহচর মুরারিগুপ্ত বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব জ্ঞাপন করিবার জন্য নারদ ঋষি শ্বেতদ্বীপে সঙ্কর্ষণের নিকট গমন করেন। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া চৈতন্যমঙ্গলে নিম্নলিখিত মধুর বর্ণনা লিখিত হইয়াছে।

কোটি রবি তেজ যেন অঙ্গের কিরণ হেন
নারদ চলিলা অন্তরীক্ষে।
উত্তরিলা সেই ঠাম যথা প্রভু বলরাম
চমক লাগিল শ্বেতদ্বীপে॥
পুরী-পরিসরে রহি চমকি চৌদিগে চাহি
লাখ-লাখ হিমকর জ্যোতি।
বায়ু বহে মন্দ মন্দ দিব্য সুকুসুম গন্ধ
প্রতি দ্বারে লম্বে গজমতি॥
সত্ত্বগুণ সর্ব্বলোক নাহি জরা মৃত্যু শোক
সর্ব্বজন সভাকার বন্ধু।
যখন যে দেখি দিঠি সেই সর্ব্বজন মিঠি
বলদেব-ময় ক্ষীরসিন্ধু॥

দেখিয়া নারদ মুনি ধনি ধনি মনে গুণি
ধনি ধনি আপনাকে মানে।
ত্রিজগত-নাথ স্বামী দেখিব নয়ানে আমি
কান্দিয়া পড়িব দুচরণে॥
সেই বলরাম রায় যুগে যুগে সহায়
করি, কৃষ্ণ করে অবতার।
খেলায় বিবিধ খেলা, অনন্ত বিনোদ লীলা
করি, করে অসুর সংহার॥
সেই প্রভু বলরাম নিজ অংশে তিন ঠাম
রহি করে কৃষ্ণের পিরিতি।
আদ্য মধ্য আর অন্ত্য যার অংশ অনন্ত
এক ফণায় ধরি রহে ক্ষিতি॥
আপনে ঈশ্বর হঞা শ্বেতদ্বীপ মাঝে রঞা
বিলাস করয়ে নানা রঙ্গে।
সর্ব্বোপরি পরিণাম সেই মহাপ্রভু ঠাম
সেবা করে অপরূপ রঙ্গে॥
গমনের কালে ছত্র বসিতে আসন বস্ত্র
শয়নের কালে হয় শয্যা।
প্রলয়ে সে বট পত্র মহা রণে দিব্য অস্ত্র
নানারূপে করে পরিচর্য্যা॥
এক অংশে সেবা করে আর অংশে মহী ধরে
হেন প্রভু বলরাম মোর।
ত্রিজগত অধিরাজ দেখিব ক্ষীরোদ মাঝ
প্রভু আজ্ঞা করিব গোচর॥

এই দুই প্রভু মাত্র যেন রাজা মহাপাত্র
পৃথিবী পালয়ে এক যুক্তি।
আর যত রুদ্রবংশ সেহো যার অংশাংশ
অবতার করি রহে ক্ষিতি॥
হেন মনঃ কথা রসে মুনি ভেল পরবশে
পুরী প্রবেশিল মহানন্দে।
দেখি ত্রিজগত-নাথ সব পারিষদ সাথ
অপরূপ বলরাম চাঁদে॥

চৈতন্যমঙ্গল, সূত্র খণ্ড।

"এই দুই প্রভু মাত্র, যেন রাজা মহাপাত্র, পৃথিবী পালয়ে এক যুক্তি।" বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ, এই দুই প্রভু একযুক্তি হইয়া এই পৃথিবী পালন করিতেছেন। একজন যেন রাজা, অন্য জন যেন মন্ত্রী। বাসুদেবের মন্ত্রণায়, বাসুদেবের প্রেরণায়, যেন সঙ্কর্ষণ পৃথিবীকে গন্তব্য পথে লইয়া যাইতেছেন। যখনই বাসুদেব অবতার গ্রহণ করেন, তখনই সঙ্কর্ষণ কোনরূপে না কোনরূপে তাঁহার পরিচর্য্যা করেন।

সঙ্কর্ষণের প্রকাশে বৈচিত্র আছে। আদ্য প্রকাশ, মধ্য প্রকাশ ও অন্ত্য প্রকাশ।

শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার কড়চায় এই তিন প্রকাশের কথা লিখিয়াছেন।

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলা স নিত্যানন্দাখ্য রামঃ শরণং মমাস্তু॥

মূল সঙ্কর্ষণ তুরীয়। পুরুষরূপে তাঁহার ত্রিবিধ প্রকাশ। কার্য্য-জগতের উপাদান কারণে আসীন হইয়া তিনিই কারণজলশায়ী প্রথম পুরুষ মহাবিষ্ণু। আবার ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভে সংস্থিত হইয়া তিনি দ্বিতীয় পুরুষ হিরণ্যগর্ভ। আর পৃথিবী পালন জন্য তিনিই তৃতীয় পুরুষ—ক্ষীরোদশায়ী শ্বেতদ্বীপপতি বিষ্ণু।

অনন্ত তাঁহার কলা। মহাবিষ্ণু তাঁহার অংশ। হিরণ্যগর্ভ তাঁহার অংশাংশ। ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু তাঁহার অংশাংশের অংশ।

শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥
আপনে করেন কৃষ্ণ-লীলার সহায়।
সৃষ্টি-লীলা কার্য্য করে ধরি চারি কায় ॥
সৃষ্ট্যাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন।
শেষরূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন ॥
সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণসেবানন্দ।
সেই বলরাম সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ॥

চৈতন্যচরিতামৃত।

"মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে" যে মূল সঙ্কর্ষণ আছেন, তাঁহাকে লইয়া আমাদের প্রয়োজন নাই। শ্বেতদ্বীপে যে সঙ্কর্ষণ নিজভাব নিত্য প্রকাশিত করিয়া অবস্থিত আছেন, জগতের পালনে ব্রতী হইয়া সঙ্কর্ষণরূপী যে ত্রিজগতের ঈশ্বর চৈতন্যলীলায় কখনও বিশ্বরূপ, কখনও নিত্যানন্দ, কখনও পরমানন্দ পুরীর দেহে প্রকাশিত হইয়াছেন, তাঁহাকে লইয়াই আমাদের প্রয়োজন। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের প্রেরণায় সনাতন গোস্বামী একটি রহস্যকথার উদ্ঘাটন করেন।

সনৎকুমারনামায়ং জ্যেষ্ঠোঽস্মাকং মহত্তমঃ।
আত্মারামাপ্তকামানামাদ্যাচার্য্যো বৃহদ্‌ব্রতঃ ॥

বৃহদ্ভাগবতামৃত ২-৭০

মহর্ষিগণ গোপকুমারকে বলিলেন, সনৎকুমার সকল মহর্ষির জ্যেষ্ঠ। তিনি সকল ঋষির মধ্যে মহত্তম। তাঁহা হইতে আর মহান্ কেহ নাই। তিনি যোগমার্গের আদ্য আচার্য্য।

যথা যজ্ঞেশ্বরঃ পূজ্যস্তথায়ঞ্চ বিশেষতঃ।
গৃহস্থানামিবাস্মাকং স্বকৃত্যত্যাগতোঽপিচ॥ ২-৭৩

'যেমন যজ্ঞেশ্বর পূজ্য, সেইরূপ ইনিও বিশেষরূপে পূজ্য। কি গৃহস্থ কি ঋষি নিজকৃত্য ত্যাগ করিয়াও ইহাঁর পূজা করিবেন।'

গোপকুমার কুমার-চতুষ্টয়কে দর্শন করিয়া ভগবদ্দর্শনের আনন্দ লাভ করিলেন।

ভগবঁল্লক্ষণং তেষু তাদৃঙ্ নাস্তি তথাপ্যভূৎ।
তেষাং সন্দর্শনাৎ তত্র মহান্মোদো মম স্বতঃ॥ ২-৭৮

যদিও কুমারগণের বাহিরে ভগবঁল্লক্ষণ নাই, দেখিতে তাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ন্যায়, তথাপি তাঁহাদের দর্শনে ভগবদ্দর্শনের আনন্দ লাভ হয়।

কুমারগণ গোপকুমারকে বহুরূপ দেখাইলেন—

একো নারায়ণো বৃত্তো বিষ্ণুরূপোঽপরোঽভবৎ।
অন্যো যজ্ঞেশরূপোঽভূৎ পরো বিবিধরূপবান্॥ ২-১১১

একজন নারায়ণ ঋষির রূপ ধারণ করিলেন, একজন বিষ্ণুরূপী হইলেন, একজন যজ্ঞেশরূপী হইলেন, এবং চতুর্থ বিবিধ রূপ ধারণ করিলেন। যদি প্রত্যুম্ন আমাদের ত্রিজগতের অধীশ্বর হন্, তাহা হইলে ব্যাসদেবের শিক্ষা অনুসারে সনৎকুমার প্রত্যুম্ন।

সনৎকুমারং প্রত্যুম্নং বিদ্ধি রাজন্ মহৌজসম্॥

মহাভারত আদিপর্ব্ব ৬৭-১৫২

ভাগ্যক্রমে যে ঋষিতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়, তাঁহাকে আমরা জানিতে পারি।

গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে দেবগণকে বলিলেন :—

যাস্যামি পৃথিবীং দেবা যাত যূয়ং স্বমালয়ম্।
যূয়ং চৈবাংশরূপেণ শীঘ্রং গচ্ছত ভূতলম্॥

'দেবগণ, এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব ধামে প্রতিগমন কর। আমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইব। তোমরাও অংশক্রমে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিও।' এই কথা বলিতে বলিতে একটি রথ সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। সেই রথে চতুর্ভুজ নারায়ণ অবস্থান করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে সেই নারায়ণ দেব কৃষ্ণ-বিগ্রহে বিলীন হইলেন। এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে তত্রত্য সকলে বিস্মিত হইলেন।

গত্বা নারায়ণো দেবো বিলীনঃ কৃষ্ণবিগ্রহে।
দৃষ্টা চ পরমাশ্চর্য্যং তে সর্ব্বে বিস্ময়ং যযুঃ॥

অতঃপর সকলে দেখিলেন যে, শ্বেতদ্বীপ-পতি বিষ্ণু স্বর্ণরথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক সহাস্যবদনে সমাগত হইলেন।

স চাপি লীনস্তত্রৈব রাধিকেশ্বরবিগ্রহে।

তিনিও সেই কৃষ্ণবিগ্রহে বিলীন হইলেন।

এতস্মিন্নন্তরে তূর্ণমাজগাম ত্বরান্বিতঃ
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশো নাম্না সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ শতসূর্য্যসমপ্রভঃ।

এই সময়ে সহস্রমস্তকবিশিষ্ট ভগবান্ অনন্তদেব ত্বরান্বিত হইয়া সেইস্থানে উপনীত হইলেন। কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে বিলীন হইলেন না। কারণ, বলরামরূপে শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

আবাঞ্চ ধর্ম্মপুত্রৌ দ্বৌ নরনারায়ণাভিধৌ।
লীনোঽহং কৃষ্ণপাদাব্জে বভূব ফাল্গুণোঽবরঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

ধর্ম্মপুত্র নর ও নারায়ণ ঋষি সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নারায়ণ ঋষি কৃষ্ণপাদ-কমলে বিলীন হইলেন, এবং নরঋষি অর্জ্জুন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কোথায় গোলোকপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, আর কোথায় আমাদের এই মর্ত্ত্যলোক ও মর্ত্ত্য-বিগ্রহ!

এই মর্ত্ত্যলোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ কি সহজ কথা?

আমাদের যিনি জীবাত্মা, বল দেখি ভাই, তাঁহাকে কিরূপ ভাবে এই পৃথিবীমধ্যে আসিতে হয়? কত আবরণে আবৃত হইয়া, তবে মর্ত্ত্যলোকে অবতরণ করিতে হয়।

আনন্দময় কোষে, প্রথম আবরণ। বিজ্ঞানময় কোষে দ্বিতীয় আবরণ। মনোময় কোষে তৃতীয় আবরণ। প্রাণময় কোষে চতুর্থ আবরণ। অন্নময় কোষে পঞ্চম আবরণ। আমাদের জীবাত্মা যে ঈশ্বরের অংশ। "মমৈ-বাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" তাই পঞ্চকোষে আচ্ছাদিত হইয়া, পঞ্চকোষকে নিজের প্রকৃতি করিয়া, শুদ্ধ আত্মাকে উপাধিগ্রস্ত হইয়া পৃথিবীর মধ্যে আসিতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণকে আসিতে হইলেও "প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়"। তাঁহার নিজ প্রকৃতি ঐশ্বরিক প্রকৃতি। তাই কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী নারায়ণকে এবং পৃথিবীস্থ সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুকে প্রকৃতি করিয়া এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন। তথাপি ব্যবধান থাকে। ক্ষীরোদ-শায়ী বিষ্ণু ও মায়াপরতন্ত্র জীব—এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান আছে। তাই ঋষির মধ্যে মহাঋষি, ত্রিজগতের হিতাকাঙ্ক্ষী, ত্রিজগতের গুরু অর্দ্ধ মনুষ্য অর্দ্ধ দেবতা—নারায়ণ ঋষির অপেক্ষা। শ্রীকৃষ্ণের অন্নময় কোষ নারায়ণ ঋষি। জন্মের সময় তিনি নারায়ণ ঋষি এবং অন্তর্ধানের সময়ও তিনি নারায়ণ ঋষি। বৃন্দাবন-লীলায় তিনি গোলোকপতি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। মথুরা-লীলায় তিনি শ্বেতদ্বীপপতি বিষ্ণু, এবং দ্বারকালীলায় তিনি শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ। তিনি যখন যে প্রকৃতি লইয়া কায করেন, তখন তিনি তাহাই।

"অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহ কোন মত কহে যেমন যার মতি॥
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহো নরনারায়ণ।
কেহো কহে কৃষ্ণ হয়ে সাক্ষাৎ বামন॥
কেহো কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার॥
কেহো কহে পরব্যোম নারায়ণ করি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণ যাতে অবতারী॥"

চৈতন্যচরিতামৃত।

সকলের বচন যে কেন সত্য, তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ পাঠেই স্পষ্ট জানা যায়।

যেমন শ্রীকৃষ্ণের অবতার গ্রহণ জন্য একজন ঋষির আবশ্যকতা আছে, সঙ্কর্ষণের আবির্ভাবের জন্য কি কোন ঋষির আবশ্যকতা নাই?

মৈত্রেয় ঋষি বলেন, যে ভাগবত পুরাণ তিনি অবগত হইয়াছেন, তাহার মূল বক্তা সঙ্কর্ষণ।

আসীনমুর্ব্ব্যাং ভগবন্তমাদ্যং সঙ্কর্ষণং দেবমকুণ্ঠসত্ত্বম্।
বিবিৎসবস্তত্ত্বমতঃ পরস্য কুমারমুখ্যা মুনয়োঽন্বপৃচ্ছন্॥

'কুমার-প্রমুখ মুনিগণ অকুণ্ঠসত্ত্ব সঙ্কর্ষণ দেবকে সঙ্কর্ষণ হইতে শ্রেষ্ঠ (অতঃ পরস্য) বাসুদেবের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।'

প্রোক্তং কিলৈতদ্ভগবত্তমেন নিবৃত্তিধর্ম্মাভিরতায় তেন।
সনৎকুমারায় স চাহ পৃষ্টঃ সাংখ্যায়নায়াঙ্গধৃতব্রতায়॥

ভগবান্ সঙ্কর্ষণ নিবৃত্তিধর্ম্মপরায়ণ সনৎকুমারকে সেই তত্ত্ব কথা বলিয়াছিলেন। সনৎকুমার আবার সেই তত্ত্ব সাংখ্যায়ন ঋষিকে বলিয়াছেন।

সাংখ্যায়ন হইতে পরাশর এবং পরাশর হইতে মৈত্রেয় ঋষি সেই তত্ত্ব অবগত হন।

সঙ্কর্ষণের সহিত সনৎকুমারের এইরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

সে সম্বন্ধ যে গূঢ়তর, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৈকুণ্ঠে মূল-চতুর্ব্যূহের মধ্যে মূল-প্রদ্যুম্ন আছেন। সে মূল-প্রদ্যুম্ন যিনিই হউন্ না কেন, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কালে সনৎকুমারই শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

যস্তু নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ।
তস্যাংশো মানুষেষ্বাসীদ্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্।
শেষস্যাংশশ্চ নাগস্য বলদেবো মহাবলঃ।
সনৎকুমারং প্রদ্যুম্নং বিদ্ধি রাজন্ মহৌজসম্॥

—মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৬৭ অধ্যায়।

'দেবদেব সনাতন নারায়ণের অংশে মনুষ্যলোকে প্রতাপবান্ বাসুদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষ নাগের অংশে মহাবল বলদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাতেজা প্রদ্যুম্নকে সনৎকুমার ঋষি বলিয়া জানিবে।' মহাভারতে বৃন্দাবন-লীলা নাই বলিয়া গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণের কথা নাই।

হরিবংশে সনন্দনাদি কুমারের কথা নাই, কেবল মাত্র সনৎকুমারের কথা আছে।

সনৎকুমার কি শ্বেতদ্বীপাধিপতির পার্থিব প্রতিনিধি?

কল্পনার প্রয়োজন নাই। বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ বৈকুণ্ঠে রাজা ও মন্ত্রী। সর্ব্বত্র তাঁহাদের প্রতিনিধি সর্ব্বলোক পালন করিতেছেন। আমাদের পৃথিবীতে মনুষ্য-সমাজের মধ্যে তাঁহাদের আবির্ভাবের জন্য দুইজন ঋষি

তাঁহাদের নিজ শরীর সমর্পণ করেন। সে দুই ঋষি কে, তাহা জানিতে পারি বা না পারি, তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা যায়,—

এই দুই প্রভুমাত্র যেন রাজা মহাপাত্র
পৃথিবী পালয়ে একযুক্তি।

এই দুই প্রভুর মধ্যে একজনের আবির্ভাব চৈতন্যদেবে, এবং অন্যের আবির্ভাব বিশ্বরূপে, নিত্যানন্দে ও কিছু পরিমাণে পরমানন্দ পুরীতে।

কথাটি এখনও অসম্পূর্ণ থাকিল। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে কিছু বিশদ হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব।

নারায়ণ ঋষির শরীরে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব পর্য্যালোচনা করিবার পূর্ব্বে একবার ঐ সনাতন ঋষিকে নিরীক্ষণ করি। তাঁহাকে দেখিবার জন্য নারদ ঋষি হিমালয়ের আশ্রমে আগমন করিতেন। কলাপ-গ্রামবাসী দেবাপি ও মরু উপদেশ ও আদেশের জন্য তাঁহার পাদতলে উপবিষ্ট হইতেন। চন্দ্র-বংশীয় দেবাপি ও সূর্য্যবংশীয় মরু মনুষ্যের হিতকামনায় বর্ণাশ্রমযুক্ত নূতন ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য উগ্র তপস্যা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণাই তাঁহা-দিগের বল। সেই মন্ত্রণার জন্যই তাঁহারা নারায়ণ ঋষির চরণসেবী।

দেবাপিঃ শান্তনোর্ভ্রাতা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ।
কলাপগ্রাম আসাতে মহাযোগ-বলান্বিতৌ॥
তাবিহেত্য কলেরন্তে বাসুদেবানুশিক্ষিতৌ।
বর্ণাশ্রমযুতং ধর্ম্মং পূর্ব্ববৎ প্রথয়িষ্যতঃ॥

—ভাগবত, ১২।২।৩৭-৩৮।

পূর্ব্বে বৈবস্বত মনু বর্ণাশ্রম-যুক্ত ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছিলেন। সে ধর্ম্ম এখন লুপ্তপ্রায়। চারিদিকে বর্ণ-সঙ্কর, আশ্রম-সঙ্কর, ধর্ম্ম-সঙ্কর। মনুর পবিত্র সমাজ-রচনার মধ্যে, কত অপবিত্রতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহার কে অবধি করিতে পারে? আবার ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া নূতন সমাজ রচনা করিতে হইবে, আবার পূর্ব্বের ন্যায় বর্ণাশ্রম-যুক্ত একটি নূতন পবিত্র ধর্ম্মের স্থাপনা করিতে হইবে, এই জন্যই দেবাপি ও মরুর উদ্যম। তাঁহারা উভয়েই মহাযোগ-বলান্বিত। শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের শিক্ষাদাতা। কলির অবসানে কল্কিদেবের সাহায্যে তাঁহারা আপন উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সাধন

করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের উদ্যোগপর্ব্ব এক বিস্তীর্ণ মহাব্রত। সেই মহাব্রত-সাধনের জন্য তাঁহারা সময়ে সময়ে নারায়ণ ঋষির পদতলে আসীন হন।

একদা নারদো লোকান্ পর্য্যটন্ ভগবৎপ্রিয়ঃ।
সনাতনমৃষিং দ্রষ্টুং যযৌ নারায়ণাশ্রমম্॥
যো বৈ ভারতবর্ষেঽস্মিন্ ক্ষেমায় স্বস্তয়ে নৃণাম্।
ধর্ম্মজ্ঞানশমোপেত আকল্পাদাস্থিতস্তপঃ॥
তত্রোপবিষ্টমৃষিভিঃ কলাপগ্রামবাসিভিঃ।
পরীতং প্রণতোঽপৃচ্ছাদিদমেব কুরূদ্বহ॥
তস্মৈ হ্যবোচদ্ভগবানৃষীণাং শৃণ্বতামিদম্।
যো ব্রহ্মবাদঃ পূর্ব্বেষাং জনলোকনিবাসিনাম্॥

—ভা, পু, ১০।৮৭।

'একদা ভগবৎপ্রিয় নারদ ঋষি লোক-পর্য্যটন করিতে করিতে সনাতন নারায়ণ ঋষিকে দেখিবার জন্য তাঁহার আশ্রমে গমন করিলেন। সেই ঋষি মনুষ্যজাতির মঙ্গলকামনায় কল্পের আরম্ভ হইতেই এই ভারতবর্ষে তপস্যার আচরণ করিতেছিলেন। কলাপ-গ্রামবাসী ঋষিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট ছিলেন। প্রণত নারদ ঋষি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে, তিনি জনলোকবাসী কুমারদিগের মধ্যে যে ব্রহ্মবাদ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিলেন।'

জনলোকবাসী কুমারদিগের সহিতই নারায়ণ ঋষির প্রয়োজন এবং ইঁহাদের সকলের সহিতই নারদ ঋষির ঘনিষ্ঠতা। সকলের উদ্দেশ্য একই। বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ তাঁহাদের গুরু। সেই রাজা মহাপাত্রের প্রেরণায় তাঁহারা জগতের মঙ্গল সাধনা করিতেছেন। সেই ব্রতে যাঁহারা ব্রতী, তাঁহারাই তাঁহাদের সেবক।

এইবার আমরা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের অবতারণা পর্য্যালোচনা করিব। গোলোকবিহারী দ্বিভুজ কৃষ্ণের সহিত বৈকুণ্ঠবাসী ও অনন্তশায়ী নারায়ণের মিলন নিত্য। সে মিলন জানিবার জন্য আমাদের প্রয়োজন নাই। তবে শ্বেতদ্বীপাধিপতির সহিত মিলন এবং অবশেষে তাঁহার নারায়ণ ঋষির শরীরে প্রবেশ অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। মহাভারতের আদিপর্ব্বে স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস দ্রুপদ রাজাকে বলিয়াছিলেন,—

স চাপি তদ্‌ব্যদধাৎ সর্ব্বমেব ততঃ সর্ব্বে সম্বভূবুর্ধরণ্যাং।
স চাপি কেশৌ হরিরুদ্ববর্হ শুক্লমেকমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্‌॥
তৌ চাপি কেশৌ নিবিশেতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ৌ দেবকীং রোহিণীঞ্চ।
তয়োরেকো বলদেবো বভূব যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ।
কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সম্বভূব কেশো যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্ত॥

—১৯৭ অধ্যায়।

'সেই অনন্ত অব্যক্ত নারায়ণদেব শুক্ল ও কৃষ্ণ দুই বর্ণের দুইগাছি কেশ উৎপাটন করিলেন। সেই কেশ যদুকুলে রোহিণী ও দেবকীর গর্ভে অনুপ্রবিষ্ট হইল। নারায়ণের সেই শুক্ল কেশ বলদেবরূপে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছেন, এবং কৃষ্ণবর্ণ সেই দ্বিতীয় কেশ কেশবস্বরূপ কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।'

উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহাবলঃ—বিষ্ণুপুরাণ।

'মহাবল নারায়ণ আপনার শুক্ল ও কৃষ্ণ কেশ উৎপাটন করিয়াছিলেন।'

ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দ্দিতায়াঃ
ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ। ভাগবত পুরাণ ২।৭

'অসুরমর্দ্দিত পৃথিবীর ভারহরণের জন্য শুক্ল ও কৃষ্ণ কেশরূপ কলাদ্বারা রাম ও কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।'

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন—"অত্র কেশাবেব শ্বেতোরূপৌ

পাণ্ডবানামিব রামকৃষ্ণয়োরপি প্রকরণসঙ্গত্যর্থং সাক্ষাদ্দেবরেতস উৎপত্তের-বশ্যব্যক্তব্যত্বাৎ, অতএব দেবক্যাং রোহিণ্যাঞ্চ সাক্ষাৎ কেশপ্রবেশ উচ্যতে, নতু বসুদেবে।"

'পূর্ব্বে দেবতাদিগের বীর্য্যে পাণ্ডবদিগের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। এইজন্য প্রসঙ্গক্রমে রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ নারায়ণদেবের কেশরূপ রেতঃ হইতে উৎপত্তি কথিত হইল। সেই কেশরূপ বীর্য্য সাক্ষাৎ দেবকী ও রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল। বসুদেবে প্রবেশ করে নাই।'

আমাদের জীবাত্মার পার্থিব স্থায়ী অণু (Permanent atom) বা কেশ পিতার শুক্রে প্রবেশ করে। পরে পিতার শুক্র হইতে মাতার শোণিতময় রজে প্রবেশ করে। কিন্তু রামকৃষ্ণের জন্ম পিতার শুক্র-সাপেক্ষ ছিল না। তাঁহারা immaculate conception দ্বারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নীলকণ্ঠ এই ভাবটি আরও পারিষ্কার করিতেছেন, —

"তথা নহি তু 'দেবানাং রেতো বর্ষং বর্ষস্য রেত ওষধয়' ইত্যাদি শ্রৌতপ্রণাড্যা অস্মদাদিবৎ তয়োরপি ব্যবধানেন দেবপ্রভবত্বং স্যাৎ।"

'তাহা না হইলে উপনিষদে পিতৃযান মার্গে গমন করিয়া আমাদের যেরূপ পুনরাগমন পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতি অনুসারে রামকৃষ্ণের ব্যবধানে দেবজন্ম হয়। সাক্ষাৎ দেবজন্ম হয় না।'

"তথা চ—'এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্' ইতি ভগবতঃ সাক্ষাৎ মৎস্যাদ্যবতার-বীজত্বমুচ্যমানং বিরুধ্যেত।"

'এবং শ্রীমদ্ভাগবতে আদ্যাবতার নারায়ণদেবকে মৎস্যাদি অবতারগণের নিধান ও অব্যয় বীজ বলা হইয়াছে। যদি নারায়ণের কেশরূপ বীর্য্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেবকী ও রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ না করিত, তাহা হইলে সাক্ষাৎ-অবতার-বীজত্বের বিরোধ হয়।'

"অপিচ কেশরেতসোর্দেহজত্বে সমানেঽপি রেতঃপ্রভবত্বে অর্ব্বাক্-

শ্রোতত্বেন মনুষ্যত্বং পুত্রত্বঞ্চ স্যাৎ। তথা 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' ইতি শ্রীমদ্ভাগবতোক্তিঃ সঙ্গচ্ছতে।"

'যদিচ কেশরূপ বীর্য্যের দ্বারা উৎপত্তি হওয়াতে রাম ও কৃষ্ণের দেহজের ন্যায় উৎপত্তি হইয়াছিল, তথাপি এই উৎপত্তির দ্বারা তাঁহার একদিকে মনুষ্যত্ব ও পুত্রত্ব এবং অপরদিকে স্বয়ং ভগবত্ত্ব সিদ্ধ হইয়াছিল।'

"ন চ কেশোদ্ধারণাৎ কৃষ্ণস্যাপ্যংশত্বং প্রতীয়তে ইতি বাচ্যম্, কেশস্য দেহাবয়বত্বাভাবাৎ, তস্মাৎ নমুচিবধে কর্ত্তব্যে যথা অপাং ফেণে বজ্রস্য প্রবেশঃ, এবং দেবকীরোহিণ্যোর্জঠর-প্রবেশে কর্ত্তব্যে কেশদ্বয়েন দ্বারভূতেন ভগবতঃ কার্ৎস্ন্যেনৈবাবির্ভাবো দ্রষ্টব্য ইতি যুক্তম্।"

'যদি বল, কেশ উদ্ধরণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অংশত্ব প্রতীয়মান হয়, বাস্তবিক তাহা নহে। কারণ কেশ বলিলে দেহাবয়ব বুঝায় না। নমুচি বধকালে, জলের ফেণে যেরূপ বজ্রের প্রবেশ হইয়াছিল, সেইরূপ কেশদ্বারা দেবকী ও রোহিণীর জঠরে প্রবেশ করিয়া রামকৃষ্ণের ভগবদাবির্ভাবের কৃৎস্নতা নষ্ট হয় না।'

শ্রীধরস্বামী কিন্তু কেশের অন্যরূপ অর্থ করেন।

"তচ্চ ন কেশমাত্রাবতারাভিপ্রায়ং কিন্তু ভারাবতরণরূপং কার্য্যং কিয়দেতৎ মৎ-কেশাবেব তৎকর্ত্তুং শক্তাবিতি দ্যোতনার্থং রামকৃষ্ণয়োর্বর্ণ-সূচনার্থঞ্চ কেশোদ্ধরণমিতি গম্যতে। অন্যথা তত্রৈব পূর্ব্বাপরবিরোধাপত্তেঃ। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতিবিরোধাচ্চ।"

'শ্রীকৃষ্ণ অবতার যে নারায়ণের কেশমাত্র, শ্লোকের এরূপ অভিপ্রায় নহে। তাৎপর্য্য এই যে, ভারাবতরণ কার্য্য কিঞ্চিৎ মাত্র, সে আমার কেশই অনায়াসে করিতে পারে। এই কথা জানাইবার জন্য কেশ উৎপাটনের প্রসঙ্গ করা হইয়াছে। রাম ও কৃষ্ণের শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণ জানাইবার জন্যও শুক্ল ও কৃষ্ণ কেশের কথা বলা হইয়াছে। তাহা না

হইলে, পূর্ব্বাপর কথায় বিরোধ হয়; "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এ কথারও বিরোধ হয়।'

শ্রীধর স্বামী নিগূঢ় কৃষ্ণতত্ত্বের সমাধান করিলেন না, তিনি কেবল বাক্‌চাতুরীর আশ্রয় করিয়া পাশ কাটাইলেন। নীলকণ্ঠ রহস্য উদ্ভেদের প্রয়াস করিলেন। তাঁহার মতে কেশ-উদ্ধরণ রেতঃপাতের ন্যায় এক প্রক্রিয়া।

প্রত্যেক কোষের এক স্থায়ী কোষাণু আছে। সেই কোষাণু হইতে প্রতি জন্মে জীবের নূতন কোষের সৃষ্টি হয়।

জীবের অন্নময় কোষ ও প্রাণময় কোষ লইয়া স্থূল শরীর। মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ লইয়া সূক্ষ্মশরীর; আনন্দময় কোষ লইয়া কারণ-শরীর।

যেমন কোষাত্মক দেহ জীবের প্রকৃতি, সেইরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নারায়ণ-দেবের প্রকৃতি। ত্রিলোকী তাঁহার স্থূলকোষ, মহর্লোকাদি তাঁহার সূক্ষ্মকোষ, বৈকুণ্ঠ তাঁহার আনন্দময় কোষ।

সেই বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি ও শ্বেতদ্বীপাধিপতির সহিত মিলিত হইয়া, ঐশ্বরিক সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহ ধারণ করেন। আবার তিনিই কখনও নারায়ণ ঋষিকে কখনও মৈত্রেয় ঋষিকে আশ্রয় করিয়া ব্যষ্টি স্থূলদেহ ধারণ করেন, এবং মনুষ্য হইয়া মনুষ্যলীলা সম্পাদন করেন।

কোষাণুর সহিত জীব প্রকাশের জন্য নিত্য সম্বন্ধ; নারায়ণ দেবও আপনার কেশের সহিত প্রকাশের জন্য নিত্য সম্বন্ধ।

ভগবান্ বিষ্ণু অদিতির গর্ভ দ্বারা আপনাকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া বামনরূপে অবতীর্ণ হন। তিনিই ত্রিলোকাধিপতি বিষ্ণু।

যখন সেই ক্ষীরোদ-শায়ী বিষ্ণু শয়ন করেন, তখন তাঁহার প্রতিনিধি ইন্দ্র রাজত্ব করেন। আবার যখন বিষ্ণু জাগরিত হন, তখন তিনি বৈষ্ণব

ভাব জগতে প্রচার করেন। ভক্তেরা উল্লসিত হৃদয়ে বিষ্ণুর উত্থান প্রতীক্ষা করেন।

যত্রৈনং বীক্ষিতুং দেবা ন শেকুঃ সুপ্তমব্যয়ম্।*
ততঃ স্বপিতি ঘর্ম্মান্তে জাগর্ত্তি জলদক্ষয়ে॥
তস্মিন্ সুপ্তে ন বর্ত্তন্তে মন্ত্রপূতাঃ ক্রতুক্রিয়াঃ।
শরৎপ্রবৃত্তে যজ্ঞেঽয়ং জাগর্ত্তি মধুসূদনঃ।
তদিদং বার্ষিকং চক্রং কারয়ত্যম্বুদেশ্বরঃ।
বৈষ্ণবং কর্ম্ম কুর্ব্বাণঃ সুপ্তে বিষ্ণৌ পুরন্দরঃ॥ – হরিবংশ ৫০

"যৎকালে এই অবিনাশী পুরুষ সুপ্ত হন, তখন দেবগণ ইঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হন না। ইনি গ্রীষ্মাবসানে আষাঢ় মাসে শয়ন করেন এবং জলদকাল অতীত হইলে কার্ত্তিক মাসে জাগরিত হন। তিনি সুপ্ত হইলে মন্ত্রপূত যজ্ঞকার্য্য সমুদায় নিবৃত্ত হইয়া থাকে। শরৎকালে বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞ আরব্ধ হইলে মধুসূদন জাগরিত হন। ভগবান্ বিষ্ণু শয়ন করিলে জলদেশ্বর পুরন্দর বৈষ্ণব কর্ম্ম সম্পাদন করতঃ এই প্রসিদ্ধ বর্ষাঋতুজন্য বারিবর্ষণাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করাইয়া থাকেন।"—বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

পৃথিবীতে অবতরণ করিবার জন্য নারায়ণদেব ক্ষীরোদসাগরে গমন করিলেন।

স দেবানভ্যনুজ্ঞায় বিবিক্তে ত্রিদিবালয়ে।
জগাম বিষ্ণুঃ স্বং দেশং ক্ষীরোদস্যোত্তরাং দিশম্॥
তত্রৈব পার্ব্বতী নাম গুহা মেরোঃ সুদুর্গমা।
ত্রিভিস্তস্যৈব বিক্রান্তৈ র্নিত্যং পর্ব্বসু পূজিতা॥
পুরাণং তত্র বিন্যস্য দেহং হরিরুদারধীঃ।
আত্মানং যোজয়ামাস বসুদেবগৃহে প্রভুঃ॥—হরিবংশ ৫৫

"ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণের প্রতি অনুমতি করিয়া ক্ষীরোদসাগরের উত্তর দিকে স্বকীয় স্থানে গমন করিলেন। ঐ প্রদেশে সুমেরু শৈলের পার্ব্বতী নামে অতিশয় দুর্গম গুহা আছে; তাঁহারই ত্রিবিক্রম দ্বারা পর্ব্বকালে নিয়ত সেই গুহা পূজিত হইয়া থাকে। সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত উদারধী হরি সেই গুহামধ্যে নিজ পুরাণ দেহ বিন্যাস করিয়া বসুদেবের গৃহে আত্মাকে নিয়োজিত করিলেন।"

এইবার নারায়ণ ঋষির উৎপত্তি। নারায়ণ ঋষি হয়ত বসুদেবের শরীরে প্রথমে প্রবেশ করিয়া পরে দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবান্ বিষ্ণু দেবকীর গর্ভেই তাঁহার শরীর আশ্রয় করিয়াছিলেন। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ ভগবতী যোগমায়াকে বলিয়াছিলেন,—

"অথাহমংশভাগেন দেবক্যাং পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি॥"

শ্রীধর স্বামী এই 'অংশভাগ' লইয়া অত্যন্ত বিব্রত হইলেন, এবং ঐ কথার নানারূপ ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু জন্মসম্বন্ধে অংশভাগ কথা থাকাতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ভগবত্তার কোনরূপ ব্যাঘাত হয় না।

হে কৃষ্ণ, হে সখে, হে প্রাণনাথ, তোমার তত্ত্ব নির্ণয় করিতে অতিশয় ধৃষ্টতা দেখাইলাম। আমি তোমার নিকট বিষম অপরাধী হইলাম। প্রাণবল্লভ, আমি তর্কের ঝঞ্ঝায় তোমাকে ফেলিলাম। জানি তুমি দুর্গম, জানি তুমি দেবের অগোচর, জানি তুমি পূর্ণ ভগবান্। তর্ক দ্বারা তোমার পূর্ণ ভগবত্তা প্রতিপাদন করা আমার দুরাশা! এইবার প্রভো, যেন আমার আশা সফল হয়। এইবার মৈত্রেয় ঋষির সহিত তোমার সম্বন্ধ দেখাইবার চেষ্টা করিব।

শ্রীকৃষ্ণ ও মৈত্রেয়।

দ্বারকার কোন বিপ্রপত্নী পুত্র প্রসব করিলে, সেই পুত্র ভূমি স্পর্শ করিবামাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইত। ব্রাহ্মণ রাজদ্বারে মৃতপুত্র রাখিয়া, রাজার দোষে তাহার পুত্র নষ্ট হইতেছে, এইরূপ কীর্ত্তন করিত। নবম পুত্রের মৃত্যুকালে যখন ব্রাহ্মণ এইরূপ অনুযোগ করিতেছিল, তখন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে ভবিষ্যৎ পুত্র সম্বন্ধে অভয় প্রদান করিলেন। যথাকালে ব্রাহ্মণ পত্নীর আসন্ন-প্রসববার্ত্তা অর্জ্জুনকে নিবেদন করিলেন। অর্জ্জুন গাণ্ডীব-হস্তে দণ্ডায়মান থাকিলেও, ব্রাহ্মণকুমার ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র গতাসু হইল। লজ্জায় ও ঘৃণায় ম্রিয়মাণ হইয়া অর্জ্জুন যমপুরীতে ব্রাহ্মণপুত্রের অনুসন্ধান করিতে গমন করিলেন। তিনি ইন্দ্রলোক, অগ্নিলোক, নৈর্ঋতলোক, চন্দ্রলোক, বায়ু-লোক, বরুণ-লোক, রসাতল ও স্বর্গপৃষ্ঠ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু দ্বিজ-শিশুকে দেখিতে পাইলেন না। তখন অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা-পালনে অসমর্থ বলিয়া, অগ্নি-প্রবেশে কৃতসংকল্প হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিষেধ করিয়া তাঁহাকে আপন দিব্যরথে বসাইলেন, এবং সেই মহাযোগেশ্বরেশ্বর মহাযোগ অবলম্বন করিয়া সুদর্শন-নির্দ্দিষ্ট পথ দ্বারা তমঃপারে অনন্তশায়ী ভগবান্ নারায়ণের নিকট উপস্থিত হইলেন।

তাবাহ ভূমা পরমেষ্ঠিনাং প্রভুর্বদ্ধাঞ্জলী সস্মিতমূর্জ্জয়া গিরা॥ ভা-পু-১০-৮৯-৫৭

'শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু ভূমা পুরুষ তখন সস্মিতবদনে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া তেজোময় বাক্যে কহিতে লাগিলেন।'

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্ হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তিকে ॥

'আমি তোমাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া ব্রাহ্মণকুমারগণকে এখানে আনিয়াছি। ধর্ম্মের রক্ষার জন্য তোমরা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছ। কলিতে যে সকল অসুর পৃথিবীর গুরুভার উৎপাদন করিয়াছে, তাহাদিগকে বধ করিয়া তোমরা শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর।'

পূর্ণকামাবপি যুবাং নরনারায়ণাবৃষী।
ধর্ম্মমাচরতাং স্থিত্যৈ ঋষভৌ লোকসংগ্রহম্ ॥

'তোমরা নর ও নারায়ণ ঋষি। তোমাদের সকল কামনাই পূর্ণ হইয়াছে। কেবল জগতের জন্য কিছুকাল লোক-সংগ্রহরূপ ধর্ম্মের আচরণ কর।'

এইবার নর ও নারায়ণ ঋষির পার্থিব লীলা অবসান-প্রায়। জগতের মঙ্গলকামনায় তাঁহারা বিশালা বদরীতে এতদিন আশ্রম রাখিয়াছিলেন। আজ সেই আশ্রম শূন্য হইতে চলিল। কেবল বাকি থাকিল তাঁহাদের এক কার্য্য—অসুর নাশ দ্বারা অবনীর ভার হরণ। কুরুক্ষেত্র মহারণে সেই কার্য্য সম্পাদিত হইবে। রথী ও সারথি হইয়া নরনারায়ণ পৃথিবীর ভার হরণ করিবেন। তাহার পর? জগতের জন্য, জীবের নিবৃত্তিসাধনের জন্য, অত্যুচ্চপথে জীবকে পথিক করিবার জন্য, কে অহর্নিশ বদরী আশ্রমে যত্ন করিবে? কলাপবাসী ঋষিগণের কে মন্ত্রদাতা হইবে? কৃষ্ণতত্ত্ব কে প্রকাশ করিবে? ভগবানের আবির্ভাবে কে সেতু হইবে? তবে কি মনুষ্য কৃষ্ণপ্রেমে বঞ্চিত হইবে? নিত্য বৃন্দাবনলীলা কি অনিত্য হইবে? নরনারায়ণ ঋষি বৈকুণ্ঠে ভূমা পুরুষের পারিষদ নাই বা হইলেন? আমাদের জগতে কৃষ্ণতত্ত্ব আবির্ভাবের সেতু না রাখিয়া নারায়ণ ঋষি আমাদিগকে ছাড়িতে পারেন না। ভূমা পুরুষেরও অধিকার নাই যে, আমাদিগকে

সেতু হইতে বঞ্চিত করিয়া নারায়ণ ঋষিকে আমাদের মধ্য হইতে লইয়া যান।

কুরুক্ষেত্র মহারণ সংঘটিত হইল। যদুকুলে ব্রহ্মশাপ হইল। দেবগণের সহিত ব্রহ্মা আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন।

যদুবংশেঽবতীর্ণস্য ভবতঃ পুরুষোত্তম।
শরচ্ছতং ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাধিকং প্রভো॥
নাধুনা তেঽখিলাধার দেবকার্য্যাবশেষিতম্।
কুলঞ্চ বিপ্রশাপেন নষ্টপ্রায়মভূদিদম্॥ ভাঃ পুঃ ১১-৬

'হে পুরুষোত্তম, একশত পঞ্চবিংশ বৎসর হইল, তুমি যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছ। দেবকার্য্যের আর অবশেষ নাই। তোমার কুলও বিপ্রশাপে নষ্টপ্রায়।'

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যদুকুল নাশের পর আমি স্বধামে গমন করিব।

তাহার পর দ্বারকায় মহা উৎপাত সমুত্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা উদ্ধব মনে মনে অনুভব করিলেন, এইবার লীলার অবসান হইবে। তিনি শ্রীকৃষ্ণ সমীপে আসিয়া বলিলেন ;—

নারায়ণং নরসখং শরণং প্রপদ্যে!

'নরসখা নারায়ণের শরণ লইলাম।'

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সমস্ত উপদেশ দিয়া বলিলেন ;—

গচ্ছোদ্ধব ময়াদিষ্টো বদর্য্যাখ্যং মমাশ্রমম্।
তত্র মৎপাদতীর্থোদে স্নানোপস্পর্শনৈঃ শুচিঃ॥
ঈক্ষয়ালকনন্দায়া বিধূতাশেষকল্মষঃ।
বসানো বল্কলান্যঙ্গ বন্যভুক্ সুখনিঃস্পৃহঃ॥
তিতিক্ষু র্দ্বন্দ্বমাত্রাণাং সুশীলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
শান্তঃ সমাহিতধিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ॥

মত্তোঽনুশিক্ষিতং যৎ তে বিবিক্তমনুভাবয়ন্।
ময্যাবেশিতবাক্‌চিত্তো সদ্ধর্ম্মনিরতো ভব।
অতিব্রজ্য গতীস্তিস্রো মামেষ্যসি ততঃ পরম্॥ ১১—২৯

'হেউ-দ্ধব! আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি—তুমি বদরীনামক আমার আশ্রমে গমন কর। সেখানে বিষ্ণুপদীর জলে স্নান ও স্পর্শ দ্বারা শুদ্ধ হইয়া এবং অলকনন্দার পবিত্র দর্শনে বিধূত-পাপ হইয়া বল্কল পরিধান পূর্ব্বক বন্য-ফলমূলাহারী হইয়া বিচরণ করিবে এবং বাসনারহিত, দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, সুশীল, সংযতেন্দ্রিয়, শান্ত, সমাহিতবুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংযুক্ত হইয়া নির্জ্জনে আমার উপদিষ্ট বিষয় অনুশীলন করিবে, বাক্ ও চিত্ত আমাতে আবেশিত করিবে এবং সতত সদ্ধর্ম্মনিরত হইবে। এইরূপে ত্রিগুণময়ী গতি অতিক্রম করিয়া অবশেষে আমাকে প্রাপ্ত হইবে।'

এই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া উদ্ধব প্রকৃতির সহজ সৌন্দর্য্যে ভাসিয়া পড়িলেন। মহাত্মা বিদুরও হস্তিনাপুর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া তীর্থ-পর্য্যটনে নিযুক্ত ছিলেন। যমুনা-তটে উদ্ধবের সহিত বিদুরের সাক্ষাৎ হইল। উদ্ধবকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিদুর সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। উদ্ধব বলিলেন—

কৃষ্ণদ্যুমণি নিম্লোচে গীর্ণেষ্বজগরেণহ।
কিন্ন নঃ কুশলং ব্রূয়াং গতশ্রীষু গৃহেষ্বহম্॥

'দিনমণি কৃষ্ণ অস্তগত। কালরূপ মহাসর্প আমাদের গৃহসকল গ্রাস করিয়াছে। গৃহশ্রী বিগত হইয়াছে। আমি আর কি কুশল বলিব?

সোঽহং তদ্দর্শনাহ্লাদ বিয়োগার্ত্তিযুতঃ প্রভো।
গমিষ্যে দয়িতং তস্য বদর্য্যাশ্রমমণ্ডলম্॥
যত্র নারায়ণো দেবো নরশ্চ ভগবানৃষিঃ।
মৃদুতীব্রং তপোদীর্ঘং তেপাতে লোকভাবনৌ॥

'তাঁহার সম্পূর্ণ উপদেশ লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাঁহার দর্শনাহ্লাদ হইতে আমি বিযুক্ত হইয়াছি। আমি আজ কাতরভাবে তাঁহার প্রিয় আশ্রম বদরীমণ্ডলে গমন করিতেছি। সেখানে লোকভাবন নারায়ণদেব ও নরঋষি আকল্পান্ত দুশ্চর করুণাপূর্ণ তপস্যা করিতেছেন।'

উদ্ধব! তুমি কি জাননা, ভূমা পুরুষের আজ্ঞায় নরনারায়ণ এইবার বৈকুণ্ঠগামী?

বিদুর বলিলেন, "উদ্ধব, তবে তুমি আমাকে সেই জ্ঞানের উপদেশ দাও।"

নন্নু তে তত্ত্বসংরাধ্য ঋষিঃ কৌশারবোঽন্তিকে।
সাক্ষাদ্ভগবতাদিষ্টো মর্ত্ত্যলোকং জিহাসতা॥ ভা, পু, ৩।৪।২৬

উদ্ধব বলিলেন, "হে বিদুর! শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অন্যকে দান করিতে আমার অধিকার নাই। সেই তত্ত্ব জানিবার জন্য তুমি কুশারুপুত্র মৈত্রেয় ঋষিকে আরাধনা করিবে। যখন ভগবান্ এই মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন তিনি সাক্ষাৎ আমার সম্মুখে মৈত্রেয় ঋষিকে উপদেশ করিবার আদেশ করিয়াছেন।"

তবে কি শ্রীকৃষ্ণ মৈত্রেয় ঋষিকে নিজের অধিকার দিয়া গিয়াছেন? তবে কি কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশের জন্য মৈত্রেয় নারায়ণ ঋষির প্রতিনিধি হইয়াছেন?

"ভগবতৈব স্মরণমাত্রেণ তবাপি তত্ত্বমুপদিষ্টপ্রায়ম্। অথ কেবলং অসম্ভাবনাদি নিবৃত্তয়ে জ্ঞানী কশ্চিদারাধ্যঃ। সচ তবারাধ্যো মৈত্রেয়ো নত্বহম্। মমান্তিকে এব ত্বদুপদেশে তস্যাদিষ্টত্বাৎ।"—শ্রীধরস্বামী।

"ভগবান্ যখন তোমাকে স্মরণ করিয়াছেন, তখন তোমার তত্ত্বজ্ঞান উপদিষ্টপ্রায়। কেবল মাত্র অসম্ভাবনাদি নিবৃত্তির জন্য কোন জ্ঞানী পুরুষ তোমার আরাধ্য। কিন্তু আমার সে অধিকার নাই। সে অধিকার কেবল

মৈত্রেয় ঋষির আছে। আমার সম্মুখে ভগবান্ মৈত্রেয় ঋষিকে উপদেশের অধিকার দিয়াছেন।” – শ্রীধর

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মানবলীলা সম্বরণ করিবার নিমিত্ত গম্ভীরভাব ধারণ করিলেন। সূর্য্য অস্তগমন করিলে যদুকুলের নাশ হইতে লাগিল। সরস্বতীর জলে আচমন করিয়া ভগবান্ অশ্বত্থবৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইলেন। তখন উদ্ধবও ভগবানের অভিপ্রায় জানিয়া, তাঁহার সম্মুখদেশ হইতে অপসৃত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন একাকী। এইবার পার্থিব অধিকার দিবার সময়। এইবার নারায়ণ ঋষির প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবার কাল। এইবার তিনি ঐশ্বর্য্য ধারণ করিলেন। এইবার চতুর্ভুজ হইয়া তিনি মহিমা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

তখন উদ্ধব দেখিলেন—

অদ্রাক্ষমেকমাসীনং বিচিন্বন্ দয়িতং পতিম্।
শ্রীনিকেতং সরস্বত্যাং কৃতকেতমকেতনম্।
শ্যামাবদাতং বিরজং প্রশান্তারুণলোচনম্।
দোর্ভিশ্চতুর্ভির্বিদিতং পীতকৌশাম্বরেণ চ॥
বামউরাবধিশ্রিত্য দক্ষিণাঙ্ঘ্রিসরোরুহম্।
অপাশ্রিতার্ভকাশ্বত্থ মকৃশং ত্যক্তপিপ্পলম্॥ ভা, পু, ৩।৪

এই মহাপ্রয়াণের মহাসন্ধিকালে জগতে মহাভাব চিরপ্রচারের অধিকার পাইবার জন্য এক মৈত্রেয় ভিন্ন আর কে আসিতে পারেন?

তস্মিন্ মহাভাগবতো দ্বৈপায়নসুহৃৎসখা।
লোকাননুচরন্ সিদ্ধ আসসাদ যদৃচ্ছয়া॥

‘সেই অভূতপূর্ব্ব ঘটনাময় কালে মহাভাগবত দ্বৈপায়ন-সখা সিদ্ধ মৈত্রেয় ঋষি লোক সকল পরিভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছায় সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।’

এস, মৈত্রেয় ঋষি! এস। তুমি দেবগুরু, মনুষ্যগুরু ত্রিজগতের গুরু। শ্রীকৃষ্ণ-দত্ত অধিকারে তুমি পরম অধিকারী। ভাগবতে তোমার অধিকার ব্যক্ত হইয়াছে। বুদ্ধদেব নিজমুখে তোমার অধিকার প্রকট করিয়াছেন। আজ শ্রীমতী এনি বেসান্ত যে খ্রীষ্ট জগতের শীর্ষস্থানে তোমাকে বসাইয়াছেন, ইহা অধিক কথা নহে।

যেরূপ মনুষ্যজগতে রাজা ও মন্ত্রী আছে,* সেইরূপ ধর্ম্মজগতেও রাজা ও মন্ত্রী আছে। বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ সেই রাজা ও মন্ত্রী। তাঁহারা বৈকুণ্ঠে আসীন হইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পতি ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গুরু। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে, প্রতি ত্রিলোকীতে তাঁহাদের প্রতিনিধি আছে। তাঁহারাও বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ। প্রতি ত্রিজগতে তাঁহাদিগকে প্রকাশিত করিবার জন্য ঋষি আছেন। সেই ঋষিরাও তাঁহাদের প্রতিনিধি।

"এই দুই প্রভুমাত্র, যেন রাজা মহাপাত্র,
পৃথিবী পালয়ে এক যুক্তি।"

কৃষ্ণ প্রকাশের সেতু মৈত্রেয় ঋষি। চৈতন্যদেবে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ ভক্তসম্মত কথা। তাই সেই প্রকাশের সেতুরূপ মৈত্রেয় ঋষিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

এইবার চৈতন্যদেবের তত্ত্ব কিছু পরিমাণে বুঝিতে পারিব। কিন্তু সেই তত্ত্ব বুঝিবার জন্য আবেশতত্ত্ব বিশেষরূপে জানিতে হইবে।

আবেশের ক্রম।

বাল্যকালে জীবের আত্মভাব অস্ফুট থাকে। তখন আবেশের বিশেষ সুযোগ থাকে। তখন আবেশ এত প্রবলভাবে জীবকে অধিকার করিতে পারে যে, জীবের স্বতন্ত্রতা একবারে বিলুপ্ত হইতে পারে। জীব যখন বাল্যভাব অতিক্রম করে ও যৌবনের অধিকার মধ্যে আইসে, তখন আবেশ তত সহজ হয় না। বিশেষতঃ ভগবদ্ভাবের আবেশ ভক্তের ইচ্ছাধীন। ভক্তের কোনরূপ বিপরীত ভাব থাকিলে ভগবান্ ভক্ত-শরীরে প্রবেশ করেন না। ভক্তও বিপরীত ভাব লইয়া ভগবানের আবেশ ধারণ করিতে সমর্থ হন না। হয়ত আবেশের উদ্যমই ভক্তের শরীরে বিকার উপস্থিত করে।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাই পূর্ণ ভগবানের লীলা। তিনি যে কোন ঋষির শরীর ধারণ করুন, ঐ বাল্যলীলাতে সে ঋষির কোন স্বতন্ত্রতা ছিল না। বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ, রাসলীলার অধিনায়ক মহাযোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, স্বয়ং ভগবান্।

চৈতন্যদেবের বাল্যকালে একবার মাত্র পূর্ণাবেশ হইয়াছিল, সে আবেশ তাৎকালিক, কেবল কোন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠের অনুগ্রহ জন্য।

> পরম সুকৃতি এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
> কৃষ্ণের উদ্দেশে করে তীর্থ পর্য্যটন॥
> ষড়ক্ষর গোপাল মন্ত্রে করে উপাসন।
> গোপাল নৈবেদ্য বিনে না করে ভোজন॥
> দৈবে ভাগ্যবান্ তীর্থ ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
> আসিয়া মিলিলা বিপ্র প্রভুর বাড়ীতে॥

কণ্ঠে বালগোপাল ভূষণ শালগ্রাম।
পরম ব্রহ্মণ্য তেজ অতি অনুপাম॥
নিরবধি মুখে বিপ্র 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বোলে।
অন্তরে গোবিন্দ রসে দুই চক্ষু ঢুলে॥

ব্রাহ্মণ যেইমাত্র অন্ন বালগোপালকে নিবেদন করেন, সেইমাত্র বালক বিশ্বম্ভর সেই অন্ন ভোজন করেন। একবার, দুইবার, বিশ্বরূপের কাতর নিবেদনে তৃতীয়বার। তৃতীয়বারে সকলেই নিদ্রিত।

যে স্থানে করেন বিপ্র অন্ন নিবেদন।
আইলেন সেই স্থানে শ্রীশচীনন্দন॥
বালক দেখিয়া বিপ্র করে "হায় হায়"।
সভে নিদ্রা যায়ে, কেহো শুনিতে না পায়॥
প্রভু বোলে "অয়ে বিপ্র! তুমিত উদার।
তুমি আমা ডাকি আন, কি দোষ আমার।
মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান।
রহিতে না পারি আমি, আসি তোমা স্থান॥
আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব তুমি।
অতএব তোমারে দিলাঙ দেখা আমি॥ চৈঃ ভাঃ আদি ৩

সে বাল্যকালের কথা। কিন্তু যেমন যেমন বিশ্বম্ভর বড় হইতে লাগিলেন, তিনি ক্রমশঃই অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া উঠিলেন। পাঠ-অবস্থায় তিনি উদ্ধত। পণ্ডিত হইয়াও উদ্ধত।

হেন সে ঔদ্ধত্য প্রভু করেন কৌতুকে।
তেমত উদ্ধত আর নাহি নবদ্বীপে॥ চৈঃ ভাঃ

এই ঔদ্ধত্য ভাবের মধ্যে আবেশ হওয়া এক বিভ্রাট। ঔদ্ধত্য ভাবে উদ্ধত পুরুষের প্রবল স্বতন্ত্রতা থাকে। আবেশ দ্বারা সেই স্বতন্ত্র ভাবের তিরোভাব

কষ্টসাধ্য। এরূপ অবস্থায় আবেশের উদ্দাম বিঘ্নকর। কিন্তু কতদিন এরূপ ভাবে যাইবে? কতদিন জীবের উদ্ধার দীর্ঘসূত্রতার মধ্যে পড়িয়া থাকিবে? কতদিন করুণার সাগর করুণাকটাক্ষ হইতে জীবকে বঞ্চিত রাখিবেন? আবেশের উদ্যম হইল। কিন্তু ফল উন্মাদের ভাব।

আচম্বিতে প্রভু অলৌকিক শব্দ বোলে।
গড়াগড়ি যায়, হাসে, ঘর ভাঙ্গি ফেলে॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করে, মালসাট পূরে।
সম্মুখে দেখয়ে যারে, তাহারেই মারে॥
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি হয়।
হেন মূর্চ্ছা হয়, লোক দেখি পায় ভয়॥
শুনিলেন বন্ধুগণ বায়ুর বিকার।
ধাইয়া আসিয়া সভে করে প্রতিকার॥

* * *

সর্ব্ব অঙ্গে কম্প, প্রভু করে আস্ফালন।
হুঙ্কার শুনিয়ে ভয় পায় সর্ব্বজন॥
প্রভু বোলে, 'মুঞি সর্ব্ব লোকের ঈশ্বর।
মুঞি বিশ্বধরোঁ। মোর নাম বিশ্বম্ভর॥
মুঞি সেই, মোরেত না চিনে কোন জনে?'
এত বলি গড় দেই ধরে সর্ব্বগণে॥ চৈঃ ভাঃ

পিতার মৃত্যুর পর ঔদ্ধত্যের লাঘব হইল। বিশ্বম্ভর পিণ্ডদানের জন্য গয়াতীর্থে গমন করিলেন। বিষ্ণু-পাদপদ্মের মাহাত্ম্য শুনিয়া তাঁহার ভাবান্তর হইল। দৈবযোগে ঈশ্বরপুরীও সেই সময়ে গয়াক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। শ্রাদ্ধাদি কৃত্য সমাপন করিয়া, বিশ্বম্ভর ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

একদিন মহাপ্রভু বসিয়া নিভৃতে।
নিজ ইষ্ট মন্ত্র ধ্যান লাগিল করিতে॥
ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
করিতে লাগিলা প্রভু রোদন ডাকিয়া॥
"কৃষ্ণরে বাপরে! মোর জীবন শ্রীহরি!
কোন্ দিগে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি॥"

এই বিরহভাব ক্রমে তীব্র হইতে লাগিল।

যে প্রভু আছিলা অতি পরম গম্ভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির॥

কৃষ্ণ, কৃষ্ণ করিয়া মহাপ্রভু উন্মত্ত হইলেন। আর কি কৃষ্ণ স্থির থাকিতে পারেন? কৃষ্ণ যাহা করিলেন, তাহা অতি গোপনে, অতি কষ্টে মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ ভক্তদলের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন।

কানাঞির নাটশালা নামে এক গ্রাম।
গয়া হৈতে আসিতে দেখিলুঁ সেই স্থান॥
তমাল-শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নবগুঞ্জা সহিত কুণ্ডল মনোহর॥
বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ শোভে তদুপরি।
ঝলমল মণিগণ লখিতে না পারি॥
হাথেতে মোহন বংশী পরম সুন্দর।
চরণে নূপুর শোভে অতি মনোহর॥
নীলস্তম্ভ জিনি ভুজে রত্ন-অলঙ্কার।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার॥
কি কহিব সে পীত ধটীর পরিধান।
মকর কুণ্ডল শোভে কমল নয়ান॥

আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে।
আমা আলিঙ্গিয়া পলাইলা কোন্ ভিতে॥

* * *

কহিতে কহিতে মূর্চ্ছা গেলা বিশ্বম্ভর।
পড়িলা 'হা কৃষ্ণ!' বলি পৃথিবী উপর॥ চৈঃ ভাঃ মধ্য ২

এবার আবেশের আর কিছু বাকি থাকিল না। এবার আর বিশ্বম্ভর থাকিলেন না—এবার মহাপ্রভু চৈতন্যদেব। এখন হইতে কেবলমাত্র ঐশ্বর্য্য-প্রকাশের তারতম্য। কখনও ভগবদ্ভাব, কখনও মিশ্রভাব। কিন্তু সকল ভাবই অসাধারণ। এখন যে তাঁহার ভক্তভাব, সেও অবতারের ভাব। সে প্রেম-বিকাশ, সে প্রেমবৈকল্য, সে প্রেমনিদর্শন, সকলই অলৌকিক।

কাহার আবেশ ?

শ্রীমান্ পণ্ডিত শ্রীবাসের মন্দিরে আসিয়া বলিতে লাগিলেন—

"পরম অদ্ভুত কথা, মহা অসম্ভব।
নিমাঞি পণ্ডিত হৈলা পরম বৈষ্ণব॥
গয়া হইতে আইলেন সকল কুশলে।
শুনি আমি সম্ভাষিতে গেলাঙ বিকালে॥
পরম বিরক্ত রূপ সকল সম্ভাষ।
তিলার্দ্ধেক ঔদ্ধত্যের নাহিক প্রকাশ॥
নিভৃতে যে লাগিলেন কহিতে কৃষ্ণ-কথা।
যে যে স্থানে দেখিলেন যে অপূর্ব্ব যথা॥
পাদপদ্ম তীর্থের লইতে মাত্র নাম।
নয়নের জলে সব পূর্ণ হৈল স্থান॥
সর্ব্ব অঙ্গ মহাকম্প পুলকে পূর্ণিত।
'হা কৃষ্ণ'! বলিয়া মাত্র পড়িলা ভূমিত॥
সর্ব্ব অঙ্গে ধাতু নাই হইলা মূর্চ্ছিত।
কথোক্ষণে বাহ্যদৃষ্টি হৈলা চমকিত॥
শেষে যে বলিয়া 'কৃষ্ণ' কান্দিতে লাগিলা।
হেন বুঝি গঙ্গা-দেবী আসিয়া মিলিলা॥
যে ভক্তি দেখিল আমি তাহান নয়নে।
তাহানে মনুষ্য বুদ্ধি নাহি আর মনে॥" চৈঃ ভাঃ মধ্য ১

বৈষ্ণবসমাজে মহা আন্দোলন হইতে লাগিল! এরূপ অমানুষিক প্রেমের বিকাশ দেখিয়া বৈষ্ণবেরা নানারূপ নিশ্চয় করিতে লাগিলেন।

"শুনিঞা অপূর্ব্ব প্রেম সভেই বিস্মিত।
কেহো বোলে 'ঈশ্বর বা হইলা বিদিত'॥
কেহো বোলে 'নিমাইপণ্ডিত ভাল হৈলে।
পাষণ্ডির মুণ্ড ছিণ্ডিবারে পারি হেলে'॥
কেহো বোলে 'হইবেক কৃষ্ণের রহস্য।
সর্ব্বথা সন্দেহ নাঞি জানিহ অবশ্য'॥
কেহো বোলে 'ঈশ্বরপুরীর সঙ্গ হৈতে।
কিবা দেখিলেন কৃষ্ণপ্রকাশ গয়াতে'॥" চৈঃ ভাঃ মধ্য ১

অধ্যাপক বিশ্বম্ভরের এখন অন্য ভাব।

"কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
কৃষ্ণ বিনু প্রভু আর কিছু না বাখানে॥

আপ্তমুখে এ কথা শুনিঞা ভক্তগণ।
সর্ব্বগণে বিতর্ক ভাবেন মনে মন॥

কিবা কৃষ্ণ প্রকাশ হইলা সে শরীরে?
কিবা সাধুসঙ্গে, কিবা পূর্ব্বের সংস্কারে?

এই মত মনে সভে করেন বিচার।
সুখময় চিত্ত বৃত্তি হইল সভার॥

বৈষ্ণব আবেশে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণময় জগত দেখয়ে নিরন্তর॥

অহর্ণিশি শ্রবণে শুনয়ে কৃষ্ণ নাম।
বদনে বোলয়ে 'কৃষ্ণচন্দ্র' অবিরাম॥

পঢ়াইতে বৈসে গিয়া ত্রিজগৎ-রায়।
কৃষ্ণ-বিনু কিছু আর না আইসে জিহ্বায় ॥" মধ্য ১

অবশেষে মহাপ্রভুর শিষ্যগণ বলিতে লাগিলেন—

"দিনদশ ধরি কর যতেক ব্যাখ্যান।
সর্ব্ব শব্দে কৃষ্ণ ভক্তি কর' কৃষ্ণনাম ॥
দশদিন ধরি আজি পাঠ-বাদ হয়।
কহিতে তোমারে সভে বড় বাসি ভয় ॥"
প্রভু বোলে 'ভাই সব কহিলা সুসত্য।
আমার এ সব কথা অন্যত্র অকথ্য ॥
কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মূরলী বাজায়।
সবে দেখোঁ তাই ভাই! বোলোঁ সর্ব্বথায় ॥
যত শুনি শ্রবণে সকল কৃষ্ণনাম।
সকল ভুবন দেখোঁ গোবিন্দের ধাম ॥
তোমা সভা স্থানে মোর এই পরিহার।
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার ॥" মধ্য ১

মহাপ্রভুর অধ্যাপন কার্য্য এইবার শেষ হইল।

এই হৈতে পূর্ণ হৈল বিদ্যার বিলাস।
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভের হইল প্রকাশ ॥

প্রথমে নিজগৃহে সঙ্কীর্ত্তন, তাহার পর শ্রীবাসের মন্দিরে। এই সঙ্কীর্ত্তনে তিনি প্রেমের মহাভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

'হরিবোল' বলি প্রভু লাগিলা গর্জ্জিতে।
চতুর্দ্দিগে পড়ে, কেহো না পারে ধরিতে ॥
ত্রাস, হাস, কম্প, স্বেদ, পুলক গর্জ্জন।
একেবারে সর্ব্ব ভাব দিল দরশন ॥

কীর্ত্তনের ধ্বনি সকলকে বিহ্বল করিল। ভক্ত সেই ধ্বনিতে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। পাষণ্ড অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পড়িল। যবন রাজার কাছে এই কীর্ত্তনের সংবাদ পঁহুছিল।

আজি মুঞি দেয়ানে শুনিলু সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে হেথা॥
শুনিলেক নদায়ায় কীর্ত্তন বিশেষ।
ধরিয়া নিবারে হৈল রাজার আদেশ॥
এইমত কথা হইল নগরে নগরে।
রাজনৌকা আইসে বৈষ্ণব ধরিবারে॥
শ্রীবাস পণ্ডিত বড় পরম উদার।
যেই কথা শুনে তাই প্রতীত তাঁহার॥
যবনের রাজ্য দেখি মনে হৈল ভয়।
জানিলেন গৌরচন্দ্র ভক্তের হৃদয়॥

এইবার মহাপ্রভুর ভক্তভাব দূরে গেল। ভক্তভয় নিবারণের জন্য তিনি ভগবান্ হইলেন।

নৃসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস যেই ঘরে।
পুনঃ পুনঃ লাথি মারে তাহার দুয়ারে॥

'কাহারে বা পূজিস্, করিস্ কার ধ্যান।
যাহারে পূজিস্ তারে দেখ্ বিদ্যমান॥'

জ্বলন্ত অনল যেন শ্রীবাস পণ্ডিত।
হইল সমাধিভঙ্গ, চাহে চারি ভিত॥
দেখে বীরাসনে বসি আছে বিশ্বম্ভর।
চতুর্ভুজ—শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর॥

দেখিয়া হইল কম্প শ্রীবাস-শরীরে।
স্তব্ধ হৈলা শ্রীনিবাস, কিছুই না স্ফুরে॥
ডাকিয়া বোলয়ে প্রভু 'আরে শ্রীনিবাস!
এতদিন না জানিস্ আমার প্রকাশ॥
তোর উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে, নাঢ়ার হুঙ্কারে।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইলুঁ সর্ব্ব পরিবারে॥
সাধু উদ্ধারিমু, দুষ্ট বিনাশিমু সব।
তোর কিছু চিন্তা নাই, পঢ় মোর স্তব॥'
শ্রীনিবাস প্রিয়ঙ্কারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণ দিলেন সর্ব্ব-শিরের উপর॥
অলক্ষিতে বুলে প্রভু মাথায় সবার।
হাসি বোলে 'মোরে চিত্ত হউ সভাকার॥'
হুঙ্কার গর্জ্জন করি প্রভু বিশ্বম্ভর।
শ্রীনিবাস সম্বোধিয়া বোলেন উত্তর॥
'অয়ে শ্রীনিবাস! কিছু মনে ভয় পাও?
শুনি তোমা' ধরিতে আইসে রাজ-নাও॥
রাজার যতেকগণ রাজার সহিতে।
সভা কান্দাইমু 'কৃষ্ণ' বলি ভাল মতে॥
ইহাতে বা অপ্রত্যয় তুমি বাস' মনে।
সাক্ষাতেই করোঁ দেখ আপন নয়নে॥'
সম্মুখে দেখয়ে এক বালিকা আপনি।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নাম 'নারায়ণী'॥
আজ্ঞা কৈলা 'নারায়ণি! কৃষ্ণ বলি কান্দ' ॥

চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত চরিত।
'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া কান্দে, নাহিক সম্বিত॥
অঙ্গ বাহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে॥
হাসিয়া হাসিয়া বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
'এখন তোমার সব ঘুচিল কি ডর?' চৈঃ ভাঃ মধ্য ২

ভক্তভয় নিবারণের জন্য, ভক্তকে অনুগ্রহ করিবার জন্য এবং হরিনাম প্রচারের সৌকর্য্যের জন্য মহাপ্রভু ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন। এইজন্যই তিনি বরাহভাবে মুরারি গুপ্তের বিশ্বাস উৎপাদন করাইলেন।

এই মত সর্ব্ব সেবকের ঘরে ঘরে।
কৃপায় ঠাকুর জানায়েন আপনারে॥
চিনিঞা সকল ভৃত্য প্রভু আপনার।
পরানন্দময় চিত্ত হইল সভার॥
পাষণ্ডীরে আর কেহো ভয় নাহি করে।
হাটে ঘাটে সভে 'কৃষ্ণ' গায় উচ্চস্বরে॥

নিত্যানন্দের নিকট স্বরূপ-প্রকাশের জন্য তিনি ব্যাস-পূজার দিন ষড়্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। অদ্বৈত আচার্য্যের সন্দেহ নিরাকরণের জন্য তিনি আবেশিতচিত্ত হইয়া বিষ্ণুর খট্টায় বসিয়াছিলেন।

আবেশিতচিত্ত প্রভু সভেই বুঝিয়া।
সশঙ্কে আছেন সভে নীরব হইয়া॥
হুঙ্কার করয়ে প্রভু ত্রিদশের রায়।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টায়॥
'নাঢ়া আইসে,' 'নাঢ়া আইসে' বোলে বারে বারে।
'নাঢ়া চাহে মোর ঠাকুরাল দেখিবারে'॥

একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে প্রায় সমস্ত রাত্রি কীর্ত্তন করিয়া, যখন এক প্রহর মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তখন মহাপ্রভু শালগ্রাম কোলে করিয়া বিষ্ণুখট্টার উপর আরোহণ করিলেন।

চৈতন্য আজ্ঞায় স্থির হইল কীর্ত্তন।
কহে আপনার তত্ত্ব করিয়া গর্জ্জন॥
"কলিযুগে কৃষ্ণ আমি, আমি নারায়ণ।
আমি সেই ভগবান্ দেবকী-নন্দন॥" মধ্য ৮

তাহার পর চৈতন্যদেবের সাতপ্রহরব্যাপী মহাপ্রকাশ।

ভক্তের পদার্থ প্রভু খায়েন সন্তোষে।
খাইয়া সভার জন্ম-কর্ম্ম করে শেষে॥
মাথা তুলি চাহে মহাপুরুষ শ্রীধর।
তমাল শ্যামল দেখে সেই বিশ্বম্ভর॥
হাথে বংশীমোহন, দক্ষিণে বলরাম।
মহাজ্যোতির্ম্ময় সব দেখে বিদ্যমান॥
যার যেন যত ইষ্ট প্রভু আপনার।
সেই বিশ্বম্ভর দেখে সেই অবতার!
মহা-মহা-পরকাশ ইহারে সে বলি।
এমত করয়ে গৌরচন্দ্র কুতূহলী॥
ধনে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥
সেই নবদ্বীপে হেন প্রকাশ হইল।
যত ভট্টাচার্য্য একো জনা না দেখিল॥

এই সকল প্রকাশ কেবল ভক্তের জন্য ও ভক্তি প্রচারের জন্য। এই সকল প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের আবেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু চৈতন্যদেবের

ভিতরে ভিতরে অন্য ভাব। সন্ন্যাসের পূর্ব্বে সে ভাব তত তীব্র ছিল না। সন্ন্যাসের পর সেই ভাবই প্রবল, এবং তাঁহার শেষ দ্বাদশ বর্ষ, সেই একমাত্র ভাব। এই ভাব গোপীভাব, কিংবা শ্রীমতী রাধিকার মহাভাব।

গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত।
ব্রজেন্দ্র-নন্দনে মানে আপনার কান্ত॥

সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভু চব্বিশ বৎসর মনুষ্যদেহে লীলা করিয়াছিলেন।

সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান।
তাঁহা যে যে লীলা তার শেষ লীলা নাম॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন॥
অষ্টাদশ বর্ষ কৈল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইল নৃত্যগীত রঙ্গে॥
শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-লীলা প্রভুর অন্তর॥
নিরন্তর রাত্রিদিন বিরহ উন্মাদে।
হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিষাদে॥
শ্রীরাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
উদ্‌ঘূর্ণা প্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রিদিনে॥ চৈঃ চঃ

কাহার আবেশে মহাপ্রভুর এই গোপীভাব? শ্রীকৃষ্ণের আবেশে শ্রীকৃষ্ণের জন্য এ বিরহ হইতে পারে না। এভাব চৈতন্যলীলার চরম ভাব। এ ভাবের মাধুর্য্য মনুষ্যে ইয়ত্তা করিতে পারে না। এ ভাব ভক্তির চরম ভাব—নির্গুণ ভক্তির পরাকাষ্ঠা—মহাভাবের উচ্চতম আদর্শ—

নিত্য বৃন্দাবন-লীলার নিত্য দৃশ্য। এভাবের লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণ। এ ভাব তবে কাহার ভাব? এ ভাবে কাহার আবেশ?

তেঁহো শ্যাম বংশীমুখ গোপবিলাসী।
ইহোঁ গৌর কভু দ্বিজ কভুত সন্ন্যাসী॥
অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে প্রাণনাথ করি॥
সেই কৃষ্ণ সেই গোপী পরম বিরোধ।
অচিন্ত্য চরিত্র প্রভু অতি সুদুর্ব্বোধ॥
ইথে তর্ক করি কেহ না কর সংশয়।
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি এই মত হয়॥
অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য বিহার।
চিত্রভাব চিত্রগুণ চিত্র ব্যবহার॥
তর্কে ইহা নাহি জানে যেই দুরাচার।
কুম্ভীপাকে পচে তার নাহিক নিস্তার॥—চৈতন্যচরিতামৃত

কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই শাসন-বাক্যেও পাপ মন ভয় পায় না। 'এই মত হয়' বলিলেও মন সহজে বিশ্বাস করিতে চাহে না। তর্ক অপ্রতিষ্ঠ হইলেও মন যুক্তির বল অপেক্ষা করে।

চৈতন্যদেবে তবে কাহার আবেশ? মহাপ্রভুর দুইজন অন্তরঙ্গ ভক্ত—স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায়। তাঁহাদের কাছে মহাপ্রভু নিজের স্বরূপ লুকাইতে পারেন নাই। তাঁহারা চৈতন্যতত্ত্ব-বিশেষরূপে অবগত ছিলেন।

নির্জ্জনে রামানন্দ ও চৈতন্যদেব কৃষ্ণকথা কহিতেন। নিভৃতে, অতি নিভৃতে তাঁহারা অতি গূঢ় রহস্যের আস্বাদন করিতেন।

এইমত দুইজন কৃষ্ণকথাবেশে।
নৃত্যগীত রোদনে হইল রাত্রিশেষে॥

দোঁহে নিজ নিজ কার্য্যে চলিলা বিহানে।
সন্ধ্যা কালে রায় আসি মিলিলা আপনে॥
ইষ্ট গোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহি কতক্ষণ।
প্রভুপাদে ধরি রায় করে নিবেদন॥
কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব প্রেমাতত্ত্ব সার।
রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার॥
এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈল প্রকাশন।
ব্রহ্মারে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ॥
অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়॥
এক আশ্চর্য্য মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে॥
পহিলে দেখিল তোমা সন্ন্যাসীস্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যামগোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখ কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্তি তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা॥
তাতে প্রকট দেখি সবংশী বদন।
নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমলনয়ন॥
এই মত তোমা দেখে হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার॥
তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ॥
গৌর অঙ্গে নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥

তাঁর ভাবে ভাবিত করি আত্মমন।
তবে কৃষ্ণ মাধুর্য্য রস করি আস্বাদন ॥

চৈতন্যদেবের এই প্রকৃত তত্ত্ব লইয়া স্বরূপ গোস্বামী তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন—

রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতিহ্লাদিনীশক্তিরস্মা
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

মহাপ্রভুর এক বহিরঙ্গ ভাব, এক অন্তরঙ্গ ভাব। হরিনাম প্রচারের জন্য, পাষণ্ডদলনের জন্য, ভক্তের অনুগ্রহ জন্য, তাঁহার বহিরঙ্গ ভাব। এই ভাবে কখনও তাঁহার ঐশ্বর্য্য, কখনও ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের সমন্বয়। কিন্তু অন্তরঙ্গ ভাবে, শ্রীমতীর মহাভাবে, তিনি সতত মধুর, মধুর হইতে মধুর। চৈতন্য কখনও কৃষ্ণ, কখনও রাধা, কখনও রাধাকৃষ্ণ।

চৈতন্য অবতারে রাধাকৃষ্ণের আবেশ। কেবল কৃষ্ণের আবেশ নহে।

রাধাকৃষ্ণ কে ?

'শ্রীশ্রীচৈতন্য কথা'র আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সূত্রধার মাধবেন্দ্রপুরী। দেখিয়াছি, সেই আবির্ভাবের মহা আয়োজন ও মহা আন্দোলন। দেখিয়াছি, প্রবল বিশ্বাসের সহিত মনের মহা আবেগে ভক্তগণ তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দেখিয়াছি, অদ্বৈতের আবাহন, বিশ্বরূপের পরিচর্য্যা, নিত্যানন্দের বিশ্বরূপ-ভাব গ্রহণ। বিশ্বরূপ ও নিত্যানন্দ দ্বারে সঙ্কর্ষণের তত্ত্ব জানিতে চেষ্টা করিয়াছি। বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণের নিত্যসম্বন্ধ ও আমাদের পার্থিব জগতে সেই সম্বন্ধের আভাস জানিতে যথাসাধ্য উদ্যম করিয়াছি। সেই উদ্যমে কৃষ্ণতত্ত্ব আমাদের সম্মুখীন হইয়াছিল। তদুপলক্ষে বালকবিশ্বম্ভরে, তরুণ অধ্যাপকে আমরা আগ্রহের সহিত অবতারের ভাব দেখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম। তাঁহার বাল্যে যাহা দেখি, তারুণ্যে সে ভাব দেখিতে পাই না। ক্রমে উদ্ধত বিশ্বম্ভর এক অসাধারণ আবেশের ভাবমধ্যে পতিত হইলেন। তাঁহার ভক্তগণের মধ্যেও আবেশের ভাব, বিশেষতঃ শ্রীবাসে নারদের ভাব। বিশ্বম্ভরে আবেশের ক্রম দেখিতে চেষ্টা পাইয়াছি। দেখিয়াছি, সে আবেশ রাধাকৃষ্ণের আবেশ।

এখন রাধাকৃষ্ণ কে ? মহাভারতের কৃষ্ণকে সকলেই স্বীকার করেন। মহাভারতের মধ্যেও আবার কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত পাঠ দেখেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ এক জন অসাধারণ মনুষ্য বিশেষ। সে কৃষ্ণের সহিত রাধিকার কোন সম্বন্ধই নাই। আবার পরম ভাগবত বৈষ্ণবগণ গোপীবল্লভ কৃষ্ণে বাসুদেব কৃষ্ণ দেখিতে পান না।

তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দহৃত-মানসাঃ।
যেষাং শ্রীশপ্রসাদোঽপি মনোহর্ত্তুং ন শক্নুয়াৎ॥
সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ২।৩১

"একান্ত অনুরক্ত ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা গোবিন্দ কর্তৃক অপহৃতচিত্ত তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। রুক্মিণীপতি কৃষ্ণের অনুগ্রহও তাঁহাদের মন হরণ করিতে পারে না। যদিচ সিদ্ধান্ত দ্বারা দ্বারকাপতি পরব্যোমাধিপ শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণে ভেদ নাই, তথাপি গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণই উৎকৃষ্ট। তিনি প্রেমময় ও প্রেমের আস্পদ।" মহাভারতের কৃষ্ণ পরব্যোমের অধিপতি বিষ্ণু। ভাগবতের কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্; রূপগোস্বামী বলেন যে,—

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ১।৯

জীবগোস্বামী বলেন,—কৃষ্ণশব্দশ্চাত্র স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তদ্রূপাণাং চান্যেষামপি গ্রাহকঃ।

'অনুকূলভাবে যে কৃষ্ণের অনুশীলন উত্তমা ভক্তি, সে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণরূপী অন্য অন্য কৃষ্ণ।' তবে কি কৃষ্ণ অনেক? তবে কি কোন কৃষ্ণ সত্য, কোন কৃষ্ণ কাল্পনিক? সিদ্ধান্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বর কৃষ্ণে ও মধুর কৃষ্ণে ভেদ নাই। তবে কি এ অভেদ—শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি—

সেইরূপ রাম ও কৃষ্ণের মত অভেদ?

কেহ বলেন যে, মহাভারতে যে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, তিনি যদি গোপীবল্লভ হইতেন, তাহা হইলে কি দিব্যদৃষ্টি মহামুনি ব্যাস জানিতে পারিতেন না? তাঁহার অপ্রতিহত যোগদৃষ্টিতে কি রাসলীলা অজ্ঞাত

থাকিত ? অথবা ব্যাসদেব কি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ লীলা মহাভারতে অপ্রকট রাখিয়াছিলেন ? করুণাময় ঋষি সমগ্র বেদের অর্থ নিরূপণ করিয়াছিলেন, তিনি কৃষ্ণের পরম মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছিলেন—তথাপি কি নির্গুণ ভক্তির চরম পথ দেখাইতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন ? যে রাধাকৃষ্ণের মহিমা একবার জানিবে, সে কি রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়া জীবন সার্থক করিবে না ? তবে কি শ্রীমতীর কৃষ্ণ, গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ, মহাভারতের অভিনয়ের পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ? একথাও বরং মানিব, তথাপি বলিব না যে, রাধাকৃষ্ণ কাল্পনিক। বরং বলিব যে, যোগমায়া ভগবতী সেই শুদ্ধ নিত্যলীলা অচিন্ত্য অভেদ্য মায়ায় আবৃত রাখিয়াছিলেন,—বলিব যে, ব্রহ্মার অগম্য সেই লীলা প্রকটিত করিবার সময় তখনও হয় নাই,—বলিব যে, বৃন্দাবনের অদৃশ্য চিত্রপটে, যমুনা-লহরীর গভীর অন্তঃস্তরে, ললিতলবঙ্গলতাজড়িত নিভৃত কুঞ্জকাননে, সেই লীলা লুক্কায়িত ছিল ; তথাপি বলিব না যে, রাধাকৃষ্ণ কাল্পনিক। যে গদগদ প্রেমময় ঢল ঢল মূর্ত্তি একবার স্বপনে নিরীক্ষণ করিয়াছি, সেই শ্রীমতীর মূর্ত্তি যদি কাল্পনিক হয়, তবে আমার জীবন কাল্পনিক। সেই অমানুষী মানুষী রূপকান্তি, সেই কৃষ্ণগতচিত্তা কৃষ্ণময়প্রাণার অত্যাশ্চর্য্য ভাব, সেই মহাযোগিনীর মহাযোগ, আমার হৃদয়ের অন্তস্তলে গভীর—অত্যন্ত গভীরভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। যাহা দেখিয়াছি, তাহা ভুলিবার নহে। সে রূপ আমার জীবনের সাথী, ধর্ম্মের চরম উদ্দীপনা, আদর্শের চরম লক্ষ্য। সেই লাবণ্যময় রূপের মধুর অমৃত-মাধুরী আমার জীবনে চিরকাল মধুরতা বিস্তার করিবে। কে বলে শ্রীমতী কাল্পনিক ? কে বলে শ্রীমতীর সখিগণ কাল্পনিক ? কে বলে রাসলীলা কবির কল্পনা ?

যদি কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ সত্য হন, তবে রাসেশ্বর কৃষ্ণও সত্য। যদি

মহাভারত সত্য হয়, তবে ভাগবতও সত্য। যদি ব্যাসদেব সত্য হন, তাহা হইলে শুকদেবও সত্য।

হইতে পারে—ব্যাসদেবের দৃষ্টি ও শুকদেবের দৃষ্টি স্বতন্ত্র! যখন যোগবলে শুকদেব বিধূম অগ্নির ন্যায় সূর্য্যমণ্ডলাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, তখন মন্দাকিনী-তীরে দেবকন্যাগণ তাঁহাকে নির্গুণ দেখিয়া বিবস্ত্রা হইয়া জলক্রীড়া করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। তাঁহার অন্বেষণে যখন ব্যাসদেব সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন দেবকন্যাগণ ভীত ও লজ্জিত হইয়া কেহ বা জলমধ্যে বিলীন হইলেন, কেহ বা গুল্মলতাদির অন্তরালে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং কেহ বা সত্বর হইয়া পরিধেয় বসন গ্রহণ করিলেন।

তাং মুক্ততাং তু বিজ্ঞায় মুনিঃ পুত্রস্য বৈ তদা।
সক্ততামাত্মনশ্চৈব প্রীতোঽভূদ্‌ব্রীড়িতশ্চহ॥

—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ৩৩৪।

'পুত্রের এই মুক্তভাব ও নিজের আসক্তভাব দেখিয়া ব্যাসদেব প্রীত ও লজ্জিত হইলেন।'

ব্যাসদেবে ও শুকদেবে যে ভেদ, সগুণ ও নির্গুণে যে ভেদ, 'শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মঃ' ও 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' এ দু'য়ে যে ভেদ, মহাভারত ও ভাগবতে যে ভেদ, রুক্মিণীরমণ ও রাধারমণে সেই ভেদ।

যদি ব্যসদেব বৃন্দাবনে যোগমায়াপ্রচ্ছন্ন লীলা না দেখিয়া থাকেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সে লীলার মধুর কৃষ্ণ, ঐশ্বর্য্যময় দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র হউন্, তাহাতেও ক্ষতি নাই। রাসলীলা কোন্ কালে বৃন্দাবন পবিত্র করিয়াছিল, কোন্ কালে সেই লীলা বৃন্দারণ্যের পূর্ব্বগগনে উদিত হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে দ্বিধা থাকিলেও কোন হানি নাই। সে লীলা নিত্যলীলা, কখনও প্রকট, কখনও অপ্রকট। প্রেমের রাজ্যে

সে লীলা নিত্য বিরাজিত। যেমন অন্ধকার সূর্য্যে স্থান পায় না, সেইরূপ সন্দেহ সে লীলাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না।

তথাপি আমরা মহাভারতের কৃষ্ণমধ্যে রাধাকৃষ্ণ দেখিতে পাই কি না এ বিষয়ে আলোচনা করিব।

মহাভারত ও গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ।

বঙ্কিমবাবু তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রে বলেন,—"মহাভারতে ব্রজগোপীদিগের কথা কিছুই নাই। সভাপর্ব্বে শিশুপাল-পর্ব্বাধ্যায়ে শিশুপাল-কৃত সবিস্তার কৃষ্ণনিন্দা আছে। যদি মহাভারত প্রণয়ন কালে ব্রজগোপীগণ-ঘটিত কৃষ্ণের এই কলঙ্ক থাকিত, তাহা হইলে, শিশুপাল অথবা যিনি শিশুপাল-বধ-বৃত্তান্ত প্রণীত করিয়াছেন, তিনি কখনই কৃষ্ণ-নিন্দাকালে তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। অতএব নিশ্চিত যে, আদিম মহাভারত-প্রণয়ন কালে এ কথা চলিত ছিল না; তাহার পরে গঠিত হইয়াছে।

মহাভারতে কেবল ঐ সভাপর্ব্বে দ্রৌপদী বস্ত্রহরণ কালে, দ্রৌপদীকৃত কৃষ্ণস্তবে 'গোপীজন প্রিয়' শব্দটা আছে, যথা—

আকৃষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্যা চিন্তিতো হরিঃ।
গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়॥

বৃন্দাবনে গোপীদের বাস। গোপ থাকিলেই গোপী থাকিবে। কৃষ্ণ অতিশয় সুন্দর, মাধুর্য্যময় এবং ক্রীড়াশীল বালক ছিলেন, এজন্য তিনি গোপ-গোপী সকলেরই প্রিয় ছিলেন। হরিবংশে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন; এবং যমলার্জ্জুন ভঙ্গ প্রভৃতি উৎপাত কালে শিশু কৃষ্ণকে বিপন্ন দেখিয়া গোপরমণীগণ রোদন করিত, এরূপ লেখা আছে। অতএব এই 'গোপীজনপ্রিয়' শব্দে শিশুর প্রতি স্ত্রীজনসুলভ স্নেহ ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না।"

শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন-লীলা উল্লেখ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে মহাভারতে কেবল নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি মাত্র আছে—

পূতনাঘাত-পূর্ব্বাণি কর্ম্মাণ্যস্য বিশেষতঃ।
ত্বয়া কীর্ত্তয়তাস্মাকং ভূয়ঃ প্রব্যথিতং মনঃ॥
যত্র কুৎসা প্রয়োক্তব্যা ভীষ্ম বালতরৈর্নরৈঃ।
ত্বমিমং জ্ঞানবৃদ্ধঃ সন্ গোপং সংস্তোতুমিচ্ছসি॥
যদ্যনেন হতা বাল্যে শকুনিশ্চিত্রমত্র কিম্।
তৌ বাশ্ববৃষভৌ ভীষ্ম যৌন যুদ্ধবিশারদৌ॥
চেতনারহিতং কাষ্ঠং যদ্যনেন নিপাতিতম্।
পাদেন শকটং ভীষ্ম তত্র কিং কৃতমদ্ভুতম্॥
বল্মীকমাত্রং সপ্তাহং যদ্যনেন ধৃতোঽচলঃ।
তদা গোবর্দ্ধনো ভীষ্ম ন তচ্চিত্রং মতং মম॥

—সভাপর্ব্ব, ৪১ অধ্যায়।

"কৃষ্ণের পূতনাঘাত প্রভৃতি কর্ম্মসকল বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়া তুমি আমাদিগের অন্তঃকরণে অত্যন্ত বেদনা দিলে। নিতান্ত অনভিজ্ঞ মনুষ্যেরাও যাহার প্রতি কুৎসা প্রয়োগ করিতে পারে, তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়া সেই গোপালকে কি বলিয়া স্তব করিতে সমুৎসুক হইতেছ? ওহে ভীষ্ম! কৃষ্ণ বাল্যকালে যদি একটা শকুনি বধ করিয়া থাকে, অথবা সেই যুদ্ধানভিজ্ঞ অশ্ব ও বৃষভকে বিনষ্ট করিয়া থাকে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? অপিচ যদি এ চেতনাশূন্য কাষ্ঠের শকট পদদ্বারা নিপাতিত করিয়া থাকে, তাহাতেই বা কি অদ্ভুত কর্ম্ম করা হইয়াছে? অহে ভীষ্ম! বল্মীক-পিণ্ডতুল্য গোবর্দ্ধন-গিরি যদিও এক সপ্তাহ কাল ধারণ করিয়া থাকে, তথাপি আমার বিবেচনায় তাহা বিচিত্র নহে।"

—বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

যদি এ কথা স্বীকার করা যায় যে, বৃন্দাবন-কেলিবার্ত্তা সে সময়েও অপ্রকট ছিল, কেবল ভীষ্মদেব প্রভৃতি ভক্তগণ জানিতেন, তাহা হইলে

ইহাও সম্ভব যে, লজ্জাবশতঃ ভীষ্মদেব গোপী-রমণ-লীলা সভা মধ্যে প্রকাশ করেন নাই, এবং সেই জন্য শিশুপাল তাহার উল্লেখ করেন নাই।

কিন্তু পূতনাবধাদি লীলা সকলেই জানিতেন। গোপী-রমণ-লীলা কি কেহই জানিতেন না? কাতরা দ্রৌপদী প্রাণভরে রোদন করিয়া বলিলেন,—

গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়।
কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব॥
হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথার্ত্তিনাশন।
কৌরবার্ণবমগ্নাং মামুদ্ধরস্ব জনার্দ্দন॥

'ব্রজনাথার্ত্তিনাশন'—এটি যেন ব্রজগোপীর কাতরোক্তির প্রতিধ্বনি।

বিষ জলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্ বর্ষমারুতাদ্ বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াদ্ ঋষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ॥

এই জন্যই মহাভারতের হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয় ছিলেন, এবং ব্রজগোপীরাও এই জন্য তাঁহাকে 'ব্রজজনার্ত্তিহন্' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন।

বনপর্ব্বে অর্জ্জুন বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার উল্লেখ করিয়াছিলেন।

যানি কর্ম্মাণি দেব ত্বং বালএব মহাবলঃ।
কৃতবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ বলদেব সহায়বান্।
কৈলাসভবনে চাপি ব্রাহ্মণৈর্ন্যবসঃ সহ॥—বনপর্ব্ব—১২

নীলকণ্ঠ বলেন,—'কর্ম্মাণি পূতনাবধাদীনি'। অর্জ্জুনও কি গোপী-রমণ-লীলা জানিতেন না? কৃষ্ণসখা, স্বয়ং নরঋষি—তিনিও গোপীলীলা জানিতেন না?

মনে সন্দেহ অবশ্য হইতে পারে। এমনই কি যোগমায়ার প্রাদুর্ভাব যে ব্যাসদেব, দ্রৌপদী, শিশুপাল, ভীষ্মদেব এবং অর্জ্জুন বৃন্দাবনলীলার

কথা অবগত হইলেও গোপী-লীলার কথা কিছুই জানিতেন্ না? তবে কি গোপীলীলার শ্রীকৃষ্ণ অন্য। রাসবিহারী কি রুক্মিণীবল্লভ হইতে প্রকৃতই ভিন্ন?

রাজা ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হইলেও সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টি-বলে, বিদুরের উপদেশে, ঋষিগণের শিক্ষায় সকল কথা জানিতেন। তিনি যে কৃষ্ণরহস্য জানিতেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়াছিলেন। বৃন্দাবন-লীলা যতদূর জানা সম্ভব ছিল, তিনি অবগত ছিলেন। তথাপি অত্যাশ্চর্য্য অপরূপ মহাযোগেশ্বরেশ্বরের মহাযোগময় রাসলীলার কথা তিনিও কিছুই জানিতেন না। ধৃতরাষ্ট্র উবাচ,—

শৃণু দিব্যাণি কর্ম্মাণি বাসুদেবস্য সঞ্জয়।
কৃতবান্ যানি গোবিন্দো যথানান্যঃ পুমান্ ক্বচিৎ॥
গোকুলে বর্দ্ধমানেন বালেনৈব মহাত্মনা।
বিখ্যাপিতং বলং বাহ্বো স্ত্রিষু লোকেষু সঞ্জয়॥
উচ্চৈঃশ্রবস্তুল্যবলং বায়ুবেগসমং জবে।
জঘান হয়রাজং তং যমুনাবনবাসিনম্॥
দানবং ঘোরকর্ম্মাণং গবাং মৃত্যুমিবোত্থিতম্।
বৃষরূপধরং বাল্যে ভুজাভ্যাং নিজঘানহ॥
প্রলম্বং নরকং জম্ভং পীঠঞ্চাপি মহাসুরম্।
মুরঞ্চামরসঙ্কাশ মবধীৎ পুষ্করেক্ষণঃ॥—দ্রোণপর্ব্ব, ১০।

যথন শ্বেতদ্বীপাধিপতি নারায়ণ নারদ-ঋষির প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ভবিষ্যৎ-কৃষ্ণলীলা বর্ণন করেন, তখনও গোপী-রমণ-লীলার কোন আভাস পাওয়া যায় না। (শান্তিপর্ব্ব ৩৩৯)। হয়ত কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রসঙ্গে, রাসলীলার কথা না থাকিতে পারে; কিন্তু সমগ্র মহাভারতে এমন কি কোন প্রসঙ্গ নাই, যাহাতে রাসলীলার আভাস থাকিতে পারে?

যদি রাসেশ্বর কৃষ্ণ অন্য হন, তবে তিনি কে? পূর্ব্বে জানিয়াছি, নরনারায়ণ ঋষি কার্য্যের অবসানে শেষশায়ী নারায়ণের নিকট গমন করেন। মহাভারতে স্বর্গারোহণ-পর্ব্বে কথিত আছে,—

যঃ স নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ।
তস্যাংশো বাসুদেবস্তু কর্ম্মণোহন্তে বিবেশহ॥

"দেবদেব সনাতন নারায়ণের অংশে যিনি বাসুদেবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি কার্য্যাবসানে নারায়ণে প্রবিষ্ট হন।"

অংশরূপী শ্রীকৃষ্ণের লীলামধ্যে রাসলীলা দেখিতে পাই না। তবে কি স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ অন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া রাসলীলা করিয়াছিলেন। যদি তাহাই হয়, তবে কোন প্রকৃতি অধিষ্ঠান করিয়া তিনি এইরূপ লীলা করেন। শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ নারায়ণ-ঋষি অন্তর্ধানের পূর্ব্বে মৈত্রেয় ঋষিকে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া যান। রাসলীলার জন্য কি তবে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ মৈত্রেয় ঋষির শরীর আশ্রয় করিয়াছিলেন?

প্রকট লীলা ও অপ্রকট লীলা গোস্বামীদিগের মতে ভিন্ন। অপ্রকট লীলার মধ্যেই তাঁহারা স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণকে দেখিতে পান। দেখি, যদি বৈষ্ণবগ্রন্থে এ বিষয়ে কোন আলোক পাওয়া যায়।

কৃষ্ণের বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন।

শ্রীকৃষ্ণের উদ্ধব-প্রেরিত সন্দেশ একটি গূঢ় রহস্য।

কংস-নিধনের পর নন্দকে সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

যাত যূয়ং ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্নেহদুঃখিতান্।
জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টু মেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্॥

ভাঃ পুঃ ১০-৪৫-২৩

'হে পিতঃ! ব্রজবাসীদিগের সহিত তুমি এখন ব্রজে ফিরিয়া যাও। আমরা জ্ঞাতিবর্গের সুখ বিধান করিয়া আবার তোমাদিগকে দেখিতে গমন করিব।'

এই আশা-বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া ব্রজবাসীরা অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশা ক্রমে দুরাশা হইতে লাগিল। কত দিনের পর শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে তাঁহার সংবাদ লইয়া বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন।

উদ্ধব নন্দকে বলিলেন—

আগমিষ্যত্যদীর্ঘেণ কালেন ব্রজমচ্যুতঃ।
প্রিয়ং বিধাস্যতে পিত্রোর্ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ॥
হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে প্রতীপং সর্ব্বসাত্বতাম্।
যদাহ বঃ সমাগত্য কৃষ্ণঃ সত্যং করোতি তৎ॥

'অদীর্ঘকালে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আগমন করিবেন, এবং মাতা-পিতার প্রিয় বিধান করিবেন। তিনি রঙ্গ মধ্যে কংসকে নিধন করিয়া প্রত্যাগমন সম্বন্ধে যে বাক্য বলিয়াছেন, তাহা পূর্ণ করিবেন।'

উদ্ধব ব্রজগোপীদিগকে কিন্তু একথা বলিবেন না। তিনি তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের নিম্নলিখিত সংবাদ শুনাইলেন—

যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়োদৃশাম্।
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া॥
যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ত্ততে।
স্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চেতঃ সন্নিকৃষ্টেঽক্ষগোচরে॥
ময্যাবেশ্য মনঃ কৃৎস্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ।
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ॥
যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ।
অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্য আপুর্মদ্বীর্য্যচিন্তয়া॥ ভাঃ পুঃ ১০-৪৭

'আমি যে আপনাদিগের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিতেছি, তাহার কারণ এই যে, আপনারা আমার সতত ধ্যান করিলে, আমি আপনাদের মানসিক সন্নিকর্ষ লাভ করিব। প্রিয়তম ব্যক্তি যদি দূরে থাকে, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের মন তাহাতে আবিষ্ট হয়। চক্ষুর নিকটবর্ত্তী লোক প্রিয়তম হইলেও মন তাহাতে আবিষ্ট হয় না। সমগ্র মন আমাতে আবিষ্ট করিয়া, অশেষ মনোবৃত্তি হইতে বিমুক্ত হইয়া, আমাকে নিত্য অনুস্মরণ করিলে, আপনারা আমাকে অচিরাৎ প্রাপ্ত হইবেন। আমি যখন ব্রজে রাসক্রীড়া করি, তখন কোন কোন গোপ-রমণী পতিকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া সেই ক্রীড়ায় যোগ দিতে পারেন নাই। কিন্তু হে কল্যাণময়ী ব্রজসুন্দরীগণ! আমার বীরত্ব চিন্তা করিয়া তখনই আমাকে তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।'

ইহা ত নিত্যলীলা, বিয়োগ-শূন্য নিত্যযোগের কথা। ইহা ত পার্থিব বিরহের অত্যন্ত অভাব। ইহা ত স্থূলদেহে অভিমান-শূন্যতা। হয়ত এখানে নারায়ণ ঋষিও নাই, মৈত্রেয় ঋষিও নাই। হয়ত আবশ্যক হইলে, নিত্য-

লীলার অভিনায়ক মধুর কৃষ্ণচন্দ্র, মৈত্রের ঋষির দেহ পরিচ্ছদরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। হয়ত তিনি এইরূপে নারায়ণ ঋষির দেহ পরিচ্ছদরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অদ্বয় নিত্য তত্ত্ব বস্তুতঃ নারায়ণ ঋষিও নহেন, মৈত্রেয় ঋষিও নহেন; তিনি "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

"ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু" নামক অপরূপ গ্রন্থে শ্রীরূপগোস্বামী গোপদিগের বিরহ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—

প্রোক্তেয়ং বিরহাবস্থা স্পষ্টলীলানুসারতঃ।
কৃষ্ণেন বিপ্রয়োগঃ স্যান্ন জাতু ব্রজবাসিনাম্॥

তথাচ স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—

বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সদা ক্রীড়তি মাধবঃ।
বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈর্বৃতঃ॥ ৩-৫৭

'এই যে বিরহাবস্থার বর্ণনা করা গেল, সে প্রকটলীলার অনুসারে; অপ্রকট নিত্য লীলায়, ব্রজবাসীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথনই বিয়োগ হয় না।'

জীব গোস্বামী বলেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে পুনরাগমন করিলে, প্রকট-লীলা ও অপ্রকট-লীলা দুই একীভূত হয়। তখন প্রকট-লীলা-গত বিরহের শান্তি হয়।

শ্রীকৃষ্ণ কবে বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, এই বিষয় লইয়া জীব গোস্বামী এক তুমুল বিচার তুলিয়াছেন। বাৎসল্য-রসের স্থায়িভাব দেখাইতে, রূপ গোস্বামী বিদগ্ধ-মাধবের এক শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ শ্লোক ভিত্তি করিয়া জীব গোস্বামী নিত্য স্থিতির বিচার আরম্ভ করিতেছেন।

তত্র সত্যসঙ্কল্পতয়া বেদাদিগীতস্য তস্য 'জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখ'মিতি প্রত্যাগমন-সংকল্পঃ শ্রীদশমে স্পষ্ট এব।

'ভগবান্ সত্যসংকল্প। বেদাদি বাক্যে ইহা গীত হইয়াছে। ভাগবতের দশমস্কন্ধে সেই ভগবান্ স্পষ্টই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, জ্ঞাতি-বর্গের সুখ বিধান করিয়া তিনি বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিবেন।'

তদেতদেব বিবৃতং শ্রীমদুদ্ধবেন। হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে ইত্যাদি।

'উদ্ধব মহাশয়ও এই কথা নন্দের নিকট বলিয়াজিলেন।'

অত্র পিত্রোঃ প্রিয়বিধানং খলু সদা তৎসংযোগ এবেতি।

'পিতামাতার প্রিয়বিধান সর্ব্বদা কৃষ্ণসংযোগ দ্বারাই হইতে পারে।'

তদেতদাগমন সময়শ্চ দন্তবক্রবধানন্তরমেব।

'দন্তবক্রবধের পরই শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।'

যথা সূচিতং স্বয়মেব।

অপি স্মরথ নঃ সখ্যঃ স্বানামর্থচিকীর্ষয়া।
গতাংশ্চিরায়িতান্ শত্রুপক্ষ-ক্ষপণ-চেতসঃ॥

ইতি ভাঃ পুঃ ১০-৮২

ভগবান্ নিজেই একথার সূচনা করিয়াছেন। তিনি কুরুক্ষেত্রে গোপীদিগের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়া বলিয়াছিলেন—'হে সখিগণ! আমাদিগকে কি তোমরা স্মরণ কর? আত্মীয়গণের প্রিয়সাধনেচ্ছায় আমাদের অনেক বিলম্ব হইয়াছে। এখন শত্রুপক্ষনাশের জন্যই আমাদের চিত্ত নিবিষ্ট।'

এখন জীবগোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাস্য এই যে, কুরুক্ষেত্র-মিলন ভাগবতের দশমস্কন্ধের ৮২ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু ৭৮ অধ্যায়ে দন্তবক্রবধের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "দন্তবক্রবধের পর আমরা বৃন্দাবনে যাইব"—এরূপ সূচনা তিনি ভগবদুক্তিতে কোথায় পাইলেন?

তদিদং শত্রুবধান্তে দন্তবক্রেঽপি শান্তে নিজাগমনং ভাবীতি কুরুক্ষেত্র-যাত্রায়াং শ্রীভগবদ্বচনং। যাত্রা চেয়ং দন্তবক্রবধাৎ পূর্ব্বমেব।

'দন্তবক্র নিহত হইলে, শত্রুবধান্তে, বৃন্দাবন গমন করিবেন, এইরূপ কথা ভগবান্ কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় বলিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যাত্রা দন্তবক্রবধের পূর্ব্বেই হইয়াছিল।'

এখন জানিলাম, জীবগোস্বামীর মতে, অধ্যায়ের অগ্রপশ্চাৎ এখানে ধর্ত্তব্য নয়। কেন?

অত্র বনপর্ব্বরীত্যা শাল্ববধসহিতস্যাস্য দন্তবক্রবধস্য সমকালমেব হি পাণ্ডবানাং বনগমনং তেষাং আগমনানন্তরমেব চ ভীষ্মাদিবধময় ভারতযুদ্ধম্। সা যাত্রা চ ভীষ্মাদ্যাগমনময়ীতি।

'মহাভারতের বনপর্ব্ব অনুসারে শাল্ববধ ও দন্তবক্র-বধের সমকালেই পাণ্ডবেরা বনে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বন হইতে প্রত্যাগমন করিলে, ভারত-যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, যাহাতে ভীষ্মাদি নিহত হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় ভীষ্মাদির আগমন-কথা শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইয়াছে।'

এইজন্য জীবগোস্বামী বলিতে চাহেন যে, কুরুক্ষেত্র-যাত্রার পর দন্তবক্র নিহত হইয়াছিল, এবং দন্তবক্র-বধের পর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কথাটি ভাল বুঝা গেল না।

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে বলিয়াছিলেন যে, শাল্ববধে ব্যাপৃত থাকায় তিনি হস্তিনায় গমন করিতে পারেন নাই। "আমি গমন করিলে হয়ত দুর্য্যোধন জীবিত থাকিত না, কিংবা দ্যূতক্রীড়া হইত না।"

তদেতৎ কারণং রাজন্ যদহং নাগসাহ্বয়ম্
নাগমং পরবীরঘ্ন নহি জীবেৎ সুযোধনঃ॥
ময্যাগতেঽথবা বীর দ্যূতং ন ভবিতা তথা।
অদ্যাহং কিং করিষ্যামি ভিন্নসেতুরিবোদকম্॥—বনপর্ব্ব ২২

ইহা হইতে এইমাত্র বুঝা যায় যে, শাল্ববধের সমকালে পাণ্ডবেরা বনগমন

করিয়াছিলেন; এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে কোনও সময়ে কুরুক্ষেত্র যাত্রা হইয়াছিল।

তথা শ্রীবলদেব-তীর্থযাত্রা কুরুক্ষেত্রযাত্রাতঃ পূর্ব্বং পঠিতা তত্তীর্থযাত্রা চ দুর্য্যোধনবধদিনে পূর্ণেতি।

'শ্রীবলদেবের তীর্থযাত্রা কুরুক্ষেত্রযাত্রার পূর্ব্বেই ভাগবতে লিখিত হইয়াছে। তাঁহার তীর্থযাত্রা দুর্য্যোধন-বধের দিনে পূর্ণ হইয়াছিল।'

একথা বেশ বোধগম্য হয়। ভাগবতের দশম স্কন্ধে ৭৮ অধ্যায়ে দন্তবক্র-বধের কথা লিখিত হইয়াছে। আর ঐ অধ্যায়ে বলদেবের তীর্থ-যাত্রার কথাও আছে।

শ্রুত্বা যুদ্ধোদ্যমং রামঃ কুরূণাং সহ পাণ্ডবৈঃ।
তীর্থাভিষেকব্যাজেন মধ্যস্থঃ প্রযযৌ কিল॥

৮২ অধ্যায়ে বর্ণিত কুরুক্ষেত্র-যাত্রার পূর্ব্বেই; বলদেবের তীর্থযাত্রা ভাগবতে লিখিত হইয়াছে। দুর্য্যোধন-বধের দিন বলদেব তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, একথা মহাভারতে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

দন্তবক্রবধানন্তরং প্রত্যাগমনঞ্চ তস্য পাদ্মোত্তরখণ্ডে স্ফুটং দৃশ্যতে। কৃষ্ণোঽপি তং হত্বা যমুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং গত্বা সোৎকণ্ঠৌ পিতরাবভিবাদ্যাশ্বস্য তাভ্যাং সাশ্রুকণ্ঠ মালিঙ্গিতঃ সকলগোপবৃদ্ধান্ প্রণম্যাশ্বস্য বহুবস্ত্রাভরণাদি-ভিস্তত্রস্থান্ সর্ব্বান্ সন্তর্পয়ামাসেতি গদ্যেন।

'দন্তবক্র-বধের পর শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, এ কথা মহাভারতে স্পষ্টরূপে না থাকিলেও পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে স্পষ্ট দেখা যায়। 'কৃষ্ণ দন্তবক্রকে বধ করিয়া যমুনায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি নন্দব্রজে গমন করিয়া উৎকণ্ঠিত পিতা-মাতাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আশ্বাসবাক্য প্রদান করিয়াছিলেন। নন্দ ও যশোদা সাশ্রুকণ্ঠে

কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপবৃন্দকে প্রণামানন্তর আশ্বাসিত করিয়া, প্রভূত বস্ত্রাভরণাদি দ্বারা বৃন্দাবনস্থ সকলকে সন্তর্পিত করিয়াছিলেন।'

জীবগোস্বামীর কথা বজায় থাকিল বটে, কিন্তু আমাদের কায হইল না। কৃষ্ণ যদি একদিনের জন্য বৃন্দাবনে যাইয়া পিতামাতাকে দেখা দিয়া আসেন, তাহা হইলে হয়ত নন্দের নিকট সত্য রক্ষা করা হইবে।

যাত যূয়ং ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্নেহদুঃখিতান্।
জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্॥

কিন্তু ব্রজগোপীর নিকট তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার কি হইবে? উদ্ধব-প্রমুখাৎ তিনি যে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, সে ত এক দিনের মিলন নয়। সে যে চিরমিলন, নিত্যমিলন। আচ্ছা দেখি, জীব-গোস্বামী আর কি বলেন।

অতঃ শ্রীভাগবতে চ ভারতযুদ্ধানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বারকাপ্রবেশে প্রথমস্কন্ধস্থ দ্বারকাপ্রজাবচনং 'যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্ কুরূন্মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া' ভাঃ পুঃ ১।১১।৯ তত্রমধূন্ মথুরাংশ্চেতি স্বামিটীকাচ সুহৃদশ্চ তদা তত্র শ্রীব্রজস্থা এব।

'ভারত-যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকা-প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন দ্বারকার প্রজাবর্গ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে অম্বুজাক্ষ, তুমি সুহৃদ্গণকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া যখন কুরু ও মধু প্রদেশে গমন করিয়াছিলে, তখন এক মুহূর্ত্তও আমাদের কাছে কোটি বৎসর বলিয়া মনে হইয়াছিল। এখানে শ্রীধর স্বামী 'মধু' শব্দের অর্থ মথুরা প্রদেশ বলেন। তাহা হইলে সুহৃদ্গণ ব্রজবাসী ভিন্ন আর কে হইতে পারে?' এইরূপে জীবগোস্বামী মহাশয় দন্তবক্রবধের অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন প্রত্যাগমন সাব্যস্ত করিলেন। তাহার পর আর একটি নূতন কথায় তিনি

অবতারণা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিলে, নন্দাদির এক ভাবান্তর হয়। পদ্মপুরাণে সেই গূঢ় কথা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

"তত্রস্থা নন্দাদয়ঃ পুত্রদারসহিতাঃ পশুপক্ষিমৃগাদয়শ্চ বাসুদেবপ্রসাদেন দিব্যরূপধরা বিমানমারূঢ়াঃ পরমং বৈকুণ্ঠলোকমবাপুরিতি। কৃষ্ণস্তু নন্দগোপ-ব্রজৌকসাং সর্ব্বেষাং নিরাময়ং স্বপদং দত্ত্বা দিবি দেবগণৈঃ সংস্তূয়মানো দ্বারবতীং বিবেশেতি চ।"

'বৃন্দাবনবাসী পশু-পক্ষি-মৃগাদি এবং পুত্রদার সহিত নন্দাদি বাসুদেবের অনুগ্রহে দিব্যরূপ ধারণ করিয়া বিমানে আরোহন পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও নন্দগোপ প্রভৃতি ব্রজবাসীদিগকে নিরাময় নিজপদ প্রদান করিয়া, স্বর্গে দেবগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া দ্বারাবতী প্রবেশ করিয়াছিলেন।'

এইবার জীবগোস্বামীর চক্ষু স্থির হইল। একি ? নন্দ পুত্র ও যশোদার সহিত বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইলেন। নন্দের পুত্র ত' কৃষ্ণ, নন্দের স্ত্রী যশোদা। তবে নিত্যবৃন্দাবনের কি হইবে।

তত্র নন্দাদয়ঃ পুত্রদার-সহিতা ইতি। শ্রীমন্নন্দস্য তদ্বর্গমুখ্যস্য পুত্রঃ শ্রীকৃষ্ণ এব। দারাচ শ্রীযশোদৈব। ইতি প্রসিদ্ধমপি পুত্রাদি শব্দোক্ত্যা তত্তদ্রূপৈরেব তৈঃ সহ তত্র প্রবেশ ইতি গম্যতে।

'বাস্তবিক পুত্রাদির সহিত নন্দ বৈকুণ্ঠে যান নাই। তত্তৎ রূপ-বিশিষ্টের সহিত তিনি বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন।'

অতো ব্রজং প্রতি প্রত্যাগমনরূপেণ বাসুদেবপ্রসাদেন দিব্যরূপধরা ইতি উল্লাসেন পরম বিরাজমানরূপত্বমেব বিবক্ষিতম্। বিমানেন তেষাং পরমবৈকুণ্ঠপ্রস্থাপনঞ্চ প্রাপঞ্চিকজনস্য বঞ্চনার্থমেব প্রপঞ্চিতম্। বস্তুতস্তু তদদৃশ্যে বৃন্দাবনস্যৈব প্রকাশবিশেষে প্রবেশনং প্রবেশ্য চ তত্র স্থিতানাম-প্রকট-প্রকাশানামেষু প্রকটচরপ্রকাশেষ্বন্তর্ভাবনং কৃতম্।

'শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে প্রত্যাগমন এক মহা উল্লাসের কারণ হইয়াছিল। সেই উল্লাসে নন্দ আদির পরম শোভমান রূপ হইয়াছিল। তাই পদ্ম-পুরাণে 'বাসুদেবপ্রসাদেন দিব্যরূপধরাঃ' বলা হইয়াছে। বিমান দ্বারা তাঁহাদের বৈকুণ্ঠ প্রস্থাপন—এটা কেবল প্রাকৃত লোকের বঞ্চনার্থ প্রপঞ্চ বাক্য। বাস্তবিক তাঁহারা বৃন্দাবনের অদৃশ্য প্রকাশ-বিশেষে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেই অদৃশ্য বৃন্দাবনে তাঁহারা অপ্রকট হইয়াছিলেন। অপ্রকট ও প্রকটরূপের মিলনই পদ্মপুরাণের বৈকুণ্ঠগমন।'

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল; কিন্তু কথার মীমাংসা হইল না। পদ্মপুরাণের বাক্য সহজে বঞ্চনা বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহিনা। আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, পদ্মপুরাণের বাক্য ও ভগবানের বাক্য এক। তাহাতে বঞ্চনা নাই। পরন্তু তাহার মধ্যে গূঢ় রহস্য নিবিষ্ট রহিয়াছে। মহাপ্রভুর বাক্য দ্বারা সেই রহস্যের সমাধান করিতে চেষ্টা করিব। হয়ত আমার বামনের প্রয়াস। মহাপ্রভুর অনুগ্রহই একমাত্র বল।

রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের সমাধান।

পদ্মপুরাণে সহজ কথায় বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিলে, ব্রজবাসিগণ বিমানারূঢ় হইয়া বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে দেহত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা অভিনব দেহে অপ্রকট-লীলায় সঙ্গত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা "বাসাংসি জীর্ণানি" ত্যাগ করিয়া, নিত্যলীলার উপযোগী দেহ ধারণ করিয়াছিলেন।

জীব গোস্বামী বলেন, এমন ব্রহ্মলোক-গমন ত ব্রজবাসীদিগের পক্ষে নূতন নয়। দশমস্কন্ধের অষ্টাবিংশতি অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, নন্দ অরুণোদয়ের পূর্ব্বে স্নানার্থে কালিন্দীর জলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই জন্য বরুণদেবের অনুচরগণ তাঁহাকে বরুণালয়ে লইয়া গিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বরুণের নিকট হইতে পিতাকে আনয়ন করিলেন। নন্দ বিস্মিত হইয়া সেই কথা জ্ঞাতিবর্গকে বলিলেন। গোপ-সকল মনে মনে ভাবিলেন, কৃষ্ণ কি আমাদিগকে সূক্ষ্ম গতি দেখাইবেন না? ভগবান্ তাঁহাদের হৃদয়ের কল্পনা জানিতে পারিলেন। তখন তিনি তমসের অপর পারে অবস্থিত নিজলোক তাঁহাদিগকে দেখাইলেন।

দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্‌ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্॥
যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ।
তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেণ চোদ্ধৃতাঃ।
দদৃশুর্ব্রহ্মণোলোকং যত্রাক্রুরোঽধ্যগাৎ পুরা॥

এই ত ব্রজ-গোপেরা ব্রহ্মহ্রদে স্নান করিয়াই ব্রহ্মলোক দর্শন করিল।

আবার শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মহ্রদ হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রকট বৃন্দাবনে পুনঃ স্থাপিত করিলেন।

অবশ্য পূর্ণশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণে সকলই সম্ভব। হয়ত এই ব্রহ্মলোক-দর্শন ক্ষণিকের জন্য। কিন্তু এই ব্রহ্মলোক-দর্শনে হয়ত এক গভীর রহস্য নিহিত আছে। গোবর্দ্ধন-ধারণ ও রাসলীলার মধ্যভাগে নন্দের বরুণালয় হইতে প্রত্যানয়ন বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীধর স্বামী বলেন—

গোবর্দ্ধনং সমুদ্ধৃত্য বশে কৃত্বাহমরেশ্বরম্।
নন্দানয়নতঃ কৃষ্ণো বরুণঞ্চ বশেহনয়ৎ॥

'গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া কৃষ্ণ সুরপতি ইন্দ্রকে বশে আনিয়াছিলেন। নন্দকে আনয়ন করিয়া তিনি বরুণকেও বশবর্ত্তী করিয়াছিলেন।' বৈদিক-ধর্ম্ম-অনুযায়ী শাসন ইন্দ্র ও বরুণদেবের হস্তে ন্যস্ত। শ্রীকৃষ্ণ বিধির অতীত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এই জন্য বৈধকর্ম্মের নিয়োজক ইন্দ্র ও বরুণকে প্রথমে বশমধ্যে আনিয়াছিলেন।

হইতে পারে, অন্য রহস্যও ইহার মধ্যে আছে। হইতে পারে, গোপগণ দেহান্তরিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিয়াছিলেন। সেই জন্যই হয়ত মহাভারতে রাসলীলার ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ নাই।

সে যাহাই হউক, প্রকট-লীলা ও অপ্রকট-লীলার মধ্যে যে দেহের ব্যবধান আছে, সে পক্ষে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যই ইহাতে প্রমাণ।

উদ্ধবের মুখে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদিগকে বলিলেন—

ময্যাবেশ্য মনঃ কৃৎস্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ।
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ॥ ১০-৪৭-৩৬

এই কথা বলিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে বলিলেন—

যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেহস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ।
অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্য আপুর্ম্মদ্বীর্য্যচিন্তয়া॥

শ্রীকৃষ্ণ পাগল নহেন। তিনি প্রলাপ বাক্য বলেন না! তাঁহার বাক্যে অসংলগ্নতা থাকিতে পারে না। তাঁহার প্রতিকথাই তত্ত্বপূর্ণ।

'হে ব্রজসুন্দরীগণ! তোমরা, অশেষ মনোবৃত্তি ত্যাগ করিয়া, একমাত্র আমাতে চিত্ত সমাহিত কর! আমার ধ্যান করিতে করিতে অচিরাৎ আমাকে তোমরা প্রাপ্ত হইবে।' ব্রজসুন্দরীরা মনে মনে করিলেন, প্রভো! কেবল ধ্যান দ্বারা তোমাকে কেমন করিয়া পাইব? মানসিক ধ্যান ও তোমাকে সাক্ষাৎ দর্শন, এ দু'য়ে কি ভেদ নাই?

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের শঙ্কা সমাধান করিয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "কেন, আপনারা কি জানেন না? যে সকল গোপনারী পতি, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধু কর্তৃক নিবারিত হইয়া, রাসলীলার জন্য গৃহ হইতে নির্গত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা কি করিয়াছিলেন?"

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্ গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ॥

তাঁহারা কৃষ্ণ-ভাবনা-যুক্ত হইয়া নিমীলিত লোচনে কৃষ্ণের ধ্যান করিয়াছিলেন। এই ধ্যানের ফল কি হইয়াছিল?

দুঃসহপ্রেষ্ঠ বিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ নির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥

'সেই গোপনারীগণের শুভ ও অশুভ কর্ম্মবীজ নষ্ট হইয়া গেল! তাঁহাদের প্রারব্ধের নাশ হইল। তাঁহারা গুণময় দেহ ত্যাগ করিলেন, এবং নিত্যদেহে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য সঙ্গত হইলেন।'

কথাটা বলিতে কি বাকি থাকিল? অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ গুণময় দেহ-ত্যাগের কথা স্পষ্টাক্ষরে বলেন নাই। তিনি কেবল মাত্র বলিলেন—

যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ।
অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্য আপুর্মদ্বীর্য্যচিন্তয়া॥

'হে কল্যাণীগণ, সেই গোপীগণ ধ্যান দ্বারা আমাকে যেরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তোমরাও সেইরূপে আমার ধ্যান দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইবে।'

ভাগবতের পাঠক মাত্র জানেন, ব্রজগোপীরা জানিতেন, গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়া সেই গোপাগণ কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

প্রকট-লীলায়, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রত্যাগত হইয়া ব্রজগোপীদিগের সহিত নিত্য বাস করেন নাই। অপ্রকট-লীলার জন্য অন্য গোপীদিগকে যেরূপ দেহত্যাগ করিতে হইয়াছিল, অবশিষ্ট গোপীদিগেরও সেইরূপ দেহত্যাগ সম্পূর্ণ সম্ভব। টীকাকারেরা বলেন যে, তাঁহারা অলব্ধরাস ছিলেন না, সেই জন্য তাঁহাদিগকে দেহত্যাগ করিতে হয় নাই। এ কথার কোন যুক্তি দেখা যায় না। এ কথা শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত কথা নহে।

একথা কিন্তু সর্ব্ববাদিসম্মত যে, অপ্রকট নিত্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদিগের সহিত পুনরায় সঙ্গত হইয়াছিলেন। সেই অপ্রকট-লীলা কি এবং অপ্রকট বৃন্দাবনই বা কি?

দশমস্কন্ধ সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের ঊনত্রিংশ শ্লোকের বৈষ্ণব-তোষিণী টীকায় জীব গোস্বামী বলেন—

স চ প্রকাশো দ্বিবিধোজ্ঞেয়ঃ। প্রকটোঽপ্রকটশ্চ।

'সেই প্রকাশ দুই প্রকার। প্রকট ও অপ্রকট।'

তত্র প্রকটঃ প্রাপঞ্চিকেষু অভিব্যক্তিঃ। অপ্রকটস্তেষু অনভিব্যক্তিঃ।

'প্রাপঞ্চিক সাধারণ লোকে যাহা দেখিতে পায়, তাহাই 'প্রকট'। তাহারা যাহা দেখিতে পায় না, তাহাই 'অপ্রকট'।'

তত্র পূর্ব্বমষ্টাবিংশেঽধ্যায়ে যো গোলোকতয়া দর্শিতঃ শ্রীবৃন্দাবনস্থৈব

প্রাপঞ্চিকেষু অপ্রকটঃ প্রকাশ-বিশেষস্তত্র তদানীমপি স্থিতেন শ্রীকৃষ্ণস্য অপ্রকটাখ্যেন প্রকাশবিশেষেণ তাসামপি অপ্রকটপ্রকাশৈঃ সংযোগঃ শ্রীবৃন্দাবন প্রকটপ্রকাশে প্রাকৃস্থিতেন সম্প্রতি মথুরাপ্রকট প্রকাশং গতেন শ্রীকৃষ্ণস্য প্রকটপ্রকাশেন তু তাসাং প্রকটপ্রকাশৈঃ বিয়োগ ইতি।

'অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে ব্রহ্মহ্রদে স্নান করাইয়া কৃষ্ণ গোপদিগকে নিজলোক বা গোলোক যাহা দেখাইয়াছিলেন, সে কেবল বৃন্দাবনেরই প্রকাশবিশেষ। সাধারণ লোকে চর্ম্মচক্ষুতে সেই বৃন্দাবন দেখিতে পায় না। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট অবস্থায় সেই বৃন্দাবনে তখনও ছিলেন। গোপগণ ব্রহ্মহ্রদে নিমগ্ন হইলে, তাঁহাদের সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহ হইতে বিনির্গত হইয়া অপ্রকটরূপ ধারণ করিল, এবং তখন তাঁহারা অপ্রকট বৃন্দাবনে অপ্রকট কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। আবার বৃন্দাবনে যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ ছিল ততক্ষণই ব্রজবাসীরা তাঁহার সহিত প্রকটরূপে সঙ্গত হইয়াছিলেন। আবার যখন সেই প্রকটমূর্ত্তি কৃষ্ণ মথুরায় গেলেন, তখন প্রকট কৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসী-দিগের বিরহ হইল।'

আমরা বলি, যিনি বৃন্দাবনে, মথুরায় ও দ্বারকায় তিন ধামে প্রকট হইয়াছিলেন, সেই প্রকটলীলার কৃষ্ণ অন্য এবং অপ্রকট লীলার কৃষ্ণ অন্য।

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপালনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি॥

— লঘু ভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ৫।৪৬১ শ্লোক।

'যদুকুলোদ্ভব কৃষ্ণ একজন এবং গোপাল-নন্দন অন্যজন। ইনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র কোথাও গমন করেন না।' অপ্রকট-লীলার কৃষ্ণ কেবল বৃন্দাবনেই প্রকট হইয়াছিলেন। অপ্রকট-লীলার গোপগোপীগণও তখন পূর্ব্বদেহত্যাগী হইয়া প্রকট। তাঁহাদের নব জন্ম, নবদেহ ও পরে নিত্য দেহ।

গোপালনন্দন কৃষ্ণ নারায়ণ ঋষির দেহরূপ পূর্ব্ব-পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া নবীন দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। নারায়ণ ঋষির স্থলাভিষিক্ত মৈত্রেয় ঋষি।

নমু তে তত্ত্বসংরাধ্য ঋষিঃ কৌশারবোঽন্তিকে।

সাক্ষাদ্ভগবতাদিষ্টো মর্ত্ত্যলোকং জিহাসতা॥ ভাঃ পুঃ ৩-৪-২৬

দ্বিতীয় প্রকট-লীলার পর অপ্রকট বৃন্দাবনে অপ্রকট-লীলা নিত্য সংঘটিত হইতেছে।

সে বৃন্দাবন প্রাকৃত লোক দেখিতে পায় না। সে বৃন্দাবন ভক্তের চক্ষুতে নিত্য বিরাজমান। সেই বৃন্দাবনে প্রবেশ-অধিকারের জন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা "ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে"।

পুরাণে ও তন্ত্রে সেই বৃন্দাবনের বিচিত্র বর্ণনা আছে :—

তত্রাপি মহদাশ্চর্য্যং পশ্যন্তে পণ্ডিতা নরাঃ।

কালিয়হ্রদপূর্ব্বেণ কদম্বো মহিতো দ্রুমঃ।

শতশাখং বিশালাক্ষি পুণ্যং সুরভিগন্ধিচ।

সচ দ্বাদশ মাসানি মনোজ্ঞঃ শুভশীতলঃ।

পুষ্পায়তি বিশালাক্ষি প্রভাসান্তো দিশোদশ।—বরাহপুরাণ।

তস্য তত্রোত্তরে পার্শ্বেঽশোকবৃক্ষঃ সিতপ্রভঃ।

বৈশাখস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশী।

স পুষ্প্যতি মধ্যাহ্নে মম ভক্তসুখাবহঃ।

ন কশ্চিদপি জানাতি বিনাভাগবতং শুচিম্।—বরাহপুরাণ।

পবিত্র ভাগবত ভিন্ন সে বৃন্দাবনের কথা কেহ জানেনা। হাবড়া ষ্টেশনে টিকিট লইয়াই কেবল সে বৃন্দাবনে যাওয়া যায় না।

বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রে ভগবান্ এই বৃন্দাবনের কথা বলিয়াছেন :—

ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলম্।

তত্র যে পশবঃ পক্ষিমৃগাঃ কীটা নরামরাঃ।

যে বসন্তি মমাধিষ্ণ্যে মৃতা যান্তি মমালয়ম্।
তত্র যা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে।
যোগিন্যস্তা ময়া নিত্যং মম সেবাপরায়ণাঃ।
পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্।
কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী।
অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ।
সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ।
আবির্ভাব স্তিরোভাবো ভবেন্মেঽত্র যুগে যুগে।
তেজোময়মিদং রম্যং অদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা।

'এই বৃন্দাবনে দেবগণ ও প্রাণিগণ সূক্ষ্মরূপে থাকেন। সর্ব্বদেবময় আমি কখনও এ বন ত্যাগ করি না। আমার যুগে যুগে এই বনে আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। এই তেজোময় রমণীয় বৃন্দাবন চর্ম্মচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না।'

সেই অপ্রকট বৃন্দাবনে, অপ্রকট গোপ-গোপীগণ অপ্রকট কৃষ্ণের সহিত নিত্যলীলা করিতেছেন। মহাপ্রভু সেই লীলার অবগুণ্ঠন কিঞ্চিন্মাত্র উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। আবার যদি তাঁহার আবির্ভাব হয়, তবে সেই বৃন্দাবনের কথা আমরা আরও জানিতে পারিব। সেই বৃন্দাবনের অধীশ্বর যদুসম্ভূত কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন অন্য কৃষ্ণ। সেই বৃন্দাবনের অধীশ্বরী শ্রীরাধা। সেই বৃন্দাবনে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অনুসারে স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা আসিয়া রাধা ও কৃষ্ণের বিবাহে পৌরহিত্য করেন। সেই বৃন্দাবনে অসংখ্য গোপ ও অসংখ্য গোপী। তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে নন্দব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন কোন গোপী পূর্ব্বজন্মে যদুসম্ভূত কৃষ্ণের সহিত রাস-সঙ্গমে মিলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই অপ্রকট বৃন্দাবনে সকল গোপীই পূর্ব্বজন্ম হইতে রূপান্তরিত। এই রূপান্তর গ্রহণ করিতে তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার

জন্ম লইতে হইয়াছিল, কিংবা পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করিয়াই তাঁহারা নিত্য সূক্ষ্ম-দেহ ধারণ করিয়াছেন, পুরাণে তাহার কোন বিচার দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং আমরাও সে বিষয়ে ধৃষ্টতা প্রকাশ করিব না।

চৈতন্য-চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন ঃ—

"লোকভিড়ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে যাইয়া।
রূপগোসাঞিকে শিক্ষা করেন শক্তি সঞ্চারিয়া॥
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব-প্রান্ত।
সব শিক্ষাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত॥
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল॥
শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপিয়া প্রবীণ করিলা॥"—মধ্যলীলা, ১৯।

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে
প্রেমস্বরূপে সহজাতিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে
ততান রূপে স্ববিলাসরূপে॥—চৈতন্য চন্দ্রোদয়, ৯-৭৫

'যিনি প্রিয়স্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, সহজাতিরূপ, নিজানুরূপ ও একরূপ, তাদৃশ রূপ-গোস্বামীতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যপ্রভু নিজশক্তি বিস্তার করিয়াছিলেন।' মহাপ্রভুর শক্তিসঞ্চারে প্রেমিক রূপগোস্বামী সকল তত্ত্বই অবগত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে সকল তত্ত্বই বলিয়াছিলেন। কিন্তু একটি গূঢ়রহস্য, মহাপ্রভু, বলি, বলি করিয়াও তাঁহাকে বলিতে পারেন নাই। যাঁহার আদেশে স্বয়ং শুকদেব, সে রহস্য ভাগবতে প্রকাশ করেন নাই, তিনিই মহাপ্রভুর মুখে রূপগোস্বামীকে শিক্ষা দিতেছেন। যাহা এতদিন প্রকাশিত হয় নাই, আজ সহসা সে কথা কিরূপে প্রকাশিত

করেন। শত সহস্র বৎসর, সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলী যে কথা জানিয়া আসিয়াছে, যে কথায় উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের ভক্তির ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, যে কথার সহিত তাহাদের ভগবৎ-প্রেম জড়িত রহিয়াছে—আজ সহসা সে কথায় কিরূপে তিনি দ্বিধা ভাব উৎপাদন করেন? কি করিয়া তিনি বলেন, যদুনন্দন অন্য এবং গোপীবল্লভ অন্য?

চৈতন্য মহাপ্রভু প্রয়াগ হইতে বারাণসী চলিলেন। রূপগোস্বামীও তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন।

"প্রভু কহে তোমার কর্ত্তব্য আমার বচন।
নিকট আসিয়াছি তুমি যাহ বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া।
আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া॥"

রূপ তাহাই করিলেন। তিনি মহাপ্রভু কর্তৃক হৃদয়ে সঞ্চারিত তত্ত্বসকল আলোচনা করিতে করিতে একটি কৃষ্ণনাটক লিখিতে ইচ্ছা করিলেন এবং কিছু কিছু লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সে নাটকে দ্বারকালীলা ও বৃন্দাবনলীলার অধিনায়ক একজন। যিনি রুক্মিনী ও সত্যভামার বল্লভ, তিনিই গোপীবল্লভ। তাঁহার কৃষ্ণনাটকে একজনই দ্বারকায় ও বৃন্দাবনে লীলা করিতে লাগিলেন।

এথা প্রভু আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন।
কৃষ্ণলীলা নাটক করিতে হৈল মন॥
বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিল।
মঙ্গলাচরণ নান্দী-শ্লোক তথাই লিখিল॥
পথে চলি আইনে নাটকের ঘটনা ভাবিতে।
কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লিখিতে॥

এই মতে দুই ভাই গৌড়দেশে আইলা।
গৌড়ে আসি অনুপমের গঙ্গা প্রাপ্তি হৈলা॥
রূপ গোসাঞি প্রভুপাশ করিল গমন।
প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন॥
অনুপমের লাগি তাঁর বিলম্ব লইল।
ভক্তগণ পাশ আইল লাগি না পাইল॥
উড়িয়া দেশে সত্যভামাপুর নামে গ্রাম।
এক রাত্রি সেই গ্রামে করিল বিশ্রাম॥
রাত্রে স্বপ্ন দেখে এক দিব্যরূপা নারী।
সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিল কৃপা করি॥
'আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন।
আমার কৃপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ॥'
স্বপ্ন দেখি রূপ গোসাঞি করিল বিচার।
সত্যভামার আজ্ঞা পৃথক্ নাটক করিবার॥
ব্রজ পুর লীলা একত্র করিয়াছি ঘটনা।
দুই ভাগ করি এবে করিব রচনা॥

চৈতন্য-চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা ১

যাহা মহাপ্রভু নিজমুখে বলিতে পারেন নাই, সত্যভামার মুখ দিয়া সে কথার সূত্রপাত করিলেন। রূপের মন দোলায়মান হইতে লাগিল। সত্যভামার আদেশ অবশ্য তিনি পালন করিবেন। কিন্তু ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

রূপ ভাবিতে ভাবিতে নীলাচলে পঁহুছিলেন। মহাপ্রভু হরিদাসের কুটীরে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন।

আরদিন প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা।
সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা॥
'কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে॥'
কৃষ্ণোহন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি॥
এত কহি মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
রূপ গোসাঞি মনে কিছু বিস্ময় হইলা॥'
'পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিল।
জানি পৃথক্ নাটক করিতে প্রভু আজ্ঞা হৈল॥
পূর্ব্বে দুই নাটক ছিল একত্র রচনা।
দুই ভাগ করি এবে করিব ঘটনা॥
দুই নান্দী প্রস্তাবনা দুই সংঘটনা॥
পৃথক্ করিয়া লিখি করিয়া ভাবনা॥'

—চৈতন্য-চরিতামৃত অন্ত্য ১।

মহাপ্রভু যেন হেঁয়ালিতে কথাগুলি বলিয়া তৎক্ষণাৎ সরিয়া পড়িলেন।

এইবার ভক্তের হৃদয়ে তত্ত্ববীজের অঙ্কুরোদ্গম হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন—ব্রজলীলা স্বতন্ত্র, পুরলীলা স্বতন্ত্র।

মহাপ্রভু সেই অঙ্কুরে জল দিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রেরণায় ভক্ত-হৃদয়ে তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল।

রথযাত্রার দিন নৃত্য করিতে করিতে মহাপ্রভু একটি শ্লোক পড়িলেন ঃ—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।

সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপার-লীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসী-তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে ॥

—কাব্যপ্রকাশ ১-৪।

'যিনি আমার কৌমারকাল হরণ করিয়াছেন, ইনি সেই আমার অভিমত পতি। সেই চৈত্র মাসের রজনী, সেই বিকসিত মালতীর সৌরভযুক্ত কদম্বকাননের মন্দ মন্দ সমীরণ। আর আমিও সেই রহিয়াছি। তথাপি সেই রেবানদীর তীরবর্ত্তী বেতসী তরুর তলে সুরতবিধানার্থ আমার চিত্ত নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।'

এই শ্লোকের অর্থ জানে একলে স্বরূপ।
দৈবে সে বৎসর তাঁহা গিয়াছেন রূপ ॥
প্রভু মুখে শ্লোক শুনি শ্রীরূপ গোসাঞি।
সেই শ্লোকের অর্থে শ্লোক করিল তথাই ॥
প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দী-পুলিন-বিপিনায় স্পৃহয়তি ॥

'শ্রীরাধিকা কহিতেছেন, সহচরি! আমার সেই প্রণয়াস্পদ শ্রীকৃষ্ণ এই কুরুক্ষেত্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। আমিও সেই রাধিকা। উভয়ের মিলন-জনিত সুখও সেই। তথাপি আমার মন সেই যমুনা-পুলিনবর্ত্তী বিপিন, যাহার অভ্যন্তরে মুরলীর পঞ্চমতান খেলিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে, সেই বিপিনের জন্য ব্যাকুল হইতেছে।'

শ্লোক করি এক তালপত্রেতে লিখিয়া।
আপন বাসার চালে রাখিলা গুঁজিয়া ॥

শ্লোক রাখি গেলা সমুদ্র স্নান করিতে।
হেন কালে আইলা প্রভু তাঁহারে মিলিতে॥
দৈবে আসি প্রভু যবে উর্দ্ধেতে চাহিলা।
চালে গোঁজা তালপত্রে সেই শ্লোক পাইলা॥
শ্লোক পড়ি প্রভু আছেন আবিষ্ট হইয়া।
রূপ গোসাঞি আসি পড়ে দণ্ডবৎ হইয়া॥
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে চাপড় মারিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া॥
মোর শ্লোকের অভিপ্রায় কেহো নাহি জানে।
মোর মনের কথা তুমি জানিলে কেমনে॥
এত বলি তাঁরে বহু প্রসাদ করিয়া।
স্বরূপ গোসাঞিরে শ্লোক দেখাইল লইয়া॥
স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে।
মোর মনের কথা রূপ জানিলা কেমতে॥
স্বরূপ কহেন যাতে জানিল তোমার মন।
তাতে জানি হয় তোমার কৃপার ভাজন॥
প্রভু কহে তারে আমি সন্তুষ্ট হইয়া।
আলিঙ্গন কৈল সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিয়া॥
যোগ্যপাত্র হয় গূঢ় রস বিবেচনে।
তুমি কহিও তারে গূঢ় রসাখ্যানে॥

রূপ গোস্বামী যে গূঢ় তত্ত্ব জানিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে তত্ত্ব ভাগবতে ও অন্যান্য পুরাণে জানিতে পারা যায় না, রূপ গোস্বামীর গ্রন্থে তাহা জানিতে পারা যায়। অবতার-তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিলেও পাওয়া যায় না। ভক্তিরসের অমৃত-

সিন্ধু এক অপূর্ব্ব শাস্ত্র। ইহার নূতনত্ব, ইহার গাম্ভীর্য্য, ইহার গূঢ় ভাব আলোচনা করিলে বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইতে হয়। চৈতন্যের শিক্ষায় ও লীলায় যাহা অভিনব ও অপরূপ, রূপগোস্বামী তাহার প্রদর্শক। ভারত-সাহিত্যে তিনি যে কবিত্বের স্থান অধিকার করেন, তাহার অত্যুচ্চ হইলেও সাধারণ লোকের অজ্ঞাত। তাঁহার প্রদত্ত অমৃত রস আস্বাদন করে, এমন লোকও বিরল।

যে তত্ত্বের সূচনা করা গেল, লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে রূপগোস্বামী সেই তত্ত্ব বিশদ করিয়াছেন।

লঘুভাগবতামৃত এবং কৃষ্ণ-তত্ত্ব।

চৈতন্যদেবের প্রিয়শিষ্য রূপগোস্বামী যে সকল রহস্যের উদ্ভেদ করিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে বোধগম্য করিতে হইলে, কতকগুলি কথা জানা আবশ্যক।

প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কতকগুলি ত্রিলোকী বা গ্রহ আছে। এমন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের শীর্ষস্থানীয় সেই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মলোক। এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বীজরূপী এক অবিনাশী নিত্যলোক আছে। সেই নিত্যলোকের নাম বৈকুণ্ঠ বা পরব্যোম। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে অবতার সকল ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীব-সমূহের উদ্ধারের জন্য বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারা নিজ নিজ লীলার উপযোগী কোন না কোন লোকে অবস্থান করেন। রূপগোস্বামী তাহার কতকগুলি শাস্ত্রসম্মত উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

> কেষাঞ্চিদেষাং স্থানানি লিখ্যন্তে শাস্ত্রদৃষ্টিতঃ।
> যত্র যত্র বিরাজন্তে যানি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যতঃ॥
> বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদীনাং বাক্যং তত্র প্রমাণ্যতে॥
>
> লঘুভাগবতামৃত, পূর্ব্ব-খণ্ড, ৩০।

অবতার সকল লীলা বা কার্য্য উপলক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের কোন না কোন স্থানে বিরাজ করিলেও, পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠে তাঁহাদের সকলের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। যেমন বুদ্ধদেব পূর্ব্বে জীবন্মুক্ত ঋষি ছিলেন। তখন তাঁহার কেবল ত্রৈলোক্য মধ্যেই অধিকার ছিল। যখন ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে তাঁহার অধিকার হইল, তখন বৈকুণ্ঠ মধ্যে তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ হইল, এবং তখনই পুরাণে

তাঁহার অবতার সংজ্ঞা প্রদত্ত হইল। এই অবতার সকল বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের কলা বা অংশরূপে কথিত হন। তাঁহারা কোন না কোন কল্পে, কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে এই অংশ বা কলার অধিকার প্রাপ্ত হন। যখনই তাঁহারা সেই অধিকার প্রাপ্ত হন, তখনই তাঁহাদের পরব্যোমে স্থান নির্দ্দেশ হয়।

সর্ব্বেষামবতারাণাং পরব্যোম্নি চকাসতি।
নিবাসাঃ পরমাশ্চর্য্যা ইতি শাস্ত্রে নিরূপ্যতে॥

তথাহি পাদ্মে—

বৈকুণ্ঠভুবনে নিত্যে নিবসন্তি মহোজ্জ্বলাঃ।
অবতারাঃ সদা তত্র মৎস্য কূর্ম্মাদয়োঽখিলাঃ॥

লঃ ভাঃ পূর্ব্ব, ৪২-৪৩

যেমন অবতারগণের বৈকুণ্ঠে স্থান আছে, সেইরূপ বৈকুণ্ঠনাথের পারিষদগণেরও সেখানে স্থান আছে। তাঁহারা সেই পরব্যোমনাথের এত অনুগত যে, তাঁহাদের ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কোন স্বতন্ত্র লীলা নাই। তাঁহাদের সকল কার্য্যই নারায়ণের লীলার অনুগত ও আনুসঙ্গিক।

ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে হরির অনুব্রত এই সকল নিত্য ভক্তগণের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎপরম্।
ব্যপেতসংক্লেশবিমোহসাধ্বসং স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতম্॥
প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥ ৯-১০

অবতার ও নিজজন ব্যতীত পরব্যোমনাথ নারায়ণের 'মহাবস্থ' নামে বিখ্যাত ব্যূহ-চতুষ্টয় আছে। প্রথম ব্যূহ বাসুদেব, দ্বিতীয় ব্যূহ সঙ্কর্ষণ, তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্ন ও চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধ। এই ব্যূহরূপে নারায়ণেরই চারি

প্রকার প্রকাশ হয় ও বস্তুতঃ এই চতুর্ব্যূহ নারায়ণ হইতে পৃথক্ নহে। ইঁহাদিগের মধ্যে বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ঈশ্বরের কার্য্য করেন। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে একজন বাসুদেব ও একজন সঙ্কর্ষণ আছেন। তাঁহারা এই মূল বাসুদেব ও মূল সঙ্কর্ষণের আভাস বা অংশ। সেইরূপ প্রত্যেক পৃথিবীতে একজন প্রদ্যুম্ন ও একজন অনিরুদ্ধ আছেন, তাঁহারা পৃথিবীর ঈশ্বর। এই প্রদ্যুম্ন ও এই অনিরুদ্ধ মূল প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের আভাস বা অংশ। আমাদের ত্রিলোকময় পৃথিবীর ঈশ্বর প্রদ্যুম্ন বা সনৎকুমার ঋষি। ব্যাসদেব মহাভারতে এই রহস্য বলিয়া গিয়াছেন।

সনৎকুমারং প্রদ্যুম্নং বিদ্ধি রাজন্ মহৌজসম্॥

মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৬৭-১৫২

সনৎকুমারং প্রদ্যুম্নঃ প্রবিবেশ যথাগতম্॥

মহাভারত, স্বর্গারোহণ পর্ব্ব, ৫-১৩

কিন্তু মহাভারতে সঙ্কর্ষণই সনৎকুমারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, একথাও আছে।

'স জীবঃ পরিসংখ্যাতঃ শেষঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ
তস্মাৎ সনৎকুমারত্বং যোঽলভৎ স্বেন কর্ম্মণা।
যস্মিংশ্চ সর্ব্বভূতানি প্রলয়ং যান্তি সংক্ষয়ম্॥' শান্তিপর্ব্ব, ৩৩৯

যদিও বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ দুইজনেই ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, তথাপি বাসুদেব অন্তর্জগতের ঈশ্বর, সঙ্কর্ষণ বহির্জগতের ঈশ্বর। বাসুদেব সমষ্টির আশ্রয়। সঙ্কর্ষণ ব্যষ্টির আশ্রয়। সেইরূপ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ দুইজনেই পৃথিবীর ঈশ্বর।

পরব্যোমপতি মূল নারায়ণের মূল চতুর্ব্যূহকে অধিকার উপার্জ্জন করিতে হয় নাই। তাঁহারা অনন্তকাল হইতেই বৈকুণ্ঠ মধ্যে বিরাজিত আছেন। অবশ্য তাঁহাদের অংশ সকল অধিকারী পুরুষ।

রূপগোস্বামী বলেন, এই বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণও কৃষ্ণের বিলাস। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

তস্মাৎ পরমবৈকুণ্ঠনাথোঽপ্যস্য বিলাসকঃ॥

লঃ ভাঃ, পূর্ব্ব, ১৩৩

তাহার পর ভাগবতের শ্লোক অবলম্বন করিয়া রূপগোস্বামী সিদ্ধান্ত করেন যে, বৈকুণ্ঠনাথ ও ব্যূহ-চতুষ্টয় প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন্।

ভাগবতের শ্লোকটি এই—

স্বশান্তরূপেষ্বিতরৈঃ স্বরূপৈরভার্দ্দ্যমানেষ্বনুকম্পিতাত্মা।

পরাবরেশো মহদংশযুক্তো হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ॥

ভাঃ পুঃ, ৩-২-১৫

এক কাষ্ঠখণ্ড অন্য কাষ্ঠখণ্ড কর্তৃক অর্দ্দিত হইলে অগ্নির প্রকাশ হয়। পূর্ব্ব হইতেই দুই কাষ্ঠখণ্ড মধ্যে অগ্নি ছিল। দুই বিরুদ্ধ-ধর্ম্মী পদার্থের সংঘাত দ্বারা কেবলমাত্র অপ্রকট অগ্নি প্রকট হয়। সেইরূপ কৃষ্ণ সর্ব্বদা অপ্রকটভাবে বিরাজিত আছেন। তিনি অজ, তাঁহার জন্ম নাই। তথাপি তাঁহার শান্তরূপী ভক্তগণ ঘোররূপী অসুরগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে, সেই গোলোক-মুখ্য 'পর' ও ব্রহ্মাণ্ড-মুখ্য 'অপরের' অধীশ্বর কৃষ্ণ মহদংশযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন—এইরূপ প্রতীতি হয়। মহৎ ও অংশের সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহার প্রকট আবির্ভাব হয়। রূপগোস্বামী বলেন, এখানে 'মহৎ' শব্দে পরম মহত্তম পরব্যোমনাথ ও অষ্টসংখ্যক ব্যূহ।

স্যুর্মহান্তোঽতিপরম-মহত্তমতয়া স্মৃতাঃ।

তে পরব্যোমনাথশ্চ ব্যূহাশ্চাষ্টসুসংখ্যকাঃ॥

লঃ ভাঃ, পূর্ব্ব, ১৩৭

চতুর্ব্যূহ ত জানি। অষ্টসংখ্যক ব্যূহ আবার কি? রূপগোস্বামী

বলেন, যেমন বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের চতুর্ব্যূহ আছে, সেইরূপ কৃষ্ণেরও চতুর্ব্যূহ আছে বৈকুণ্ঠনাথের ব্যূহ অপেক্ষাও কৃষ্ণের ব্যূহ উৎকৃষ্ট।

বাসুদেবাদয়ো ব্যূহাঃ পরব্যোমেশ্বরস্য যে।

তেভ্যোঽপ্যুৎকর্ষভাজোঽমী কৃষ্ণব্যূহাঃ সতাং মতাঃ॥ লঃ ভাঃ পূর্ব্ব, ১৩৭

স্বতন্ত্র কৃষ্ণতত্ত্ব ও স্বতন্ত্র কৃষ্ণব্যূহের কল্পনা, রামানুজ স্বামী করেন না। তাঁহার মতে কৃষ্ণচন্দ্র বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণেরই প্রকাশ। চৈতন্য মহাপ্রভু তবে এ কল্পনা-গৌরব কেন করিলেন? রূপগোস্বামীর মুখে ত তাঁহারই শিক্ষা। এ কল্পনা-গৌরবের কারণ আছে। মধুর কৃষ্ণকে মধুররূপে জানিবার অন্য উপায় নাই। যেমন রাজা যখন দরবার করেন, তখন তাঁহার মাথায় মুকুট থাকে, হাতে দণ্ড থাকে, আশে পাশে প্রহরী থাকে, তাহাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্রাদি থাকে। রাজা সিংহাসনে বসেন। প্রজারা তাঁহাকে দূর হইতে ভয়ের সহিত দর্শন করে, এবং তাঁহার শাসন অতিক্রম করিলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়। রাজা যখন রাজত্ব করেন, তখন তিনি একজন অধিকারী মাত্র। মুকুট ও দণ্ডাদি তাঁহাতে আরোপিত হয়। তিনি নিজ স্বরূপে রাজসভায় বিরাজ করেন না।

যখন রাজ-পরিচ্ছদ ও রাজদণ্ড ত্যাগ করিয়া রাজা অন্তঃপুরে নিজ-জনের সহিত ক্রীড়া করেন, তখন তাঁহাকে কেহ রাজা বলিয়া জানে না, কেহ তাঁহাকে ভয় করে না। তখন তাঁহাকে তাঁহার নিজজনে প্রেমপূর্ব্বক আলিঙ্গন করে। সে প্রেমের ইয়ত্তা নাই, সে প্রেমে কপটতা নাই। এতদিন লোকে ঈশ্বরকে জানিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরকে ভয় করিয়াছে, ভক্তিও করিয়াছে; কিন্তু প্রেম করিতে পারে নাই। নির্গুণ ভক্তির আশ্রয় প্রেমরূপী ভগবান্‌কে জানিতে পারে নাই।

মদ্‌গুণ-শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।

মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্ ।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥

ভাঃ, পুঃ, ৩-২৯

প্রেম না হইলে এই নির্গুণ ভক্তি হইতে পারে না। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ ঈশ্বরকে কেহ প্রেমভাবে ভজনা করিতে পারে না। এই কথাটি ভক্তকে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্যই মহাপ্রভুর আবির্ভাব।

প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন ।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥
রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম ॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত ।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন ।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥
আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে ।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি ।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি ॥
আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন ।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন ।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন ॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ ।
তুমি কোন্ বড়লোক তুমি আমি সম ॥

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎ‍ঁসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥
এই শুদ্ধ ভক্তি লঞা করিমু অবতার।
করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥

*　　*　　*

ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ॥
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্মকর্ম্ম।

*　　*　　*

এই মত চৈতন্য কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্।
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম॥

*　　*　　*

এইমত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার॥

*　　*　　*

প্রেম ভক্তি শিখাইতে আপনি অবতরি।
রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥
শ্রীকৃষ্ণে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার।
এই ত পঞ্চম-শ্লোকের অর্থ পরচার॥

চৈ. চ, ৪, আদিলীলা।

এই জন্যই চৈতন্য মহাপ্রভু দ্বিভুজ, মধুর, নিজজন কৃষ্ণকে সর্ব্বোচ্চ আসনে বসাইয়াছেন, এবং তাঁহাকে চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ হইতে পৃথক্ করিয়াছেন। ঐশ্বর্য্যের লেশ থাকিলেও ভক্তের মন যে কুণ্ঠিত হইবে।

তাই মধুর কৃষ্ণের মধুর চতুর্ব্যূহ মাধুর্য্যবিস্তারে তাঁহার দ্বারস্বরূপ। আর বৈকুণ্ঠাধিপতির চতুর্ব্যূহ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিতেছেন।

তাই রূপগোস্বামী বলেন—

বাসুদেবাদয়ো ব্যূহাঃ পরব্যোমেশ্বরস্য যে।
তেভ্যোঽপ্যুৎকর্ষ-ভাজোঽমী কৃষ্ণব্যূহাঃ সতাং মতাঃ॥

'পরব্যোমাধিপতির বাসুদেবাদি যে চতুর্ব্যূহ আছে, তাঁহাদের অপেক্ষাও উৎকর্ষ-ভাগী শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহ আছে। সাধুদিগের এইরূপ অভিপ্রেত।'

এ উৎকর্ষ কেবল মাধুর্য্যের উৎকর্ষ।

ইত্যেতে পরমব্যোমনাথ ব্যূহৈঃ সহৈকতাম্।
স্ববিলাসৈরিহাভ্যেত্য প্রাদুর্ভাবমুপাগতাঃ॥ লঃ ভাঃ পূর্ব্ব, ১৩৭

বৈকুণ্ঠাধিপতির চতুর্ব্যূহ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহের বিলাসমাত্র। আপন আপন বিলাসের সহিত শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহ একত্ব প্রাপ্ত হইয়া, এই পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

এই ত গেল, ভাগবতের শ্লোকের 'মহৎ' শব্দ। রূপগোস্বামীর মতে এই মহৎ শব্দে চতুর্ব্যূহকে বুঝায়।

বাকি থাকিল 'অংশ'।

অংশাস্তস্যাবতারা যে প্রসিদ্ধাঃ পুরুষাদয়ঃ।
তথা শ্রীজানকীনাথ-নৃসিংহ-ক্রোড়-বামনাঃ॥
নারায়ণো নরসখো হয়শীর্ষাজিতাদয়ঃ।
এভির্যুক্তঃ সদা যোগমবাপ্যায়মবস্থিতঃ॥ লঃ ভাঃ,পূর্ব্ব, ১৩৭

'পুরুষাদি যে সকল প্রসিদ্ধ অবতার, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অংশ। রাম, নৃসিংহ, বরাহ, বামন, নরসখা নারায়ণ, হয়শীর্ষ, অজিত প্রভৃতিও শ্রীকৃষ্ণের অংশ। এই সকল 'মহৎ' ও 'অংশে'র সহিত সর্ব্বদা যুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন।'

পূর্ব্বে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অবলম্বন করিয়া যে তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছি, লঘুভাগবতামৃত অনুশীলন করিয়াও সেই তত্ত্ব জানিলাম। সমগ্র কৃষ্ণতত্ত্ব এক অপূর্ব্ব সমন্বয়তত্ত্ব। এই সমন্বয়ের এক প্রান্তে মধুর নিজ স্বরূপাবলম্বী মধুর কৃষ্ণ ও অপর প্রান্তে নরসখা নারায়ণ ঋষি কিংবা তাঁহার প্রতিনিধি মৈত্রেয় ঋষি। এই দুই প্রান্তের মধ্যভাগে নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ ও পুরুষাদি অবতার। 'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়' কথার এই গূঢ় তাৎপর্য্য। এই অপূর্ব্ব সম্মিলনীর সমগ্র অংশ কেবল বৃন্দাবন-লীলায় প্রত্যক্ষ।

কুত্রাপ্যশ্রুতপূর্ব্বেণ মধুরৈশ্বর্য্যরাশিনা।
সেব্যমানো হরিস্তত্র বিহারং কুরুতে ব্রজে॥ লঃ ভাঃ পূর্ব্ব, ১৮৩,

যদি বৃন্দাবনে পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ; তথাপি সকল লীলার জন্য তাঁহাকে পূর্ণতমত্ব ভাব দেখাইতে হয় না। যেমন ব্রহ্মাকে ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য তিনি কেবল বৈকুণ্ঠনাথের ভাব ধারণ করিয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠেশ্বরলীলাত্র দর্শিতা যা বিরিঞ্চয়ে।
সেশ্বরাণামজাণ্ডানাং কোটী বৃন্দাবনেঽদ্ভুতা।
সৈব জ্ঞেয়া যতঃ স্বাংশদ্বারৈবাসৌ প্রকাশিতা॥

ল ভাঃ, পূর্ব্ব, ১৩৮,

'এই বৃন্দাবনে, ব্রহ্মাকে যে ব্রহ্মাণ্ডনাথের সহিত অদ্ভুত ব্রহ্মাণ্ডকোটি প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, তাহা বৈকুণ্ঠনাথের লীলা। স্বয়ংরূপী শ্রীকৃষ্ণ নিজের অংশ বৈকুণ্ঠনাথের দ্বারা এই লীলা প্রকাশিত করিয়াছিলেন।'

বাসুদেবাদিলীলাস্তু মথুরা-দ্বারকাদিষু।
তত্তদ্রূপৈর্ব্রজান্তাস্তু বাল্যেহাভিশ্চ দর্শিতাঃ॥

'বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি চতুর্ব্যূহের লীলা এবং পুরুষাদি অবতারের লীলা মথুরা ও দ্বারকাদিতে প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন ব্রজমধ্যেও বাল্যলীলা দ্বারাও সে সকল 'মহৎ' ও 'অংশের' লীলা প্রদর্শিত হইয়াছিল।'

বাস্তবিক, শ্রীকৃষ্ণ 'মহৎ' ও 'অংশ' কর্ত্তৃক যুক্ত হইলেও এবং কথনও কথনও সেই মহৎ ও অংশের দ্বারা লীলা প্রকটিত করিলেও, তিনি মহৎ ও অংশ নহেন।

যো বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্বাহু র্ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
য এব শ্বেতদ্বীপেশো নরোনারায়ণশ্চ যঃ।
স এব বৃন্দাবন-ভূবিহারী নন্দনন্দনঃ॥
এতস্ত্যৈবাপরেঽনন্তা অবতারা মনোহরাঃ।
মহাগ্নেরিহ যদ্বৎ স্যুরুল্কাঃ শতসহস্রশঃ।
তত্রৈব লীনা একত্বং ব্রজেয়ুস্তে হরৌ তথা॥ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

'যেমন শত-সহস্র অগ্নিশিখা অগ্নিতে লীন হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ বৈকুণ্ঠাধিপতি, শ্বেতদ্বীপাধিপতি, অপর অনন্ত অবতারসমূহ সকলই বৃন্দাবন-বিহারী নন্দ-নন্দনে আসিয়া মিলিত হন।'

এই জন্যই রূপগোস্বামীর মতে কেহ কৃষ্ণকে নরসখা নারায়ণ, কেহ ইন্দ্রানুজ বামন, কেহ ক্ষীরাব্ধিশায়ী, কেহ সহস্রশীর্ষ পুরুষ, কেহ বৈকুণ্ঠনাথ বলেন। যে মুনি কৃষ্ণের যে বৃত্ত অনুশীলন করেন, তিনি সেই বৃত্ত লইয়া তাঁহাকে সেইরূপ বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক মহৎ ও অংশ কর্ত্তৃক যুক্ত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

ইতি সিদ্ধা প্রভোরস্য মহদংশৈস্তুযুক্ততা।
অতএব পুরাণাদৌ কেচিন্নরসখাত্মতাম্।
মহেন্দ্রানুজতাং কেচিৎ কেচিৎ ক্ষীরাব্ধিশায়িতাম্।
সহস্রশীর্ষতাং কেচিৎ কেচিদ্ বৈকুণ্ঠনাথতাম্।
ব্রূয়ুঃ কৃষ্ণস্য মুনয়স্তত্তদ্বৃত্তানুগামিনঃ॥ লঃ ভাঃ পূর্ব্ব,১৩৯

এই ত লঘুভাগবতামৃতে, শ্রীরূপের অমৃতময় লেখনীতে, চৈতন্যের প্রেরণাময় রূপের তত্ত্ববিচারে, রূপের হৃদয়ে আবিষ্কৃত চৈতন্যের মধুর বাণীতে,

কৃষ্ণতত্ত্ব জানিতে পারিলাম। কিন্তু এখনও জানিলাম না, গোপীবল্লভ কৃষ্ণ ও রুক্মিণী-বল্লভ কৃষ্ণ এক কি দুই, এবিষয়ে রূপের মীমাংসা আর একটু বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

প্রকটা প্রকটা চেতি লীলা চেয়ং দ্বিধোচ্যতে।

লঘুভাগবতামৃত, পূর্ব্বখণ্ড, ১৫৬,

প্রকট ও অপ্রকট ভেদে লীলা দ্বিবিধ।

সদানন্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈর্লীলাভিশ্চ স দীব্যতি।
তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিৎ জগদন্তরে।
সহৈব স্বপরীবারৈর্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ॥ ১৫৬

কৃষ্ণের অনন্ত প্রকাশ ও অনন্তলীলা। তিনি নিত্য নিজলীলা দ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন; কিন্তু কদাচিৎ কোন জগতের মধ্যে তিনি কোনও এক প্রকাশ অবলম্বন করিয়া, নিজ পরিবারবর্গের সহিত জন্মাদি প্রকট-লীলা-করিয়া থাকেন। অপ্রকট-লীলা নিত্যই হইতেছে, কিন্তু কোন কোন জগতে কোন কোন সময়ে তিনি প্রকট-লীলা করিয়া থাকেন। প্রপঞ্চের অগোচর ধামে নিত্য-লীলা হইয়া থাকে।

কৃষ্ণভাবানুসারেণ লীলাখ্যা শক্তিরেব সা।
তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং তং ভাবং বিভাবয়েৎ॥ ১৫৭

কৃষ্ণের যেরূপ লীলা করিবার ইচ্ছা হয়, তাঁহার পরিবারবর্গের তদনুগামী ভাব হয়। এটি শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তির প্রভাব।

প্রপঞ্চগোচরত্বেন সা লীলা প্রকটা স্মৃতা।
অন্যাস্ত্বপ্রকটা ভান্তি তাদৃশ্যস্তদগোচরাঃ॥

প্রপঞ্চগোচর হইলেই সেই লীলাকে প্রকট বলা যায়। সেই লীলাই আবার প্রপঞ্চের অগোচর হইলেই, তাহাকে অপ্রকট বলা যায়।

চক্ষু-কর্ণাদির বিষয়ীভূত রূপরসাদি প্রপঞ্চ। আমরা স্থূলচক্ষু দ্বারা

দেখিতে না পাইলেই, তাহা অপ্রপঞ্চগোচর হইল। ভূর্লোকের সহিত অন্যান্য লোক অনুস্যূত। এই ভূর্লোকেই আমরা বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা যাহা অনুভব করি, তাহাই প্রকট, এবং এই ভূর্লোকেই আমরা অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা যাহা অনুভব করিতে পারি, তাহা অপ্রকট। অন্তরিন্দ্রিয়ের মধ্যেও তারতম্য আছে। যাহা অন্তরীক্ষ বা ভুবর্লোকের নিম্নভাগে সংঘটিত হইতেছে, তাহা স্বপ্নেন্দ্রিয় বা psychic sense দ্বারা অনুভব করা যায়। ভুবর্লোকের পদার্থকে অল্প আয়াস দ্বারা প্রকট করা যায়। হয়ত তীব্র ভক্তি বা তীব্র আগ্রহ দ্বারা জাগ্রত অবস্থাতেই স্বপ্ন-ইন্দ্রিয় লাভ করা যায়। পবিত্র জীবনীতে অল্প আয়াসেই সেই ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হয়। তাই অন্যত্র রূপগোস্বামী বলিয়াছেন,—

চেদদ্যাপিদিদৃক্ষেরন্ উৎকণ্ঠার্ত্তা নিজপ্রিয়াঃ।
তাং তাং লীলাং ততঃ কৃষ্ণো দর্শয়েৎ তান্ কৃপানিধিঃ॥
কৈরপি প্রেমবৈবশ্যভাগ্ ভি র্ভাগবতোত্তমৈঃ।
অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্ বৃন্দাবনান্তরে॥

লঃ ভাঃ পূর্ব্ব, ১৪২

অদ্যাপি যদি কৃষ্ণের প্রিয় ভক্তগণ উৎকণ্ঠায় কাতর হইয়া কৃষ্ণলীলা দেখিবার ইচ্ছা করেন, কৃপানিধি কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অভিপ্রেত সেই সেই লীলা দেখাইয়া থাকেন।

প্রেমে বিবশ কোন কোন ভাগবতোত্তম, আজও শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন মধ্যে লীলায় দেখিতে পান।

তত্র প্রকটলীলায়ামেবস্যাতাং গমাগমৌ।
গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারবত্যাঞ্চ শার্ঙ্গিণঃ॥

প্রকট-লীলাতেই বলা যায় যে, কৃষ্ণ গোকুল, মথুরা, কিংবা দ্বারকা হইতে গমন করিলেন, কিংবা সেখানে আগমন করিলেন।

যাস্তত্র তত্রাপ্রকটা স্তত্র তত্রৈব সন্তি তাঃ।
ইত্যাহ জয়তীত্যাদি পদ্যাদিকমভীক্ষ্ণশঃ॥ ১৫৮

যে সকল লীলা গোকুলাদিতে অপ্রকট বলিয়া কথিত হয়, যে সকল লীলা প্রপঞ্চাগোচর না হইলেও গোকুলাদিতেই নিত্য বিরাজ করিতেছে।

এই অপ্রকট-লীলাতে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া কুত্রাপি গমন করেন না। প্রকট-লীলাতেই গমনাগমনের কথা উঠে। 'কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরা গমন করিলেন,' অপ্রকট-লীলায়, একথা বলা চলে না।

'জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো' ইত্যাদি শ্লোকে 'জয়তি' ইত্যাদি শব্দে যে বর্ত্তমান কাল ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা নিত্য অকপট-লীলারই সূচক। এইবার প্রকট-লীলার বর্ণনা করা যাইতেছে।

দেবাদ্যংশাবতরণে প্রবৃত্তে পদ্মজাজ্ঞয়া॥
বসুদেবাদিকানাং যে স্বর্গেঽংশাঃ কশ্যপাদয়ঃ॥
নিত্যলীলান্তরৈস্তেস্তে বসুদেবাদিভির্গতাঃ।
সাযুজ্যমংশিভি স্তত্র জায়ন্তে শূরমুখ্যতঃ॥ ১৫৯

'ভবদ্ভিরংশৈর্য্যদুষূপজন্যতাম্'—পদ্মজ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া দেবগণ অংশরূপে অবতীর্ণ হইতে প্রবৃত্ত হইলে, নিত্যলীলার পরিবারবর্গ বসুদেবাদি, স্বর্গে অবস্থিত তাঁহাদের অংশ কশ্যপাদির সহিত মিলিত হইয়া, শূরসেন প্রভৃতি হইতে জন্মলাভ করেন।

যদ্বিলাসো মহাশ্রীশঃ স লীলাপুরুষোত্তমঃ।
আবির্বুভূষুরত্রাবিষ্কৃত্য সঙ্কর্ষণং পুরঃ।
অন্তঃস্থিতাবিষ্কর্ত্তব্য তদন্তর্ব্যূহ ঈশ্বরঃ।
হৃদয়ে প্রকটস্তস্য ভবত্যানকদুন্দুভেঃ॥
ভূমিভারনিরাসায় দেবানামভিযাচ্ঞয়া।
দ্বাপরস্যাবসানেঽস্মিন্ অষ্টাবিংশে চতুর্যুগে।

ক্ষীরাব্ধিশায়ি যদ্রূপ মনিরুদ্ধতয়া স্মৃতম্।
তদিদং হৃদয়স্থেন রূপেণানকদুন্দুভেঃ।
ঐক্যং প্রাপ্য ততো গচ্ছেৎ প্রাকট্যং দেবকীহৃদি॥
প্রেমানন্দামৃতৈস্তস্যা বাৎসল্যৈক স্বরূপিভিঃ।
লাল্যমানো হরিস্তত্র বর্দ্ধতে চন্দ্রমা ইব॥ ১৬০

যে লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাধিপতি মহাবিষ্ণু বিলাস, সেই কৃষ্ণ অত্রধামে আবির্ভাব করিতে ইচ্ছা করিয়া, প্রথমে দ্বিতীয় ব্যূহ সঙ্কর্ষণকে আবিষ্কৃত করিলেন। পরে অন্তঃস্থিত তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যূহরূপ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত করিব, এই ইচ্ছা করিয়া, ঈশ্বর আনক-দুন্দুভির হৃদয়ে প্রকটিত হইলেন।

পৃথিবীর ভার হরণের জন্য এবং দেবতাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য দ্বাপরের অবসানে এই অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে, ক্ষীরাব্ধিশায়ী পুরুষ (যাঁহাকে 'অনিরুদ্ধ' বলে) আনকদুন্দুভির হৃদয়স্থ রূপের সহিত একতা প্রাপ্ত হন। তখন সেই সম্মিলিত মূর্ত্তি দেবকীর হৃদয়ে প্রকটতা লাভ করে।

দেবকীর বাৎসল্যরূপ প্রেমানন্দামৃত দ্বারা লাল্যমান হইয়া হরি দেবকী হৃদয়ে চন্দ্রমার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন্।

যদিও রূপগোস্বামী স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের বসুদেব হৃদয়ে আবির্ভাবের কথা বলিতেছেন, তথাপি প্রকারান্তরে সে আবির্ভাব যেন প্রথম ব্যূহ বাসুদেবেরই বলা হইল। পরিস্কার ভাবে, এই কথা বলিলে, শুকদেবের উক্তির সহিত কথাটি সঙ্গত হয়।

আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ॥ ভা-পু-১০-২-১৬

বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেন, দেবকী হৃদয় বলিলে, এখানে দেবকীর গর্ভ বুঝিতে হইবে। কারণ ভাগবতে আছে,—

দিষ্ট্যাম্ব ! তে কুক্ষিগতঃ পরঃপুমান্।

কিন্তু পরবর্ত্তী শ্লোক বিচার করিলে, রূপগোস্বামীর এরূপ তাৎপর্য্য বোধ হয় না।

অথ ভাদ্রপদাষ্টম্যা মসিতায়াং মহানিশি।
তস্যা হৃদস্তিরোভূয় কারায়াং সূতিসদ্মনি।
দেবকীশয়নে তত্র কৃষ্ণঃ প্রাদুর্ভবত্যসৌ॥
জনয়িত্রী প্রভৃতিভিস্তাভিরিত্যবগম্যতে।
লৌকিকেন প্রকারেণ সুখং শিশুরজায়ত॥ ১৬১

অনন্তর ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে, দেবকীর হৃদয় হইতে আপনাকে তিরোহিত করিয়া, কৃষ্ণ দেবকীর শয়নে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। জনন প্রভৃতি মনে করিলেন, লৌকিক প্রকারেই শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন।

ইহাতে বুঝা যায়, রূপগোস্বামী বলিতে চাহেন, অলৌকিক প্রকারে কৃষ্ণতত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল।

অথ ব্রজেশ্বরীগেহে বিশন্নানকদুন্দুভিঃ।
তত্র ন্যস্য সুতং তস্যাঃ সুতামাদায় নিঃসরেৎ॥ ১৬২

অনন্তর আনক-দুন্দুভি ব্রজেশ্বরীরগৃহে প্রবেশ করিয়া, সেখানে নিজের পুত্রকে রাখিয়া ব্রজেশ্বরীর কন্যাকে গ্রহন করিয়া বহির্গমন করেন।

সোহয়ং নিত্যসুতত্বেন তস্যা রাজত্যনাদিতঃ।
কৃষ্ণঃপ্রকটলীলায়াং তদ্দ্বারেণাপ্যভূৎ তথা॥ ১৬৩

সেই কৃষ্ণ নিত্যলীলার নিত্য যশোদার পুত্র হইয়া অনাদিকাল হইতেই বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু প্রকট লীলাতেও কৃষ্ণ যেমন দেবকীর দ্বারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ যশোদার দ্বারেও জন্মলাভ করিয়াছিলেন।

একি কথা, গোসাঁই ঠাকুর! এ আবার, কি বল! কৃষ্ণ দেবকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার তিনি যশোদার গর্ভেও জন্ম-

গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকট-লীলা, অপ্রকট-লীলার গূঢ় রহস্য এখন রেখে দাও। প্রকট-লীলায় কৃষ্ণ দুইবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন! রূপ! তোমাকে চৈতন্যদেব কতক আভাসে, কতক স্বপ্নে, কি তত্ত্ব শিখাইয়াছিলেন। তুমি ত ইঙ্গিতে বলিয়া গেলে, কৃষ্ণ দুইবার প্রকটভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—গোল লাগিল, ভক্তসমাজে। এককালে, দুইজনের গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইবার তাৎপর্য্য কি? ভাগবতেও ত একথা বলে না। এককালে দুইজনের গর্ভে জন্মগ্রহণ ত ভয়ানক কল্পনা-গৌরব। এ ত ভগবানের বৃথা চেষ্টা। তবে কি কৃষ্ণ প্রকটভাবে দুইকালে, দুইবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। য'াক্, আমার কল্পনা আমি রাখি। বলদেব বিদ্যাভূষণ আগে কি বলেন, শুনি।

"প্রকট-লীলাতে কৃষ্ণ দেবকী ও যশোদার ঔরসপুত্র, এরূপ পাঠ দেখা যায়। অপ্রকট-লীলাতেও কি পুত্র ভাব আছে? এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য, রূপগোস্বামী এই শ্লোকটি লিখিয়াছেন। যিনি অনাদি কাল হইতে তাঁহার, অর্থাৎ দেবকী ও যশোদার নিত্য পুত্র হইয়া বিরাজ করিতেছেন, সেই কৃষ্ণ প্রকট-লীলাতে (তদ্দ্বারেণ) দেবকী মাতা হইতে, (অপি) এবং 'অপি' শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, যশোদা-মাতা হইতেও, (তথা) লোকরীতি অনুসারে, প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। প্রকট প্রকাশে, দেবকী ও যশোদা দুইজনের গর্ভ হইতেই শ্রীকৃষ্ণ জন্মলাভ করিয়াছিলেন, একথা শুকদেবও বলিয়াছেন। দেবকীর গর্ভের কথা ত স্পষ্টই আছে। যশোদার গর্ভ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, অস্ফুটভাবে শুকদেব বলিয়াছেন। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-প্রকরণে আছে,—

নিশীথে তম-উদ্ভূতে জায়মানে জনার্দ্দনে।
দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ॥ ১০।৩।৮

আবার

যশোদা নন্দপত্নীচ জাতং পরমবুধ্যত।

ন তদ্বেদ পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মৃতিঃ॥ ১০-৩-৫৩

পূর্ব্বশ্লোকে, 'দেবক্যাং' এই শব্দে 'দেবকীতে ও যশোদাতে' বুঝিতে হইবে। এককালেই শ্রীকৃষ্ণ দেবকী ও যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিবংশেও এই কথা আছে,

গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তেস্ত্রিয়ৌ।

দেবকীচ যশোদাচ সুষুবাতে সমং তদা॥

গর্ভকাল পূর্ণ না হইতেই, অষ্টম মাসে দেবকী ও যশোদা এককালেই প্রসব করিয়াছিলেন। 'সমং' শব্দের অর্থ যুগপৎ। এই শ্লোকে বুঝায় যে, এককালে দেবকী ও যশোদার পুত্র জন্মিয়াছিল। ভগবতীর জন্ম কিঞ্চিৎ পরে হইয়াছিল। ভাগবতেও একথা আছে,—

ততশ্চ শৌরির্ভগবৎ প্রচোদিতঃ সুতং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ

যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া॥ ১০-৩-৪৮

এইজন্যই ভগবতীকে 'কৃষ্ণানুজা' বলে। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বোত্তরভাবে, যশোদার গর্ভে অপত্যদ্বয়ের জন্মগ্রহণ হইয়াছিল। কিন্তু বাসুদেব ও যশোদা তাহা দেখিতে পান নাই।

যশোদা নন্দপত্নীচ জাতং পরমবুধ্যত।

ন তদ্বেদ পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মৃতিঃ॥

বাসুদেব-পত্নীর ন্যায় নন্দপত্নী ভগবৎ লক্ষণ অবলোকন করিয়া, স্বগর্ভজাত শিশুকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিয়াছিলেন। যশোদার ত কন্যাও হইয়াছিল এবং তত্রাগত বাসুদেব সেই কন্যাকে লইয়া গেলেন এবং নিজের পুত্রকে রাখিয়া গেলেন; এ সকল কথা যশোদা দেবী জানিলেন না কেন? তাহার উত্তরে, শুকদেব বলিতেছেন যে, তিনি পরিশ্রান্ত ছিলেন এবং

নিদ্রাভিভূত হওয়াতে তাঁহার স্মৃতি অপগত হইয়াছিল। উল্লিখিত শ্লোকের এইরূপ অর্থ।

আদিপুরাণে স্পষ্টই নারদ বলিয়াছেন,—

নন্দগোপগৃহে পুত্রো যশোদাগর্ভসম্ভবঃ।

এইরূপ অর্থ স্বীকার করিলে, 'নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে,' 'ভগবান্ গোপিকা-সুতঃ,' এই সকল ভাগবতপুরাণের বাক্য মুখ্য অর্থেই গৃহীত হইতে পারে।

যদি বল, 'উপগুহ্যাত্মজামেবং রুদত্যা দীনদীনবৎ' (১০-৪-৭), এই শ্লোকে দেবকী ভগবতীকে আত্মজা বলিলেন, এত মুখ্য অর্থ হইতে পারে না। অবশ্য এখানে মুখ্য অর্থ নহে, আক্ষেপক অর্থও নহে। দেবকী কংসকে জানাইতে চাহেন যে, তাঁহার পুত্র হয় নাই, অষ্টম গর্ভে কন্যা জন্মিয়াছে। সেই জন্য স্বপুত্র গোপনের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক তিনি ভগবতীকে আত্মজা বলিয়াছেন।

একথা মানিলাম, কিন্তু শুকদেব যশোদার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম গুপ্তভাবে কেন বলিয়াছেন? ইহা স্বামীর ইচ্ছা বলিয়া জানিতে হইবে।

নন্দগেহে বাসুদেবগেহে চ মে প্রাকট্যং ভবিষ্যতি, স্থিতিস্ত্বেকরূপ্যেণ নন্দগেহে, দ্বৈরূপ্যেণ স্থিতৌ কংসো মাং বিজ্ঞায় পিত্রোঃ ক্লেশং নিক্ষিপেৎ ত্বয়াপি মচ্চরিতগায়কেন তথৈব গাতব্যং যথা রহস্যং ন ভিদ্যেত—ইতি স্বামিন ইষ্টিঃ।

"নন্দের গৃহে এবং বাসুদেবের গৃহে আমার প্রকটভাবে জন্ম হইবে। কিন্তু আমি একই রূপে নন্দের গৃহে অবস্থিতি করিব। যদি দুইরূপে, দুই কৃষ্ণ হইয়া আমি অবস্থিতি করি, তাহা হইলে কংস আমাকে জানিতে পারিবে এবং আমার পিতা মাতাকে কষ্ট দিবে। তুমি আমার চরিত্রগায়ক, তুমিও এইরূপে গান করিবে, যেন আমার রহস্য ভেদ না হয়। এই স্বামীর ইচ্ছা।"

এই ত গেল বলদেব বিদ্যাভূষণের কল্পনা। রূপগোস্বামী কেবলমাত্র আভাস দিলেন, দুই কৃষ্ণ দুই গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না যে, সেই দুই কৃষ্ণ এক কালেই প্রকটভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বলদেবও বলিয়াছেন, রূপগোস্বামীও বলিয়াছেন যে, এই কথার মধ্যে একটা রহস্য আছে, যাহা শুকদেব প্রচার করেন নাই। কি জন্য শ্রীকৃষ্ণ শুকদেবকে সে কথা প্রচার করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে বলদেবের মত আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। স্বয়ং কৃষ্ণই কৃষ্ণরহস্যের উদ্ভেদ করিতে পারেন। যদি চৈতন্যদেব রূপগোস্বামীকে সে কথা সমগ্রভাবে না বলিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা আবার তাঁহার অপেক্ষা করিব। কৃষ্ণমুখেই কৃষ্ণকথা শুনিব।

কথার এখনও শেষ হইল না। প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইল। বলদেব বিদ্যাভূষণের সহিত বিবাদ করা চলে, জীব গোস্বামীর সহিতও ভয়ে ভয়ে দুকথা বলা চলে, কিন্তু ভক্তের প্রাণস্বরূপ চৈতন্যদেবের দয়িতরূপ রূপের নিকট জিহ্বা স্তব্ধ হয়, তর্ক লুক্কায়িত হয়।

রূপের মুখে চৈতন্যের মধুরবাণী শুনিয়া আত্মবিহ্বল হইতে হয়, অমৃত-সিঞ্চিত কলেবরে জড়তা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই অমৃতময় বাণীর অমৃত-প্রবাহে আর একটিবার মাত্র গা ঢালিয়া দিব। দেখিব, এই গূঢ়তম রহস্যের দ্বার আরও কিঞ্চিৎ উদ্ঘাটিত করিতে পারি কি না।

যদুপতি কৃষ্ণ ও গোপীবল্লভ কৃষ্ণ।

কেচিদ্ ভাগবতাঃ প্রাহুরেবমত্র পুরাতনাঃ।
বূ্যহঃ প্রাদুর্ভবেৎ আদ্যো গৃহেষ্বানকদুন্দুভেঃ॥

লঘুভাগবতামৃত, পূর্ব্বখণ্ড ১৬৫।

কোন কোন প্রাচীন ভাগবত-গণ বলিয়া থাকেন, বসুদেবের গৃহে আদ্যবূ্যহ বাসুদেব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। আর ব্রজে ভগবতী যোগমায়ার সহিত শ্রীলীলা-পুরুষোত্তম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

যদুনন্দন বৈকুণ্ঠাধিপতির প্রকাশ মাত্র। তিনি চতুর্ব্বূ্যহের মধ্যে আদ্যবূ্যহ বাসুদেব। গোপীবল্লভ কৃষ্ণে বৈকুণ্ঠের উপরে বিরাজমান মধুর কৃষ্ণের আবির্ভাব।

গত্বা যদুবরো গোষ্ঠং তত্র সূতীগৃহং বিশন্।
কন্যামেব পরং বীক্ষ্য তামাদায়াব্রজৎ পুরম্।
প্রাবিশদ্ বাসুদেবস্তু শ্রীলীলা-পুরুষোত্তমম্॥

বসুদেব ব্রজে গমন করিয়া যশোদার সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি কেবলমাত্র কন্যাকে দর্শন করিলেন। সেই কন্যাকে গ্রহণ করিয়া বসুদেব মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে বাসুদেব কৃষ্ণ সেই শ্রীলীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণে প্রবেশ করিলেন।

এতচ্চাতি রহস্যত্বাৎ নোক্তং তত্র কথাক্রমে।
কিন্তু ক্বচিৎ প্রসঙ্গেন সূচ্যতে শ্রীশুকাদিভিঃ॥

কথাটি অত্যন্ত রহস্যকথা। এই জন্য কৃষ্ণের জন্মপ্রসঙ্গে, এই

রহস্য বর্ণিত হয় নাই ; কিন্তু কোন কোন স্থানে প্রসঙ্গ-ক্রমে শ্রীশুকদেবাদি ঋষিগণ ইহার সূচনা করিয়াছিলেন।

রূপ! যদি অতি রহস্য কথা হয়, তাহা হইলে, তুমিই যে সকল রহস্য প্রকাশ করিয়াছ, তাহার প্রমাণ কি? মহাপ্রভুও যে তোমাকে সমগ্র রহস্য বলিয়াছেন, তাহাই বা কে জানে! যখন সমগ্র রহস্য প্রকাশের সময় হইবে তখন মহাপ্রভু স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া দ্বারে দ্বারে সেই রহস্য ব্যক্ত করিবেন। দুই গর্ভে, দুই কৃষ্ণ। দুই বিভিন্ন প্রকাশ। একথা যে চৈতন্য-দেব রূপকে বলিয়াছিলেন, চৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার প্রথম অধ্যায়ে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু চৈতন্যের উক্তিতে এক কালে দুই কৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল এমন কথা পাওয়া যায় না।

প্রসঙ্গ-ক্রমে শুকদেবাদি যশোদার গর্ভসম্ভূত কৃষ্ণের যে সূচনা করিয়া-ছেন, রূপ তাহার প্রমাণ দেখাইতেছেন ;—

নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ।

ভা, পু, ১০-৫-১।

কৃষ্ণ নন্দের 'আত্মজ'।

নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রেত্যাগতমুদারধীঃ।

ভা, পু, ১০-৬-৪৩।

শ্রীকৃষ্ণ নন্দের স্বপুত্র।

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।

ভা, পু, ১০-৯-২১,

শুকদেব কৃষ্ণকে 'গোপিকাসুত' বলিলেন।

বন্যস্রজে কবল-বেত্র-বিষাণ-বেণু-লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়।

ভা, পু, ১০-১৪-১।

ব্রহ্মা কৃষ্ণকে "পশুপাঙ্গজ" বলিলেন। পশুপালক নন্দের অঙ্গজাত, অবশ্য বাসুদেবের অঙ্গজাত হইতে ভিন্ন।

এইবার রূপ যামল-বচনের প্রমাণ দিতেছেন।

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃপরঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি॥
দ্বিভুজঃ সর্ব্বদা সোঽত্র ন কদাচিৎ চতুর্ভুজঃ।
গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা॥

পূর্ব্বশ্লোকের পাঠ, চৈতন্য-চরিতামৃতের পাঠের সহিত ভিন্ন। যদুসম্ভূত কৃষ্ণ অন্য। যিনি পূর্ণ কৃষ্ণ, তিনি যদুসম্ভূত কৃষ্ণ হইতে অন্য। সেই পূর্ণ কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন না। তিনি বৃন্দাবনে সর্ব্বদা দ্বিভুজ, কদাচিৎ চতুর্ভুজ হন না। তিনি একমাত্র গোপীর সহিত মিলিত হইয়া, সেখানে নিত্যলীলা করিতেছেন।

অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো যদুপুরীং ব্রজেৎ।
ব্রজেশজত্বমাচ্ছাদ্য স্বাং ব্যঞ্জন্ বাসুদেবতাম্।
যো বাসুদেবো দ্বিভুজস্তথা ভাতি চতুর্ভুজঃ॥

ল, ভা, ১৬৬।

প্রকটরূপে যখন কৃষ্ণ যদুপুরী গমন করেন, তখন নন্দের ঔরসজাত রূপ আচ্ছাদন করেন। কেবলমাত্র বসুদেবের ঔরসজাত রূপ প্রকাশিত করেন। যিনি বাসুদেব, তিনি কখনও দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ, কখনও মনুষ্য, কখনও ঈশ্বর। নন্দনন্দন নিত্য মনুষ্যরূপী মধুর ভগবান্।

তাস্তা মধুপুরে লীলাঃ প্রকটয্য যদূদ্বহঃ।
দ্বারবত্যাং তথা যাতি তাং তাং লীলাং প্রকাশকঃ॥

মধুপুরে মাথুর-লীলা প্রকটিত করিয়া, তিনি দ্বারকায় গমন করেন, এবং সেখানকার প্রসিদ্ধ লীলা সকল প্রকাশিত করেন।

তত্রাবিষ্কুরুতে ব্যূহং প্রদ্যুম্নাখ্যং তৃতীয়কম্।
যতো ব্যূহোঽনিরুদ্ধাখ্য স্তুর্য্যঃ প্রকটতাং ব্রজেৎ॥

দ্বারকায় বাসুদেব কৃষ্ণ প্রদ্যুম্নাখ্য তৃতীয় ব্যূহ আবিষ্কৃত করেন। সেই প্রদ্যুম্ন হইতে আবার অনিরুদ্ধাখ্য চতুর্থ ব্যূহ প্রকটিত হয়।

ইতি ব্যূহচতুষ্কস্য লোকোত্তর-চমৎক্রিয়াঃ।
বিবাহাদ্যাশ্চ বহুধা লীলা স্তত্রৈব বর্ণিতাঃ॥

চতুর্ব্যূহের বিবাহাদি চমৎকার লীলা সকল ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রজে প্রকটলীলায়াং ত্রীন্ মাসান্ বিরহোঽমুনা।
তত্রাপ্যজনি বিস্ফূর্ত্তিঃ প্রাদুর্ভাবোপমাহরে।
ত্রিমাস্যাঃ পরতস্তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণেন সঙ্গতিঃ॥ ল, ভা, ১৬৭,

বৃন্দাবনের প্রকট-লীলায় কেবলমাত্র তিন মাস বিরহ হইয়াছিল। সেই তিনমাসে উদ্ধবের সংবাদ পাইয়া প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহারা কৃষ্ণের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেন। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ পরোক্ষভাবে থাকিলেও তাঁহার প্রাদুর্ভাবরূপ স্ফূর্ত্তি তাঁহাদের হৃদয়ে হইয়াছিল। তিন মাসের পর দন্তবক্র-বধানন্তর, তাঁহাদের সাক্ষাৎ কৃষ্ণের সহিত সঙ্গতি হইয়াছিল।

ব্রজাগমনকালে চ পাদ্মোক্তেঽন্যচ্চ বর্ত্ততে।

'অথ তত্রস্থা নন্দগোপাদয়ঃ সর্ব্বে জনাঃ পুত্রদারাদিসহিতাঃ পশু-পক্ষি-মৃগাদয়শ্চ বাসুদেবপ্রসাদেন দিব্যরূপধরা বিমানমারূঢ়াঃ 'পরমং বৈকুণ্ঠ-লোকমবাপুঃ।' পদ্মপুরাণ, উঃ খ, ২৭৯-২৭।

অত্র কারিকে,—

ব্রজেশাদেরংশভূতা যে দ্রোণাদ্যা অবাতরন্।
কৃষ্ণস্তানেব বৈকুণ্ঠে প্রাহিণোদিতি সাম্প্রতম্॥
প্রেষ্ঠেভ্যোঽভিপ্রিয়তমৈ র্জনৈ র্গোকুলবাসিভিঃ।
বৃন্দারণ্যে সদৈবাসৌ বিহারং কুরুতে হরিঃ॥ ল, ভা, ১৭২।

দন্তবক্রবধের পর যখন কৃষ্ণ ব্রজে প্রত্যাগমন করেন, তখন যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে অন্যরূপ বর্ণনা আছে।

পদ্মপুরাণ মতে, সেই কালে বাসুদেবের অনুগ্রহে পুত্রদারাদি সহিত নন্দগোপাদি বিমানারূঢ় হইয়া বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিয়াছিলেন।

এখানে বুঝিতে হইবে, কৃষ্ণের নিত্য-পরিবার নন্দাদির অংশভূত স্বর্গবাসী দ্রোণাদি যাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং শ্রেষ্ঠ হইতেও প্রিয়তম গোকুল-নিবাসী নিজজনের সহিত কৃষ্ণ সর্ব্বদা বৃন্দাবনে বিহার করিতেছেন।

জীব গোস্বামী! আমি ধৃষ্টতা করিয়া তোমার সহিত বিবাদ করিয়াছি। বলিয়াছি নন্দাদি সেই কালে মানব-দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রূপ গোস্বামী ত সেই কথাই বলিলেন।

আমার ধৃষ্টতার কারণ এই যে, আমার ধারণা, এই কথাটির মধ্যে একটি গভীর রহস্য নিহিত রহিয়াছে! সেই রহস্যের মুখ বন্ধ করিলে, ভবিষ্যতে তাহার উদ্ভেদ অসম্ভব হইবে!

যাহা হউক, বুঝিতে হইবে যে, এই সময়ে বৃন্দাবনের প্রকটলীলা অস্তমিত হইল। কিন্তু পুত্রের সহিত নন্দ বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন, এ কথার রহস্য রহস্যই থাকিয়া গেল। নন্দের ত একটিই পুত্র। আবার কি কৃষ্ণ নিত্যলীলা করিবার জন্য যশোদার গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? আমাদের নিত্যলীলার নিত্য অভিনায়ক কৃষ্ণ লইয়াই প্রয়োজন। সেই কৃষ্ণ রাধার কৃষ্ণ। সে কৃষ্ণ রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত চৈতন্য-দেবের কৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণেরই চৈতন্য-দেহে আবির্ভাব। আবার চৈতন্যদেব কৃষ্ণেরই প্রেমভিখারী। রাধাভাব অবলম্বন করিয়া সেই কৃষ্ণের বিরহেই চৈতন্যের দশ দশা উপস্থিত হইয়াছিল। সেই কৃষ্ণের মাধুর্য্যে জগৎ আজ মধুরভাব ধারণ করিতেছে। সেই কৃষ্ণের ভাবে আজ ভক্তহৃদয় আপ্লুত হইতেছে।

সেই কৃষ্ণের প্রেম চৈতন্যদেব ঘরে ঘরে বিলাইয়াছেন। সেই কৃষ্ণকে চৈতন্যদেব আমাদের নিকটস্থ করিয়াছেন।

‘সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।’—এই বীজমন্ত্রে গীতা যাঁহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নির্গুণ ভক্তির শিক্ষায় কপিলদেব দেবহূতিকে প্রচ্ছন্নভাবে যাঁহার কথা বলিয়াছেন, যিনি গোপীদের সর্ব্বস্বধন, শ্রীরাধিকা যাঁহার পরাশক্তি, সেই মধুর কৃষ্ণের মানসিক সেবা চৈতন্যদেব আমাদিগকে শিখাইয়া গিয়াছেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে সেই কৃষ্ণের নাম তিনি প্রচার করিয়াছেন। সেই গোপীবল্লভ কৃষ্ণ যদুপতি কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং।"

নিমি রাজা নবযোগীন্দ্রকে প্রশ্ন করিলেন,—

কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশো নৃভিঃ।
নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাম্॥

ভা, পু, ১১-৫-১৯।

সত্য ও ত্রেতা যুগের অবতার-প্রসঙ্গ শেষ করিয়া করভাজন ঋষি উত্তর করিলেন—

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈ রুপলক্ষিতঃ।

'দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামবর্ণ। তিনি পীতবসন ও শঙ্খচক্রাদি-ধারী। শ্রীবৎসাদি তাঁহার উপলক্ষণ।' তাঁহাকে কি বলিয়া লোকে পূজা করে?

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥
নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ॥

আমাদের বুঝিতে বাকি থাকিল না, ইনি বাসুদেব কৃষ্ণ, যিনি নারায়ণ ঋষির শরীরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি যথা শৃণু॥

হে রাজন্! দ্বাপরে এইরূপে জগদীশ্বরের স্তব করে। নানা

তন্ত্রের বিধান অনুসারে, কলিযুগে তাঁহার যেরূপ আরাধনা, তাহা শ্রবণ করুন্।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

কলির আরাধ্য কৃষ্ণ, কৃষ্ণবর্ণ হইলেও কান্তিতে অকৃষ্ণ বা শ্বেত। তাঁহার অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পারিষদ আছে। অঙ্গাদি সহিত সেই অকৃষ্ণ কৃষ্ণকে, বুদ্ধিমান্ পুরুষেরা সঙ্কীর্ত্তনময় যজ্ঞদ্বারা পূজা করেন।

এই শ্লোকদ্বারা ভাগবত মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন, দ্বাপরের বাসুদেব কৃষ্ণ হইতে কলির অকৃষ্ণ কৃষ্ণ ভিন্ন।

চৈতন্যদেবে এই অকৃষ্ণ কৃষ্ণের আবির্ভাব। বৈষ্ণবেরা নানা অর্থে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং" শ্লোকের অনুবাদ করেন, এবং এই শ্লোক মহাপ্রভু চৈতন্যদেবে প্রয়োগ করেন।

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরাৎ
অকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তন-ময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥ স্তবমালা,

কলিযুগে পণ্ডিতগণ সাক্ষাৎভাবে যাঁহার পূজা করেন, শরীরের অত্যন্ত দ্যুতিবশতঃ যিনি অকৃষ্ণাঙ্গ অথচ যিনি কৃষ্ণ, যাঁহাকে উৎকীর্ত্তনময় যজ্ঞদ্বারা পূজা করা যায়, যাঁহাকে সকলে চতুর্থাশ্রমী পরমহংসগণের উপাস্য বলেন, চৈতন্যাকৃতি সেই দেব আমাদিগের প্রতি অতিশয় কৃপাবিস্তার করুন।

কৃষ্ণসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে জীব গোস্বামী বলেন,—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি-বৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্য মাশ্রিতাঃ॥

যিনি অভ্যন্তরে কৃষ্ণ ও বহির্দ্দেশে গৌরদেহ ধারণ করিয়া, অঙ্গাদির

বৈভব দর্শন করাইয়াছেন, আমরা কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা সেই কৃষ্ণচৈতন্যের আশ্রয় গ্রহণ করি।

শুন ভাই এই সব চৈতন্য-মহিমা।
এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা॥
কৃষ্ণ এই দুইবর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিঁহো বর্ণে নিজ মুখে॥
কৃষ্ণবর্ণ শব্দের অর্থ দুইত প্রমাণ।
কৃষ্ণ বিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন॥
কেহ তাঁরে বলে যদি কৃষ্ণবরণ।
আর বিশেষণে তাহা করে নিবারণ॥
দেহ-কান্ত্যা হয় তিঁহ অকৃষ্ণবরণ।
অকৃষ্ণবরণে কহি পীতবরণ॥
প্রত্যক্ষ তাঁহার তপ্তকাঞ্চনের দ্যুতি।
যাঁহার ছটায় নাশে অজ্ঞান তমস্ততি॥
জীবের কল্মষ তমো নাশ করিবারে।
অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে॥
ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার কল্মষ নাম সেই মহাতমঃ॥
বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্ট্যে চায়।
করিয়া কল্মষনাশ প্রেমেতে ভাসায়॥
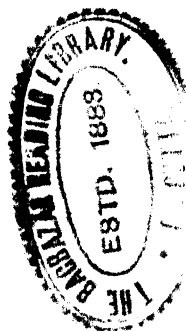
চৈ, চ, আ, লী, ৩য় পরিচ্ছেদ।

এই 'অকৃষ্ণাঙ্গ কৃষ্ণে'র সহিত দ্বাপরের কৃষ্ণের যে ভেদ, ভাগবতের সহিত মহাভারতের সেই ভেদ, শুকদেবের সহিত ব্যাসদেবের সেই ভেদ, নির্গুণ ভক্তির সহিত স্বধর্ম্মমূলক সগুণ ভক্তির সেই ভেদ।

দৃষ্ট্বানুযান্ত মৃষিমাত্মজ মপ্যনগ্নং দেব্যো হ্রিয়া পরিদধুর্ন সুতস্য চিত্রম্।
তদ্বীক্ষ্য পৃচ্ছতি মুনৌ জগদুস্তবাস্তি স্ত্রীপুং ভিদা ন তু সুতস্য
বিবিক্তদৃষ্টেঃ॥ ভা পু, ১-৪-৫।

পুত্র শুকদেব প্রব্রজ্যা করিয়া সরোবরের তীর দিয়া গমন করিলেন। তিনি নগ্ন থাকিলেও দেবকন্যারা জলকেলি করিতে করিতে তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জিত হইলেন না। বৃদ্ধ পিতা ব্যাসদেব সেই পথে তাঁহার অনুগমন করিলেন। তখন লজ্জাবশতঃ দেবকন্যারা বস্ত্র পরিধান করিলেন। এই বিচিত্র ঘটনা দেখিয়া ব্যাসদেব তাঁহাদিগকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবকন্যারা বলিলেন,—"আপনার স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ-জ্ঞান আছে। কিন্তু আপনার পুত্র সর্ব্বত্র ভগবান্‌কে দর্শন করিতেছেন। তাঁহার এই ভেদ-জ্ঞান নাই।"

ব্যাসদেব বিশাল মহাভারত রচনা করিয়াও হৃদয়ে তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। "আমি ভরত-বংশের আখ্যান করিতে গিয়া সমগ্র বেদের অর্থ দেখাইয়াছি। এই মহাভারতে ধর্ম্মের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এমন কি স্ত্রী-শূদ্রাদিও ইহার মধ্যে আপনাদের ধর্ম্ম দেখিতে পাইবে। তথাপি আমার আত্মা অসম্পন্নের ন্যায় বোধ হইতেছে। তবে কি আমি ভাগবত-ধর্ম্ম নিরূপণ করি নাই? এই ভাগবত-ধর্ম্মই পরমহংসদিগের প্রিয়। এমন কি এই ভাগবতধর্ম্ম অচ্যুতেরও প্রিয়।"

সময় বুঝিয়া নারদ ঋষি সেই বিবিক্ত প্রদেশে উপনীত হইলেন। তিনি বলিলেন, "ব্যাসদেব! তুমি যাহা ভাবিতেছ, তাহাই সত্য।"

যথা ধর্ম্মদয়শ্চার্থা মুনিবর্য্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হ্যনুবর্ণিতঃ॥ ভা, পু, ১-৫-৯

হে মুনিবর্য্য, তুমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছ, বাসুদেবের মহিমা সেরূপ কীর্ত্তন কর নাই।

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানফলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে নচার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥

নিরুপাধি ব্রহ্মজ্ঞানও ভগবদ্ভাব-বর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না। কর্ম্ম সকামই হউক বা নিষ্কামই হউক, তাহার ত কথাই নাই।

ততোঽন্যথা কিঞ্চন যদ্বিবক্ষতঃ পৃথগ্দৃশস্তৎ কৃতরূপনামভিঃ।
ন কর্হিচিৎ ক্কাপিচ দুঃস্থিতা মতির্লভেত বাতাহতনৌরিবাস্পদম্॥

এক ভগবানেরই যথাসাধ্য বর্ণনা কর। তাহা ভিন্ন আর যাহা কিছু বলিতে ইচ্ছা করিবে, লোক একে ভেদদর্শী, নানা রূপ ও নামসমন্বিত তোমার সেই বাক্যে তাহাদের বুদ্ধি স্থিরতা-লাভ করিবে না। বাতাহত নৌকার ন্যায় তাহাদের বুদ্ধি ঘূর্ণিত হইতে থাকিবে।

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্কবাঽভদ্রমভূদমুষ্য কিং কোবার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥

যদি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেহ হরির চরণাম্বুজ ভজনা করে, সে অপক্ক অবস্থাতেও যদি পতিত বা মৃত হয়, তাহা হইলে সে যে অবস্থাতেই থাকুক, বা যে বংশেই পুনর্জন্ম গ্রহণ করুক, তাহার অমঙ্গল হয় না। আর স্বধর্ম্ম আচরণ করিয়া কেহ যদি হরির ভজনা না করে, তবে সেই বা কোন্ অর্থ লাভ করে?

ব্যাসদেব ঐশ্বর্য্যমার্গে ঈশ্বরকে দেখাইয়াছেন। তিনি অপরা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতির ঈশিতাকে দেখাইয়াছেন। বিশ্ব ও প্রকৃতির পারে তাঁহার কি নিজরূপ নাই? সেই আনন্দময়ের কি আনন্দমূর্ত্তি নাই, যাহা দেখিয়া জগৎ আনন্দলাভ করিতে পারে, ভয় বিসর্জ্জন করিতে পারে, অসম্ভ্রমে ভগবান্‌কে আলিঙ্গন করিতে পারে। ভগবানের কি নিজরূপ নাই? তিনি কি সর্ব্বদাই শাসনকর্ত্তা। তাঁহার কি নিজজন নাই, যাহাদিগকে শাসন করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না, যাহারা তাঁহার

শাসনাতীত, যাহারা তাঁহার সহকারী, যাহারা তাঁহার হৃদয়াধিকারী। এই সংসারের ভেদজালের মধ্যে, এই ভেদের অত্যন্ত সংঘর্ষণে, এই 'আমি-তুমি'র নিরন্তর কলরবে, এমন কি দ্বৈত-শাসন-কারী বেদ, বিধি, ধর্ম্মের চীৎকার রবে না ভগবানের মধুর স্বরূপ জানা যায়, না তাঁহার নিজজনের মাহাত্ম্য অনুভব করা যায়।

কেবল মাত্র অকৈতব-ধর্ম্মে ভগবান্‌কে জানিতে পারা যায়।

অকৈতব-ভক্তি।

অকৈতব-ভক্তি নিগুর্ণ-ভক্তির নামান্তর মাত্র। যে ভক্তিতে ভগবানের সহিত ব্যবধান নাই, এবং যে ভক্তির মূলে কোন হেতু নাই, তাহাকে অকৈতব-ভক্তি বলে। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ভগবান্‌কে দূর হইতে প্রণাম করিতে হয়, এই জন্য ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরের সহিত ব্যবধান করিয়া দেয়, অতএব ঐশ্বর্য্য কৈতবের মধ্যে। ভেদের শাসনের জন্য বেদের বিধি। ভেদের মধ্যেই সেই বিধি ভাল লাগে ও সেই বিধি ভক্তের সহায়ক হয়। কিন্তু যেখানে কেবলমাত্র ভগবৎ-সম্বন্ধ এবং ভগবৎ-সম্বন্ধেই অন্যের সহিত সম্বন্ধ, সেখানে বিধি ভগবানের সহিত ব্যবধান করিয়া দেয়; অতএব বিধিও কৈতবের মধ্যে। ভুক্তি নিজের ভোগ, মুক্তি নিজের বন্ধ-মোচন। শুদ্ধ ভক্তিতে নিজের চিন্তা নাই, কেবলমাত্র ভগবৎ-ভাবনা ও ভগবানের কার্য্য সাধন। অতএব ভুক্তি ও মুক্তি, দুই সমানভাবে কৈতব।

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
সালোক্য-সার্ষ্টি সামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥

ভা, পু ৩—২৯

কপিলদেব নির্গুণ-ভক্তির এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। এই অকৈতব নির্গুণ ভক্তি লইয়াই ভাগবতপুরাণ।

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাম্" ১-১-২।

এই ভাগবত পুরাণে নির্মৎসর সাধুদিগের জন্য পরম ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, যে ধর্ম্মে কৈতব প্রকৃষ্টরূপে ত্যক্ত।

শ্রীধরস্বামী বলেন—"উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। কেবলমীশ্বরারাধন লক্ষণো ধর্ম্মো-নিরূপ্যতে।"

অর্থাৎ এ ধর্ম্মে ফলাভিসন্ধানরূপ কপটতা নাই। এমন কি মোক্ষেরও অভিসন্ধান নাই। কেবলমাত্র ঈশ্বরারাধন-লক্ষণ এই ধর্ম্ম।

এই ভাগবতধর্ম্ম প্রচারের জন্যই মহাপ্রভুর অবতার। তিনি এই ভাগবতধর্ম্মের জলন্ত, জীবন্ত, চূড়ান্ত উদাহরণ।

প্রহ্লাদ কথিত নবধা ভক্তি এই ভাগবত-ধর্ম্মের বীজমন্ত্র।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

প্রথমে হরির নাম ও লীলা শ্রবণ। তাহার পর হরিনামের ও হরি-লীলার উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন। তাহার পর হরির নিত্য স্মরণ ও মনে মনে নিত্য নাম গ্রহণ। তাহার পর মন্দিরে পরিচর্য্যা। তাহার পর প্রতিমাদিতে তাঁহার পূজন। তাহার পর হরির বন্দনা। এইরূপে শান্তভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার পর নিত্য ভগবানের দাসত্ব। জীবে দয়া ও অনুরাগ এবং জীবের উপকারই ভগবানের দাসত্ব।

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষবস্থিতম্॥—ভা, পু, ৩২, ৯—২৫

সেইকাল পর্য্যন্ত প্রতিমাদিতে ঈশ্বরের আরাধনা করিবে, যে কাল

পর্য্যন্ত আপনার হৃদয়ে এবং সকল প্রাণীতে তাঁহাকে অবস্থিত বলিয়া জানিতে না পারিবে।

অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥—৩-২৯-২৭

আমি সকল ভূতে অবস্থিত, সকল ভূতেরই আত্মা। এই জন্য অভিন্ন দৃষ্টিতে সকল প্রাণীকে দান, মান ও মৈত্রী দ্বারা পূজা করিবে।

ইহাই হইল ভগবানের দাসত্ব। তাহার পর সখ্য। ভগবানের সহিত এতদূর ঘনিষ্ঠতা আসিয়া পড়ে যে, ভক্ত তখন ভগবান্‌কে আপনার বলিয়া জ্ঞান করেন, এমন কি ভগবান্‌কে আপনার সখা বলিয়া বিবেচনা করেন। বাৎসল্য-ভাবও এই সখ্যভাবের অন্তর্গত। তাহার পর মধুর-ভাবে আত্ম-নিবেদন।

এই ভক্তির মধ্যে ভেদ নাই, বিধি নাই, ভুক্তি মুক্তি নাই।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব শ্রবণ ও নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া আত্ম-নিবেদন পর্য্যন্ত ভক্তির সকল অঙ্গই নিজ লীলা দ্বারা দেখাইয়াছিলেন এবং অধিকারি-ভেদে নবধা ভক্তির সকল অঙ্গই প্রচার করিয়াছিলেন।

ভক্তির কপটতা তিনি একেবারে সহ্য করিতে পারিতেন না। সুতরাং ভক্তগণকে তিনি সর্ব্বদা অকপট-অকৈতব ভক্তির শিক্ষা দিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে এ বিষয়ে তাহাদের পরীক্ষা লইতেন।

আরদিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দরশনে।
দর্শন করিলা জগন্নাথ শয্যোত্থানে॥
পূজারি আনিয়া থালা প্রসাদান্ন দিলা।
প্রসাদান্ন থালা পাঞা প্রভু হর্ষ হৈলা॥
সেই প্রসাদান্ন থালা অঞ্চলে বান্ধিয়া।
ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলা ত্বরাযুক্ত হৈয়া॥

অরুণোদয় কালে হৈল প্রভুর আগমন।
সেইকালে ভট্টাচার্য্যের হৈল জাগরণ ॥
কৃষ্ণ-কৃষ্ণ স্ফুট কহি ভট্টাচার্য্য ভাবিল।
কৃষ্ণনাম শুনি প্রভুর আনন্দ বাড়িল ॥
বাহিরে প্রভুর তেঁহো পাইল দরশন।
আস্তে-ব্যস্তে আসি কৈল চরণবন্দন ॥
বসিতে আসন দিয়া দোঁহেতে বসিলা।
মহাপ্রসাদান্ন খুলি প্রভু হাতে দিলা ॥
প্রসাদান্ন পাঞা ভট্ট আনন্দ হৈল মন।
কৃতার্থ হইয়া প্রসাদ করিল ভক্ষণ ॥
স্নান সন্ধ্যা দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল।
চৈতন্য প্রসাদে মনের সব জাড্য গেল ॥
ভক্তি করি মহাপ্রসাদ কর পাতি লৈল।
এই শ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল ॥
শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং দৃষ্টে ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ ॥—পদ্মপুরাণ
দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া কৈলা তারে আলিঙ্গন ॥
দুইজন ধরি দোঁহে করেন নর্ত্তন।
দোঁহার স্পর্শেতে দোঁহার প্রফুল্ল হৈল মন।
স্বেদ কম্প অশ্রু দোঁহে আনন্দে ভাসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা ॥

আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠে আরোহণ॥
আজি মোর পূর্ণ হৈল সব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥
আজি নিষ্কপটে তুমি হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ নিষ্কপটে হৈলা তোমারে সদয়॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন।
আজি ছিন্ন কৈলে তুমি মায়ার বন্ধন॥
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি-যোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদ ধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥

—চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বেদের বিধি লঙ্ঘন করিতে পারিলেন, তখন নিশ্চয় জানা গেল যে, ভগবৎ-প্রেম তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। সে হৃদয়ে কি আর মুক্তি স্থান পায়? ভগবানের সেবা ছাড়িয়া মুক্তি? নিজের জন্য মুক্তি? শুদ্ধ ভক্তিতে মুক্তি কপটতা মাত্র।

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিলেন—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্ব্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥ ১০-১৪-৮

'কেবলমাত্র তোমার কৃপার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, আপন কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে, কায়মনোবাক্যে তোমায় নমস্কার করিতে করিতে, যে ব্যক্তি জীবন ধারণ করেন, সেই ব্যক্তি মুক্তির আশ্রয়স্বরূপ তোমাতে দায়াধিকার লাভ করিয়া থাকেন।'

সার্ব্বভৌম একদিন এই শ্লোক পড়িয়া মহাপ্রভুর স্তব করিলেন। কিন্তু তিনি "মুক্তিপদে" না বলিয়া "ভক্তিপদে" বলিলেন।

প্রভু কহে "মুক্তিপদে" ইহা পাঠ হয়।
ভক্তিপদ কেনে পড় কি তোমার আশয়॥
ভট্টাচার্য্য কহে মুক্তি নহে ভক্তিফল।
ভগবদ্বিমুখের হয় দণ্ড কেবল॥
কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে॥
সেই দুয়ের দণ্ড হয় ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি।
তার মুক্তিফল নহে যেই করে ভক্তি॥
যদ্যপি সে মুক্তি হয় পঞ্চপ্রকার।
সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য সার্ষ্টি সাযুজ্য আর॥
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার।
তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুইত প্রকার।
ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে ঈশ্বরসাযুজ্য ধিক্কার॥

[যাহার সেবাকরা ভক্তের চরম উদ্দেশ্য, তাহার সহিত এক হওয়া ভক্ত স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না।]

প্রভু কহে মুক্তি পদের আর অর্থ হয়।
মুক্তিপদ শব্দে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয়॥
মুক্তিপদে যার সেই মুক্তিপদ হয়।
নবম পদার্থ মুক্তির কিংবা সমাশ্রয়॥

[পুরাণের দশ লক্ষণ। তাহার মধ্যে মুক্তি নবম লক্ষণ।]

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণ মূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা॥ ভাঃ পুঃ ২-১০

দুই অর্থে কৃষ্ণ কহি কাহে পাঠ ফিরি।
সার্ব্বভৌম কহে ও পাঠ কহিতে না পারি॥
যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কয়।
তথাপি আশ্লিষ্য দোষে কহনে না যায়॥
যদ্যপি মুক্তিশব্দের হয় পঞ্চবৃত্তি।
রূঢ়িবৃত্তে কহে তবু সাযুজ্যে প্রতীতি॥
মুক্তিশব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস।
ভক্তিশব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস॥
শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিত মন।
ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন॥ চৈ, চ, মধ্য, ৬

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ভক্তি মহাপ্রভুর অসহ্য ছিল। তিনি লক্ষ্মীদেবীর ভক্তির উপর কটাক্ষ করিতেন। ব্রজের অকৈতব শুদ্ধ ভক্তি তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনি কেবল সেই ভক্তিরই উপদেশ করিতেন।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বেঙ্কট ভট্ট নামে একজন বৈষ্ণব বাস করিতেন। মহাপ্রভু তাঁহার গৃহে চাতুর্মাস্য করিয়াছিলেন। ঐ ভট্ট নিষ্ঠার সহিত লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবা করিতেন।

প্রভু কহে ভট্ট তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
কান্তবক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা-শিরোমণি॥
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোচারণ।
সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম॥

এই লাগি সুখভোগ ছাড়ি চিরকাল।
ব্রত নিয়ম করি তপ করিলা অপার॥
ভট্ট কহে কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদগ্ধ্যাদি রূপ॥
তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা ধর্ম্ম।
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম॥
কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম্ম নহে নাশ।
অধিক লাভ পাইয়ে আর রাস বিলাস॥
বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাষ।
ইহাতে কি দোষ কেনে কর পরিহাস॥
প্রভু কহে দোষ ইহা নাহি আমি জানি।
রাস না পাইল লক্ষ্মী ইহা শাস্ত্রে শুনি॥
লক্ষ্মী কেনে না পাইলা কি ইহার কারণ।
তপ করি কৈছে কৃষ্ণ পাইলা শ্রুতিগণ॥
শ্রুতি পায়, লক্ষ্মী না পায় ইথে কি কারণ।
ভট্ট কহে ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন॥
প্রভু কহে কৃষ্ণের এক স্বভাব লক্ষণ।
স্বমাধুর্য্যে করে সদা সর্ব্ব আকর্ষণ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাই তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজজন॥
কেহ তাঁরে পুত্রজ্ঞানে উদূখলে বান্ধে।
কেহ সখা জ্ঞানে জিনি চড়ে তাঁর কান্ধে॥
ব্রজেন্দ্র-নন্দন তাঁরে জানে ব্রজজন।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞান নাহি নিজ সম্বন্ধ মনন॥

ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥
শ্রুতি সব গোপীগণের অনুগতা হঞা।
ব্রজেশ্বরী সুত ভজে গোপীভাব লঞা॥
ব্যূহান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল॥
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল॥
গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী প্রেয়সী তাঁহার।
দেবী বা, অন্যস্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার॥
লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপিকা-অনুগা হঞা না কৈল ভজন॥
অন্যদেহে না পাইয়ে রাসবিলাস।
অতএব "নায়ং" শ্লোক কহে বেদব্যাস॥ চৈ, চ, মধ্য, ৯।

ঐশ্বর্য্যে সম্ভ্রম আছে, অপেক্ষা আছে, ভয় আছে। এ সকল ত কৈতব। অকৈতবে, অকপটে কৃষ্ণ-সঙ্গমলাভের জন্য এক ব্রজভাব ভিন্ন অন্য ভাব নাই। সে ভাবে বিধি নাই, ঐশ্বর্য্য নাই, মুক্তির প্রলোভন নাই। সে ভাবে অব্যবধানে কৃষ্ণের সহিত মেশামেশি হওয়া সম্ভব। তবে সে ভাবে গোপীর অনুগত হইতে হয়।

মধ্বাচার্য্যের শিষ্যগণ তত্ত্ববাদী। তাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলেন, এবং মুক্তি তাঁহাদের চরম লক্ষ্য। মহাপ্রভু উড়ুপ কৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য মধ্বাচার্য্যের স্থানে গমন করিলেন।

তত্ত্ববাদীগণ প্রভুকে মায়াবাদী জ্ঞানে।
প্রথম দর্শনে প্রভুর না কৈল সম্ভাষণে॥
পাছে প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমৎকার
বৈষ্ণব জ্ঞানেতে বহু করিল সৎকার॥

বৈষ্ণবতা সবার অন্তরে গর্ব্ব জানি।
ঈষৎ হাসিয়া কিন্তু কহে গৌরমণি॥
সবার অন্তরে গর্ব্ব জানি গৌরচন্দ্র।
তা সবা সহিত গোষ্ঠী করিল আরম্ভ॥
তত্ত্ববাদী আচার্য্য শাস্ত্রে পরম প্রবীণ।
তাঁরে প্রশ্ন কৈল প্রভু হৈয়া যেন দীন॥
সাধ্য সাধন আমি না জানি ভাল মতে।
সাধ্য সাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে॥
আচার্য্য কহে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কৃষ্ণ সমর্পণ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন॥
পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন।
সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র নিরূপণ॥
প্রভু কহে শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীর্ত্তন।
কৃষ্ণপ্রেম-সেবা ফলের পরম সাধন॥

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

ভা, পু, ৭-৫

শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পরম পুরুষার্থ পুরুষার্থ সীমা॥

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ॥
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

ভাঃ পুঃ ২-৪৭-৩৮

কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মনিন্দা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি কভু নহে॥
আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং যজেৎ স চ সত্তমঃ॥

ভা, পু, ১১-১১-৩২।

'বেদে বিধিমার্গে আমি যে গুণ-দোষাত্মক স্বধর্ম্মের আদেশ করিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণরূপে জানিয়াও ভক্তির ব্যাঘাত ও বিক্ষেপকারী বলিয়া সকল ধর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া যিনি আমাকে ভজনা করেন, তিনিই সর্ব্বোত্তম সাধু।'

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ভগবদ্গীতা।
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে। ভা, পু, ১১-২০-৯।
পঞ্চবিধ মুক্তিত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গুকরি মুক্তি দেখে নরকের সম॥
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ। ভা, পু, ৫-১৪-৪৩।
কৃষ্ণসেবানুরক্ত মহাত্মাদিগের নিকট অভব বা নির্ব্বাণমুক্তিও তুচ্ছ।
কর্ম্ম মুক্তি দুইবস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্য সাধন॥ চৈ, চ, মধ্য, ৯।

বৈধভক্তি, ঐশ্বর্য্যমার্গ ও মুক্তিবাঞ্ছা, এই তিন ত্যাগ করিয়া রাগমার্গে অকৈতব-ভক্তি করাই চৈতন্যদেবের শিক্ষা। কিন্তু অধিকারী ভেদে বহিরঃ ভক্তের জন্য তিনি একবারে বৈধভক্তি ত্যাগের নিষেধ করিতে পারে নাই। বৈধভক্তির বন্ধন তিনি শিথিল করিয়া গিয়াছেন, এবং বৈধভক্তি অনুকল্পও তিনি বিধান করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বে তীর্থযাত্রায়, উপবাস ও ক্ষৌর না করিয়া কেহ মহাপ্রসাদ পর্য্যন্ত ভোজন করিতেন না। রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্য-ভক্তগণের বিপরীত বিধান দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

রাজা কহে উপবাস ক্ষৌর তীর্থের বিধান।
তাহা না করিয়া কেনে খাবে অন্ন পান॥
ভট্ট কহে তুমি কহ সেই বিধিধর্ম্ম।
এই রাগমার্গে আছে সূক্ষ্ম ধর্ম্মকর্ম্ম॥

*   *   *
*   *   *

যারে কৃপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ।
কৃষ্ণাশ্রয় ছাড়ে সেই বেদ লোকধর্ম্ম॥

যদা যস্যানুগৃহ্লাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥—ভা, পু, ৪-১৯-৪৫।

যখন আত্মভাবিত ভগবান্ অনুগ্রহ করেন, তখন ভক্ত লোকব্যবহারে ও বেদে পরিনিষ্ঠিতা বুদ্ধি ত্যাগ করে।—চৈ, চ, মধ্য, ১১।

প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে॥
আনুসঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষয়ে করে কৃষ্ণপ্রেমোদয়॥ চৈ, চ, মধ্য, ১৫।

বাস্তবিক পক্ষে নবধা ভক্তিতেও বহিরঙ্গ সাধন ও অন্তরঙ্গ সাধন

আছে। দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন অন্তরঙ্গ। আর সব বহিরঙ্গ। রাগানুগা ভক্তিতে বহিরঙ্গ বা বৈধসাধনের প্রয়োজন হয় না। বহিরঙ্গ অধিকারীর জন্য বৈধ ভক্তির প্রয়োজন হয়। মহাপ্রভু নিম্নলিখিতরূপে বৈধী ভক্তির অনুকল্প দেখাইয়াছেন।

রাগহীন জন ভজে শাস্ত্র আজ্ঞায়।
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধুসঙ্গ সার॥
গুরুপদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষা পৃচ্ছা সাধুমার্গানুগমন॥
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎ-নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ একাদশ্যুপবাস॥
ধাত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন।
সেবা নামাপরাধাদি দূরে বর্জ্জন॥
অবৈষ্ণব সঙ্গ ত্যাগ বহু শিষ্য না করিবে।
বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিবে॥
হানিলাভ সম শোকাদি-বশ না হইবে।
অন্যদেব অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিবে॥
বিষ্ণু বৈষ্ণব নিন্দা গ্রাম্য বার্ত্তা না শুনিবে।
প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পূজন বন্দন।
পরিচর্য্যা দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন॥
অগ্রে নৃত্যগীত বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎ নতি।
অভ্যুত্থান অনুব্রজ্যা তীর্থগৃহে গতি॥

পরিক্রমা স্তবপাঠ জপ সংকীর্ত্তন।
ধূপ মাল্য গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন॥
আরাত্রিক মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তি দরশন।
নিজপ্রিয়-দান ধ্যান তদীয় সেবন॥
তদীয় তুলসী বৈষ্ণব মথুরা ভাগবত।
এই চারিসেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা তৎকৃপাবলোকন।
জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ॥
সর্ব্বদা শরণাগতি কার্ত্তিকাদি ব্রত।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব॥
সাধুসঙ্গ নামকীর্ত্তন ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তি শ্রদ্ধায়ে সেবন॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় পাঁচের অল্পসঙ্গ॥

মহাপ্রভু প্রথমে চৌষট্টি অঙ্গসাধন বলিয়া তাহার পর পঞ্চ অঙ্গসাধন বলিলেন। এই পঞ্চ অঙ্গসাধন বলিয়াও তিনি তৃপ্ত হইলেন না।

এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈতে উপজায় প্রেমের তরঙ্গ॥
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।
অম্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন॥

কিন্তু মহাপ্রভুর মন রাগানুগা ভক্তিতেই আবিষ্ট। কেবল লোক-সংগ্রহের জন্য এবং সকল অধিকারীর উপযোগের জন্য বৈধীভক্তির উল্লেখ।

বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥

অজ্ঞানেও হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না করে প্রায়শ্চিত্ত ॥

চৈ, চ, মধ্য, ২২

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥

ভা, পু, ১১-৫-১৮।

যদি কোন প্রিয়ভক্ত অনন্যভাব হইয়া হরির চরণ ভজনা করে, সে প্রমাদবশতঃ কোন নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলেও, হরি তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া সকল পাপ দূর করিয়া দেন।

শ্রীরূপের শিক্ষা।

রাগানুগা ভক্তির বিশেষ তত্ত্ব জানিবার জন্য রূপগোস্বামীর শিক্ষা, সনাতন গোস্বামীর শিক্ষা ও রামানন্দ রায়ের সহিত কথোপকথন, এই তিনটি বিষয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিতে হয়।

এইরূপে দশদিন প্রয়াগে রহিয়া।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া॥
শুদ্ধ ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন;
অতএব শুদ্ধ ভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥

শুদ্ধ ভক্তিতে, স্বধর্ম্ম নাই, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই। এই জন্য এই ভক্তির নাম শুদ্ধ ভক্তি। এই ভক্তি অনুরাগাত্মক। অনুরাগ গাঢ় হইয়া ক্রমে প্রেমরূপ স্থায়িভাবে পর্য্যবসিত হয়।

অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম। / R
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন॥

'অন্যবাঞ্ছা'—এক কৃষ্ণ ভিন্ন অন্যবাঞ্ছা একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। অনন্যমনা হইয়া কৃষ্ণকে ভজনা করিতে হইবে।

"অন্যপূজা" – কেবল মাত্র কৃষ্ণেরই পূজা করিতে হইবে। অন্য দেব-দেবীর যথেষ্ট সম্মান করিবে। কিন্তু মনে মনে এই ভাবিবে যে, সকল দেবদেবীই কৃষ্ণের অন্তর্গত। এক কৃষ্ণকে পূজা করিলেই, সকল দেব-দেবীর পূজা করা হইল। যদি অন্য কোন দেবদেবীর পূজা দেখা যায়, তবে মনে ভাবিতে হইবে যে, সেই দেব-দেবীর দ্বারে কৃষ্ণেরই পূজা হইতেছে।

"ছাড়ি জ্ঞান-কর্ম্ম"। কৃষ্ণবিমুখ জ্ঞান,—যেমন মায়াবাদ—কৃষ্ণে ঐকান্তিক ভক্তির বিরোধী। সহস্র সহস্র জ্ঞানীর মধ্যে কদাচিৎ কেহ কৃষ্ণভক্ত হয়। প্রথমে জ্ঞানের অধিকার জন্মে, তাহার পর কৃষ্ণভক্তির অধিকার। যতদিন পর্য্যন্ত ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তি হৃদয়ে স্থান না পায়, ততদিন পর্য্যন্ত জ্ঞাননিষ্ঠা থাকিতে পারে। হৃদয় কৃষ্ণভক্তিতে সরস হইলে, শুদ্ধ জ্ঞান স্বতঃ তিরোহিত হয়। শুদ্ধ ভক্তির পথে পথিক হইতে হইলে, জ্ঞানমার্গ ছাড়িয়া দিতে হয়।

সেই রূপ 'কর্ম্ম'। কৃষ্ণনাম গ্রহণই সকল কর্ম্মের সার। কর্ম্মের ফল দুরিত-ক্ষয় ও মনের নির্ম্মলতা। একান্ত ভক্তিতে কৃষ্ণনাম করিলেও এই ফল লাভ হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ভেদমূলক। সেই ভেদের পঙ্কিল সলিলে মন বিক্ষিপ্ত ও মলিন হইতে পারে। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মও কিয়ৎকালের জন্য মনকে কৃষ্ণচিন্তা হইতে বিরত রাখে। কিন্তু যতদিন জীব একেবারে অন্তর্মুখ হইতে না পারে, ততদিন তাহাকে কর্ম্ম করিতে হয়। সে কর্ম্ম কৃষ্ণের কর্ম্ম, কৃষ্ণের সেবা—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পরিচর্য্যা, অর্চ্চন, বন্দন ও দাস্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সর্ব্বঘটে কৃষ্ণকে দেখা এবং সকল জীবকে কৃষ্ণের অংশ বলিয়া আদর ও সৎকার করা দাস্যের প্রধান অঙ্গ।

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহু মানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥ ভা, পু, ৩-২৯-৩৪

সকল প্রাণীকেই মনে মনে প্রণাম ও সম্মান করিবে। ভগবান্ জীবরূপ অংশদ্বারা সকল ঘটেই প্রবিষ্ট আছেন। যজ্ঞের জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম করা অপেক্ষা এই দাস্য শতগুণ শ্রেষ্ঠ। যজ্ঞে পরস্পর ভাবনা আছে। দাস্যে কেবল ভগবদ্ভাবনা। যতদিন পর্য্যন্ত গোপভাব ও গোপীভাব না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সকল ভক্তেরই বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ ভাব থাকে। কি

অন্তরঙ্গ, কি বহিরঙ্গ, সকল ভাবেই, ভক্তের ভগবৎসেবা বা দাস্য অবশ্য কর্ত্তব্য। বহিরঙ্গ ভাবে জীবে দয়া, মান ও সৎকারই দাস্যের প্রধান অঙ্গ।

"আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন"—জ্ঞানমার্গে ও ঐশ্বর্য্যমার্গে ইন্দ্রিয়ের দমনই একমাত্র প্রয়োজন; কিন্তু পরম পুরুষার্থের জন্য ইন্দ্রিয়ের উপযোগিতা নাই। রাগমার্গে ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ প্রয়োজন। বাহ্যবিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ রূপে বিরত হওয়া চাই। কিন্তু সেই ইন্দ্রিয় অনুরাগভরে কৃষ্ণের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ গ্রহণ করিবে। চৈতন্যদেবের নিম্নলিখিত বিলাপ-বাক্য 'আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলনের' উদাহরণ।

কৃষ্ণ রূপ, শব্দ, স্পর্শ সৌরভ্য অধর-রস
যার মাধুর্য্য কহন না যায়।
দেখি লোভে পঞ্চজন এক অশ্ব মোর মন
চড়ি পঞ্চ পাঁচদিকে ধায়॥
সখিহে শুন মোর দুঃখের কারণ।
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ মহালম্পট দস্যুগণ
সবে কহে 'হর পরধন'॥ ধ্রু॥
এক অশ্ব এক ক্ষণে পাঁচ পাঁচ দিকে টানে
এক মন কোন্ দিকে যায়॥
ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ ইহা সবার কাঁহা দোষ
কৃষ্ণ-রূপাদি মহা আকর্ষণ।
রূপাদি পাঁচ পাঁচ টানে গেল ঘোড়ার পরাণে
মোর দেহে না রহে জীবন॥
কৃষ্ণরূপামৃত সিন্ধু তাহার তরঙ্গ কন্দু
এক বিন্দু জগৎ ডুবায়।

ত্রিজগতে যত নারী তার চিত্ত উচ্চগিরি
তাহা ডুবায় আগে উঠি ধায়॥
কৃষ্ণের বচনমাধুরী নানারস নর্ম্মধারী
তার অন্যায় কহনে না যায়।
জগতের নারীর কাণে মাধুরী-গুণে বান্ধি টানে
টানাটানি কাণের প্রাণ যায়॥
কৃষ্ণ অঙ্গ সুশীতল কি কহিব তার বল
ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন।
সশৈল নারীর বক্ষ তাহা আকর্ষিতে দক্ষ
আকর্ষয়ে নারীগণ মন॥
কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভ্যভর মৃগমদ মনোহর
নীলোৎপলের হরে গর্ব্বধন।
জগত নারীর নাসা তার ভিতর পাতে বাসা
নারীগণের করে আকর্ষণ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত তাতে কর্পূর মন্দস্মিত
স্বমাধুর্য্যে হরে নারী মন।
অন্যত্র ছাড়ায় লোভ না পাইলে মনে ক্ষোভ
ব্রজনারীগণের মূলধন॥
এত কহি গৌরহরি দুইজনার কণ্ঠে ধরি
কহে—'শুন স্বরূপ রামরায়।
কাঁহা কর কাঁহা যাও কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাও
দোঁহে মোরে কহ সে উপায়॥' চৈ, চ, অন্ত্য ১৫

রাগমার্গে ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণকে লাভ করিতে পারা যায়, এইজন্য কৃষ্ণকে "গোবিন্দ" বলে। সেই কৃষ্ণ, মধুর কৃষ্ণ। ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই

মধুর কৃষ্ণকে লাভ করিতে পারা যায়, এইজন্য তাঁহার লোককে "গোলোক" বলে। সেই লোকে তাঁহার সখা ও সখীগণ "গোপ" ও "গোপী"।

পৃথিবীতে এই অধিকার স্থাপন করিবার জন্য, কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন-ধারণের পর ইন্দ্রিয় সকলের রাজত্ব ইন্দ্রের হস্ত হইতে নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কেবলমাত্র বৃন্দাবন-লীলার জন্য।

গোমাতা সুরভি বলিলেন,—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব!
ভবতা লোকনাথেন সনাথা বয়মচ্যুত॥
ত্বং নঃ পরমকং দৈবং ত্বং ন ইন্দ্রো জগৎপতে!
ভবায় ভব গোবিপ্রদেবানাং যে চ সাধবঃ॥
ইন্দ্রং ন স্ত্বাভিষেক্ষ্যামো ব্রহ্মণা নোদিতা বয়ম্।
অবতীর্ণোঽসি বিশ্বাত্মন্ ভূমের্ভারাপনুত্তয়ে॥

ভা, পু, ১০-২৭

"আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন"—সেই জন্য রাগানুগা ভক্তির প্রধান উপকরণ।

এই শুদ্ধ ভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

"অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম, আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন"—ইহাকেই শুদ্ধ ভক্তি বলে।

ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥
সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তাতে প্রেমনাম কয়॥

ভক্তভেদ রতিভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর ॥
বাৎসল্যরতি মধুররতি পঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদ কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চভেদ ॥
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম।
কৃষ্ণভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥
শান্তভক্ত নবযোগেন্দ্র সনকাদি আর।
দাস্যভক্ত সর্ব্বত্র সেবক অপার ॥
সখ্যভক্ত শ্রীদামাদি পুরে ভীমার্জ্জুন।
বাৎসল্য ভক্ত মাতা পিতা যত গুরুজন ॥
প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় ॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড়খণ্ড সার।
শর্করা সিতা মিশ্রি উত্তম মিশ্রি আর ॥
মধুর রস ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন ॥
পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় দুইত প্রকার।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-মিশ্রা কেবলা ভেদ আর ॥
গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন।
পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্য প্রবীণ ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রাধান্যে সঙ্কোচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি ॥
শান্তদাস্য রসে ঐশ্বর্য্য কাহা উদ্দীপন।
বাৎসল্যে সখ্যে মধুররসে সঙ্কোচন ॥

শান্ত ও দাস্যরস ঐশ্বর্য্য দ্বারা কখনও কখনও পরিপুষ্ট হয়। দাস ঈশ্বরকে বড় জানিলে সন্তুষ্ট হয়, এবং ঈশ্বরের মহিমা জ্ঞানে শান্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু পিতা, মাতা, সখা ও প্রেয়সীর ভাব ঈশ্বরজ্ঞানে সঙ্কুচিত হয়।

বসুদেব দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে দোঁহার মনে ভয় হৈল॥
কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি অর্জ্জুনের হৈল ভয়।
সখাভাবে ধার্ষ্ট্য ক্ষমায় করিয়া বিনয়॥
কৃষ্ণ যদি রুক্মিণী করিল পরিহাস।
কৃষ্ণ ছাড়িবেন জানি রুক্মিণীর হৈল ত্রাস॥
কেবলার শুদ্ধ প্রেম ঐশ্বর্য্য না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে॥
শান্তিরসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা।
শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীমুখগাথা॥
"শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয় সংযমঃ।"
কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ তার কার্য্য মানি।
অতএব শান্ত কৃষ্ণভক্ত এক জানি॥
শান্তরসে স্বরূপ বুদ্ধি বা স্বরূপ জ্ঞান হয়।
আত্মজ্ঞানেই শান্ত যোগী স্থিতপ্রজ্ঞ হয়॥

তাঁহার ঈশ্বরজ্ঞানে নিষ্ঠা থাকে না এবং ঈশ্বরে মমতা ভাব হয় না। তবে তিনি সকাম হইয়া কর্ম্ম করেন না, এবং আত্মরূপী কৃষ্ণবিনা সকল তৃষ্ণা ত্যাগ করেন। এই তাঁহার কৃষ্ণনিষ্ঠা।

স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে।
কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুই গুণে॥

এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্ত জনে।
আকাশের শব্দ গুণ যেন ভূতগণে॥

যে রসেই ভক্ত কৃষ্ণে রতি করুক না কেন, কৃষ্ণনিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগ সকল ভক্তেরই সাধারণ গুণ।

শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা গন্ধহীন।
পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥
কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্তরসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুর জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥
ঈশ্বর জ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন।
অতএব দাস্যরসের এই দুই গুণ॥

অর্থাৎ দাস্যরসে শান্তের গুণ (কৃষ্ণনিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগ) আছে এবং অধিকন্তু সেবনও আছে।

শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়।
দাস্যের সম্ভ্রম গৌরব সেবা—সখ্য বিশ্বাসময়॥
কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ।
কৃষ্ণসেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥
বিশ্রম্ভ প্রধান সখ্য গৌরবসম্ভ্রমহীন।
অতএব সখ্যরসের তিনগুণ চিহ্ন॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্॥

সখ্যরসে কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ, অসম্ভ্রম, বিশ্বাসময় সেবন। অধিকন্তু কৃষ্ণে মমতা ও আত্মসম জ্ঞান।

বাৎসল্যে শান্তের গুণ দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব সার।
মমতাধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার॥
আপনাকে পালক জ্ঞানে কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥
মধুররসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুররসের হয় পঞ্চগুণ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এইমত মধুরে সব ভাব সমাহার।
অতএব আস্বাদ-আধিক্যে করে চমৎকার॥
এই ভক্তিরসের করিল দিগ্ দরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞে পায় রসসিন্ধু পারে॥
এত বলি প্রভু তারে করিল আলিঙ্গন।
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হৈল মন॥ চৈ, চ, মধ্য, ১৯।

এইরূপে মহাপ্রভু রূপ-গোস্বামীর নিকট রাগমার্গের সূত্র সকল বর্ণনা করিলেন। রূপ উজ্জ্বল-নীলমণি-রসে ও ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে এই সূত্রের বিস্তার করিলেন। যাঁহার হৃদয়ে অনুরাগ স্থান পাইবে, তিনি ঐ দুই গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

সনাতনের শিক্ষা।

মহাপ্রভু সনাতনকে সকল তত্ত্বেরই শিক্ষা দিয়াছিলেন। রাগানুগা ভক্তি সম্বন্ধে তিনি যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমরা কেবল তাহারই সমালোচনা করিব।

রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন।
রাগানুগা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী-জনে।
তার অনুগত ভক্তের রাগানুগা নামে॥
ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ-কথন॥

ভক্তের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ দুইভাব থাকে। যখন সংসারের মধ্যে থাকিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা যায়, এবং ভক্তি প্রচারের জন্য বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখা যায়, এবং জীব-সেবা দ্বারা ভগবানের সেবা করা যায়, তখন ভক্তের বহিরঙ্গ বা বাহ্য ভাব। আর যখন ভক্ত বাহ্য ভুলিয়া মনে মনে কৃষ্ণের সঙ্গম-সুখ লাভ করেন, তখন তাঁহার অন্তরঙ্গ ভাব। বাহ্যভাবেও ভক্ত কৃষ্ণে আবিষ্ট-চিত্ত থাকিবেন। অন্তরঙ্গ ভাবে ভক্তের কৃষ্ণ সম্বন্ধে গাঢ় তৃষ্ণা ও অনুরাগ ভিন্ন আর কিছুই থাকে না।

রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্।
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুমতি।
শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥

অসংখ্য সনাতনধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে, কত লোক জ্ঞানী, কত লোক কর্ম্মী,

কত লোক ভক্ত। আবার অসংখ্য ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে, কেহ কেহ প্রকৃতপক্ষে রাগমার্গাবলম্বী। কেবল রাধাকৃষ্ণের পূজা করিলেই বা যুগলমন্ত্র গ্রহণ করিলেই রাগানুগ ভক্ত হয় না। যাঁহারা যথার্থ রাগানুগ, মধুর কৃষ্ণ তাঁহাদের উপর লক্ষ্য রাখেন। গোপ ও গোপীর অনুগত হইয়া কোন না কোন কালে তাঁহারা মধুর কৃষ্ণের সঙ্গলাভ করিতে পারিবেন।

বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্যে সাধকদেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥

এই হইল বহিরঙ্গ ভাবের সাধন।

মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥

এই হইল অন্তরঙ্গ সাধন। অন্তরঙ্গ সাধনে সিদ্ধদেহ ভাবনা করিতে হইবে। আমাদের যে স্থূলদেহে কামের উদ্দীপনা হয়, যে দেহে ইন্দ্রিয় সকল বাহ্যস্পর্শে কলুষিত হয়, যে দেহে নিত্য কপটতা ও কপট সম্বন্ধের সঙ্গম লাভ হয়, সে দেহে প্রেমময় কৃষ্ণভাবনা হইতে পারে না। তুমি যথার্থ সিদ্ধ হও বা না হও, অন্তরঙ্গ ভাব যখন মধুর কৃষ্ণকে লইয়া খেলা, তখন তুমি কল্পনা করিয়াও কামবর্জ্জিত সিদ্ধ দেহ ধারণ করিবে। কেবল গোপ ও গোপীভাব লইয়াই সিদ্ধ দেহ ধারণ করা যায়।

মহাপ্রভু রঘুনাথ দাসকেও সংক্ষেপে বাহ্য ও আন্তরিক সাধনের কথা বলিয়াছিলেন।

"গ্রাম্য কথা না কহিবে গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী-মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥

এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাবে সবিশেষ॥"
সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাব-লিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেত লাগিয়া।
নিরন্তর মনে করে অন্তর্মনা হঞা॥
এই মত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজয়ে প্রীতি॥
প্রেমাঙ্কুরে রতিভাব হয় দুই নাম।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেমের সাধন॥
শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশু সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্য-কৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

'ভাব' একরূপ শুদ্ধ সত্ত্ববিশেষ, প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণ তুল্য। কৃষ্ণে রুচি ও আসক্তি জন্মাইয়া, এই ভাব চিত্তের মসৃণতা উৎপাদন করে।

এই দুই ভাবের স্বরূপ-তটস্থ লক্ষণ।
প্রেমের লক্ষণ এবে শুন সনাতন॥
সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

যাহাতে মন সম্যক্ রূপে মসৃণিত হয়, যে ভাবে কৃষ্ণে অতিশয় মমতা জন্মে, ঘনীভূত সেই ভাবকে পণ্ডিতেরা 'প্রেমা' বলিয়া থাকেন। রূপের

শিক্ষাতে প্রেমের এইরূপ ক্রম পাইয়াছি—স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব।

সনাতনের শিক্ষায় রতি ও ভাব প্রেমের এই সকল অবান্তর ভাব হইতে ভিন্ন ও প্রেমের পূর্ব্বসূচি।

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধন ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন ॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যের রুচি উপজয় ॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর ॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম ॥
এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয় ॥
কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।
ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায় ॥
সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান।
নাম গানে সদা রুচি লয়ে কৃষ্ণনাম ॥
কৃষ্ণগুণাখ্যানে করে সর্ব্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণলীলা স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি ॥
কৃষ্ণের রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ।
কৃষ্ণ প্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন ॥

যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম করয়ে উদয়।
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥
প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥

যখন কৃষ্ণচরণে প্রীতি জন্মে, তখন সেই প্রীতি রতি ও ভাবে পরিণত হয়। অঙ্কুরে এই ভাব রতির নামান্তরমাত্র।

রতি গাঢ় হইলে প্রেমের উৎপত্তি হয়। এই প্রেম একটি মাধুর্য্যময়, উন্মাদক, আত্মবিস্মারক, কৃষ্ণে গাঢ় লালসাময় দেবভাব। প্রথমে সহজ প্রেম। তাহার পর উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত প্রেমের গাঢ়তর ও গাঢ়তম সাত ভাব ;—১ স্নেহ, ২ মান, ৩ প্রণয়, ৪ রাগ, ৫ অনুরাগ, ৬ ভাব, ৭ মহাভাব।

শান্তরসে শান্তিরতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়।
দাস্যরতি রাগ পর্য্যন্ত ক্রমেতে বাঢ়য়॥

শান্তরসে কেবলমাত্র সহজ প্রেম হয়। দাস্যরসে, স্নেহ, মান, প্রণয় ও রাগ পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে।

সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগ সীমা।
সুবলাদ্যের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা॥

সাধারণতঃ সখ্যরসে ও বাৎসল্যরসে প্রেম "অনুরাগের" সীমা পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। কিন্তু সুবলাদি সখার প্রেম "ভাব" পর্য্যন্ত পরিণত হইতে পারে।

রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে।
মহিষীগণের রূঢ়, অধিরূঢ় গোপিকা নিকরে॥

মহিষীগণের রূঢ়ভাব, গোপীগণের অধিরূঢ় ভাব।

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী॥

চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলার দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে এইরূপ সনাতনের শিক্ষা বর্ণিত হইয়াছে। আমি অনেক অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি।

প্রেমের শাস্ত্র শ্রীচৈতন্যের শিক্ষামত সম্পূর্ণ আলোচনা করিতে হইলে একটি বৃহৎ পুস্তক লিখিতে হয়। আমি কেবল সেই শাস্ত্রের দিগ্‌দর্শন করিতেছি মাত্র। প্রেমের সম্পূর্ণ আলোচনায় আমার অধিকার জন্মে নাই। একমাত্র ভগবৎকৃপা ভিন্ন সে অধিকার জন্মিতে পারে না।

সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসান আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার॥
কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥
হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥ চৈ, চ, আদি ৪।

প্রেম ভগবানের নিজশক্তির পূর্ণ বিকাশ। সেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা

মহাভাব। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রেমের এই মহাভাব দেখাইয়াছিলেন। এই জন্যই স্বরূপগোস্বামী তাঁহাকে "রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ-স্বরূপং" বলিয়া নমস্কার করিয়াছেন।

সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর শিক্ষাবলে পাণ্ডিত্য ও যুক্তি আশ্রয় করিয়া প্রেমের প্রাধান্য দেখাইয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, ব্রহ্মবাদী-দিগের মুক্তি তুচ্ছ। তাহা হইতে ভক্তের মুক্তি অধিকতর বিচিত্র। কিন্তু প্রেম এই দুই প্রকার মুক্তি হইতে কোটি গুণ অধিক।

তিনি দেখাইয়াছেন, ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু সকল ইন্দ্রিয় মনের অন্তর্ভূত। বাহ্যদৃষ্টিতে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। অন্তর্দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়াই ভক্তের উদ্দেশ্য থাকিবে।

সমাধৎস্ব মনঃ স্বীয়ং ততো দ্রক্ষ্যসি তং স্বতঃ।
সর্ব্বত্র বহিরন্তশ্চ সদা সাক্ষাদির স্থিতম্॥

বৃহদ্ভাগবতামৃত, ২-২-৮৭।

নিজের মন সমাহিত কর। তাহা হইলে সেই সর্ব্বব্যাপক ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ অবস্থিত বলিয়া দেখিতে পাইবে।

পরমাত্মা বাসুদেবঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
নিতান্তং শোধিতে চিত্তে স্ফুরত্যেব ন চান্যতঃ। ২-২-৮৮।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমাত্মা বাসুদেব নিতান্ত শোধিত-চিত্তেই প্রকশিত হন। বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না। যদি বল চিত্তদ্বারা গ্রহণকে ধ্যান বলা যায়, দর্শন বলা যায় না, কারণ চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণকেই দর্শন বলে; তাহার উত্তর এই যে, মন দ্বারাই চক্ষুর কার্য্য হয়।

তদানীঞ্চ মনোবৃত্ত্যান্তরাভাবাৎ সুসিদ্ধ্যতি।
চেতসা খলু যৎ সাক্ষাচ্চক্ষুষাদর্শনং হরেঃ॥ ২-২-৮৯।

ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি সময়ে মনে অন্য বৃত্তি থাকে না। ভগবানের মূর্ত্তিতে যখন মন অভিনিবিষ্ট থাকে, তখন এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি মন দ্বারাই ভগবান্‌কে দেখিতেছি, চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি না। এই জন্য চক্ষুর কায মনের দ্বারাই সিদ্ধ হয়।

মনঃসুখেঽন্তর্ভবতি সর্ব্বেন্দ্রিয়সুখং স্বতঃ।
তদ্বৃত্তিষ্বপি বাক্‌চক্ষুঃ শ্রুত্যাদীন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ॥ ২-২-৯০।

সকল ইন্দ্রিয়ের সুখ মনের সুখেই অন্তর্ভূত। সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিও সেইরূপ মনের বৃত্তি মধ্যে অবস্থিত হয়। মন দ্বারাই শ্রবণ কীর্ত্তন দর্শনাদি সিদ্ধ হয়।

মনোবৃত্তিং বিনা সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং বৃত্তয়োঽফলাঃ।
কৃতাপীহাঽকৃতৈব স্যাদাত্মন্যনুপলব্ধিতঃ॥ ২-২-৯১।

মনোবৃত্তির সহিত সংলগ্ন হইলেই চক্ষুরাদির রূপাদি গ্রহণ আত্মার উপলব্ধি হয়। নতুবা চক্ষুরাদির কার্য্য নিষ্ফল হয়।

এখন মোক্ষ কাহাকে বলে?

সোঽশেষদুঃখধ্বংসো বাঽবিদ্যা কর্ম্মক্ষয়োঽথবা।
মায়াকৃতান্যথারূপ-ত্যাগাৎ স্বানুভবোঽপি বা॥

বৃহদ্ভাগবতামৃত ২-২-১৭৫।

অশেষ দুঃখের নাশকে মোক্ষ বলে। কিংবা অবিদ্যাকৃত কর্ম্মক্ষয়কে মোক্ষ বলে। কিংবা মায়াকৃত দেহাদি অন্যথা রূপ ত্যাগ করিয়া স্বরূপ বা আত্মার অনুভবকে মোক্ষ বলে। মোক্ষের দুই অংশ—নাশাত্মক অভাব ও অনুভবাত্মক ভাব। অনুভবেই আনন্দ। কিন্তু সে আনন্দ ভগবানের সাক্ষাৎকার হইতে যে আনন্দ লাভ করা যায়, তাহা হইতে অতি তুচ্ছ।

জীবস্বরূপভূতস্য সচ্চিদানন্দবস্তুনঃ।
সাক্ষাদনুভবেনাপি স্যাত্তাদৃক্ সুখমল্পকম্॥ ২-১-১৭৬

সচ্চিদানন্দ জগদীশ্বর অংশরূপে জীবের স্বরূপ ধারণ করেন। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" সেই অংশীভূত স্বরূপের অনুভব সাক্ষাৎ হইলেও তাহা দ্বারা যে সুখ লাভ হয়, তাহা অতি অল্পমাত্র।

শুদ্ধাত্মতত্ত্বং যদ্বস্তু তদেব ব্রহ্ম কথ্যতে।

নির্গুণং তচ্চ নিঃসঙ্গং নির্ব্বিকারং নিরীহিতম্॥ ২-২-১৭৭

যদি বল জ্ঞানীর কেবল স্বরূপানন্দ হয় না, জ্ঞানী ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন। সে ব্রহ্মানন্দই বা কি? জীবপ্রকৃতি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন শুদ্ধ আত্মতত্ত্বকেই ব্রহ্ম বলে। সে ব্রহ্ম নির্গুণ, নিঃসঙ্গ, নির্ব্বিকার ও নিরীহিত। সুতরাং ব্রহ্মানুভব দ্বারা যে আনন্দ লাভ হয়, তাহাও তদ্রূপ।

ভগবাংস্তু পরব্রহ্ম পরাত্মা পরমেশ্বরঃ।

সুসান্দ্র-সচ্চিদানন্দবিগ্রহো মহিমার্ণবঃ॥ ২-২-১৭৮

যিনি ভগবান্, তিনি পরব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পরমেশ্বর। তিনি অত্যন্ত ঘনীভূত সচ্চিদানন্দ রূপ। তাঁহার মহিমার সীমা নাই।

সগুণত্বাগুণত্বাদি বিরোধাঃ প্রবিশন্তি তম্।

মহাবিভূতি র্ব্রহ্মাস্য প্রসিদ্ধেত্থং তয়োর্ভিদা॥ ২-২-১৭৯

সগুণত্ব অগুণত্বাদি সকল বিরোধ সেই ভগবানে প্রবেশ করে। ব্রহ্মরূপ ও জীবতত্ত্বরূপ তাঁহার মহাবিভূতি।

অতঃ সান্দ্রসুখং তস্য শ্রীমৎপাদাম্বুজদ্বয়ম্।

ভক্ত্যানুভবতা সান্দ্রং সুখং সম্পদ্যতে ধ্রুবম্॥ ২-২-১৮০

ভগবানের চরণ-পদ্ম ঘন আনন্দ স্বরূপ। যেমন ঘনমণ্ডল সূর্য্যে সকল কিরণ ঘনীভূত হয়, সেইরূপ ভগবচ্চরণারবিন্দে সকল আনন্দ ঘনীভূত হয়। ভক্তিমার্গে আনন্দ অনুভব করিলে, সেই ঘন আনন্দ লাভ হয়।

সুখরূপং সুখাধারঃ শর্করাপিণ্ডবন্মতম্।

শ্রীকৃষ্ণচরণদ্বন্দ্বং সুখং ব্রহ্ম তু কেবলম্॥ ২-২-১৮১

শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল কেবল যে আনন্দরূপ, তাহা নহে। শর্করা পিণ্ডবৎ ঐ চরণযুগল আনন্দের রূপ ও আনন্দের আধার। ব্রহ্ম কেবল আনন্দমাত্র, আনন্দের আধার নহেন। ভগবান্ সমুদ্রকোটিগম্ভীর, পরমাশ্চর্য্য মহিমাবান্। ভেদ ও অভেদ রূপ বিচিত্র বিরোধ-প্রবাহ ঐ ভগবানে প্রবেশ করিতেছে। তিনি সকলেরই আধার ও বিচিত্র আনন্দময়।

জীবস্বরূপং যদ্বস্তু পরংব্রহ্ম তদেব চেৎ।
তদেব সচ্চিদানন্দঘনং শ্রীভগবাংশ্চ তৎ॥ ২-২-১৮২

যে বস্তু জীবস্বরূপ, তাহাই যদি পরব্রহ্ম হয়, এবং জীব যদি সচ্চিদানন্দ-ঘন হয়, এবং জীবস্বরূপও যদি ভগবান্ হয়—

তথাপি জীব-তত্ত্বানি তস্যাংশা এব সম্মতাঃ।
ঘনতেজঃসমূহস্য তেজোজালং যথা রবেঃ॥ ২-২-১৮২

তথাপি জীবতত্ত্ব ব্রহ্মের অংশ। এই তত্ত্বই সাধুসম্মত। যেমন ঘন-তেজো-মণ্ডল সূর্য্যের কিরণজাল, সেইরূপ ঘনতেজ ব্রহ্মের কিরণজাত জীব।

একদেশস্থিতস্যাগ্নে র্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥—পরাশর।
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।—ভগবদ্গীতা।
যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড-কোটি
কোটিষ্বশেষ বসুধাদি বিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্মনিষ্কল মনন্ত মশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥—ব্রহ্মসংহিতা।
নিত্যসিদ্ধাস্ততো জীবা ভিন্না এব যথা রবেঃ।
অংশবো বিস্ফুলিঙ্গাশ্চ বহ্নে র্ভঙ্গাশ্চ বারিধেঃ॥—২-২-১৮৪

মায়ার অপগম হইলে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ হয়, এরূপ বলা সঙ্গত

নহে। কারণ তত্ত্ববাদিগণের মত অনুসারে, জীব পরব্রহ্মের নিত্য অংশ-রূপে সিদ্ধ। সে অংশ মায়ার ভ্রম নহে। এই জন্য রবির কিরণের ন্যায়, অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়, সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায়, জীব ব্রহ্ম পদার্থ হইতে নিত্য ভিন্ন।

অনাদিসিদ্ধয়া শক্ত্যা চিদ্বিলাস স্বরূপয়া।
মহাযোগাখ্যয়া তস্য সদা তে ভেদিতাস্ততঃ ॥ ২-২-১৮৫

পরব্রহ্মরূপ ভগবানের অনাদি এক শক্তি আছে। সেই শক্তি চিদ্বিলাস-স্বরূপ। সেই শক্তির নাম মহাযোগ, যোগমায়া। সেই শক্তি দ্বারা জীব পরব্রহ্ম হইতে নিত্য অংশরূপে বিভেদিত হয়

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।—ভগবদ্গীতা।

অতস্তস্মাদভিন্নাস্তে ভিন্না অপি সতাং মতাঃ।
মুক্তৌ সত্যামপি প্রায়োভেদস্তিষ্ঠেদতো হি সঃ ॥—২-২-১৮৬

এই জন্য জীব পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। 'সচ্চিদানন্দত্বাদি ব্রহ্মসাধর্ম্ম্যবত্বাৎ।' সচ্চিদানন্দত্বাদি ব্রহ্মেও আছে, জীবেও আছে। জীবে পরিচ্ছিন্ন, ব্রহ্মে অপরিচ্ছিন্ন। অংশত্ব দ্বারা এই পরিচ্ছেদ ও ভেদ। মুক্তিলাভ করিলেও প্রায় ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদ থাকিয়া যায়।

এই শ্লোকের উপর স্বয়ং সনাতন গোস্বামী এইরূপ টীকা করিয়াছেন।

"ভগবৎপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেন,—'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং বিরাজন্তি।' মুক্ত পুরুষও লীলা দ্বারা ভগবৎ-শরীর রচনা করিয়া বিরাজ করেন। 'মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে।' কোটি কোটি সিদ্ধ ও মুক্ত পুরুষের মধ্যে কেহ কেহ নারায়ণ-পরায়ণ হয়। মুক্ত পুরুষের পরব্রহ্ম হইতে ভেদ থাকিলেই, মহাপুরাণাদির এই সকল বচন সঙ্গত হয়। যদি মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মে লীন হন, তাহা হইলে লীলায় বিগ্রহরচনা কিরূপে সম্ভব

হয়? আর কেই বা মুক্তির পর নারায়ণ-পরায়ণ হইতে পারে? কিছু না কিছু মুক্ত পুরুষের পৃথক সত্তা থাকিয়া যায়। যদি বল ঐ সকল উক্তি জীবন্মুক্ত পুরুষের জন্য। তাহা অসম্ভব। কারণ জীবন্মুক্ত পুরুষের ত শরীর থাকে। সে আবার শরীর-রচনা কি করিবে? আবার পুরাণ-বচনে সিদ্ধ ও মুক্ত পুরুষ দু'য়ের উল্লেখ আছে। জীবন্মুক্তই সিদ্ধ পুরুষ। পাদ্ম-কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে কথিত আছে যে, নৃদেহধারী মহামুনি ভগবানে লীন হইলেও পুনরায় নারায়ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৃহন্নারসিংহপুরাণে নরসিংহ-চতুর্দ্দশী ব্রত প্রসঙ্গে কথিত আছে, বেশ্যা সহিত ব্রাহ্মণ ভগবানে লীন হইয়াও পুনরায় ভার্য্যার সহিত প্রহ্লাদরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এইরূপ অনেক উপাখ্যান ও প্রমাণ আছে। 'প্রায়' ভেদ থাকে। কারণ কদাচিৎ ভগবৎ-ইচ্ছায় সাযুজ্যাখ্য নির্ব্বাণও হইতে পারে।"

সচ্চিদানন্দরূপাণাং জীবানাং কৃষ্ণমায়য়া।
অনাদ্যবিদ্যয়া তত্ত্ব বিস্মৃত্যা সংসৃতি র্ভ্রমঃ॥ ২-২-১৮৭

সচ্চিদানন্দরূপ জীব-সকলের কৃষ্ণমায়ায় অনাদি অবিদ্যা কর্ত্তৃক তত্ত্ব-বিস্মৃতি হয় এবং জীব সকল দেহাদিকে আপনার ও 'আমি' মনে করিয়া সংসার-ভ্রমে পতিত হয়।

মুক্তৌ স্বতত্ত্বজ্ঞানেন মায়াপগমতোহি সঃ।
নিবর্ত্ততে ঘনানন্দ ব্রহ্মাংশানুভবো ভবেৎ॥ ২-২-১৮৮

মুক্তি হইলে জীব নিজতত্ত্ব জানিতে পারে, কারণ তখন মায়ার অপগম হয়। আর ঘনানন্দ ব্রহ্মের অংশের অনুভব হয়।

স্বসাধনানুরূপং হি ফলং সর্ব্বত্র সিদ্ধ্যতি।
অতঃ স্বরূপজ্ঞানেন সাধ্যো মোক্ষেহল্পকং ফলম্॥ ২-২-১৮৯

সকলেই আপন আপন সাধনা অনুসারে ফল লাভ করে। স্বরূপ-জ্ঞানে যে মোক্ষ লাভ করা যায়, তাহার ফল অল্পমাত্র।

সুখস্য তু পরাকাষ্ঠা ভক্তাবেব স্বতো ভবেৎ।

তন্ময় শ্রীপদাম্ভোজসেবিনাং সাধনোচিতা ॥ ২-২-১৯১

ভক্তিমার্গে মুক্তিলাভ করিলে সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করা যায়। কারণ, ভগবান্ ঘনানন্দ। তথন আর অংশের আনন্দ নহে। কিন্তু ভক্তিতেও সাধনোচিত আনন্দ। কোন ভক্তের মোক্ষ পরম পদার্থ, আর কোন ভক্তের কৃষ্ণচরণই পরম পদার্থ।

কৃষ্ণভক্ত্যৈব সাধুত্বং সাধনং পরমং হি সা।

তস্যা সাধ্যং তদঙ্ঘ্র্যব্জযুগলং পরমং ফলং ॥ ২-২-২০২

কৃষ্ণভক্তি দ্বারাই সাধুত্বলাভ হয়। কৃষ্ণভক্তিই পরম সাধন। কৃষ্ণভক্তি দ্বারা সাধ্য পরম ফল তাঁহার চরণ-পদ্মযুগল।

তদ্ভক্তিরসিকানাস্তু মহতাং তত্ত্ববেদিনাম্।

সাধ্যা তচ্চরণাম্ভোজ-মকরন্দাত্মিকৈব সা ॥ ২-২-২০৩।

ভক্তিরসিক, তত্ত্ববেদী, মহাত্মাগণ কৃষ্ণচরণ-পদ্মের মধুকেই পরম সাধ্য বলিয়া জানেন।

সা কর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যাপেক্ষকস্য ন সিধ্যতি।

পরং শ্রীকৃষ্ণকৃপয়া তন্মাত্রাপেক্ষকস্য হি ॥—২-২-২০৪

এই নিরপেক্ষ ভক্তি কর্ম্ম, জ্ঞান বা বৈরাগ্যের অপেক্ষা রাখে না। একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই পরম সম্বল।

কর্ম্মবিক্ষেপকং তস্যা বৈরাগ্যং রসশোষকম্।

জ্ঞানং হানিকরং তত্তৎ শোধিতং ত্বনুযাতি তাম্ ॥ ২-২-২০৫

কর্ম্ম এই কৃষ্ণভক্তির বিক্ষেপক, বৈরাগ্য রসশোষক, জ্ঞান সেই ভক্তির হানিকর। কিন্তু কর্ম্ম বৈরাগ্য ও জ্ঞান শোধিত হইলে কৃষ্ণভক্তির অনুগামী হয়। কর্ম্ম ফলত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎ-প্রীতির জন্য অর্পিত হইলে শোধিত হয়। সংসার তুচ্ছ, কিসে আমি এই সংসার হইতে মুক্ত হইব,

এই ভাবনায় বৈরাগ্য রস শুকাইয়া যায়। কিন্তু যখন মোক্ষে বিতৃষ্ণা জন্মে এবং ভগবৎসেবায় অনুরাগ হয়, তখন বৈরাগ্য শোধিত হয়। অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব-বোধের ত্যাগ, ভগবানের নিজজন বলিয়া আপনাকে মনে করা এবং ভগবদ্ভক্তি-মহিমার নির্দ্ধারণ দ্বারা জ্ঞান শোধিত হয়।

অবান্তরফলং ভক্তেরেব মোক্ষাদি যদ্যপি।

তথাপি নাত্মারামত্বং গ্রাহ্যং প্রেম-বিরোধি যৎ॥ ২-২-২০৯

যদিও ভক্তির অবান্তর ফল কখন কখন মোক্ষাদি হইতে পারে, তথাপি আত্মারামত্ব কখনও গ্রাহ্য নহে। কারণ আত্মারামত্ব প্রেমের বিরোধী।

সপ্রেমভক্তেঃ পরিপাকতঃ স্যাৎ কাচিন্মহাভাব-বিশেষ সম্পৎ।

সাবৈ নরীনর্ত্তি মহাপ্রহর্ষ সাম্রাজ্য-মূর্দ্ধোপরি তত্ত্বদৃষ্ট্যা॥ ২-৪-২২৯

এই প্রেমভক্তির পরিপাক দ্বারা ক্রমশঃ মহাভাবরূপ সম্পত্তিবিশেষ হয়। এই মহাভাবই মহানন্দ সাম্রাজ্যের মূর্দ্ধে নৃত্য করে।

মহাপণ্ডিত, পরম ভক্ত সনাতন গোস্বামী এইরূপে প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি যুক্তিদ্বারা, শাস্ত্রদ্বারা প্রেমকে মুক্তির শীর্ষ স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন, এবং অকৈতব কৃষ্ণভক্তির জ্ঞান কর্ম্ম, ও মোক্ষাপেক্ষী ভক্তির উপর প্রাধান্য নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে সফল করিয়াছেন।

রামানন্দের সহিত আলাপ।

সাধ্য সাধন লইয়াই জীবের উন্নতি-ক্রম। যাহা আজ চরম-সাধ্য, তাহা দুইদিন পরে সোপানে পরিগণিত হয়। যখন সোপানে আরোহণ করা যায়, তখন সোপান-শ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ স্থানই গম্যদেশ, লক্ষ্য ও সাধ্য। অরুন্ধতী-ন্যায় অনুসরণ করিয়া, সেই সাধ্য নিকটবর্ত্তী হইলেই তাহা সোপান বা সাধনে পরিণত হয়। সাধ্য আবার দূরবর্ত্তী হয়।

আজ স্ত্রী, পুত্র, পরিবার আমাদের নিজসুখের সাধন ও নিজের সুখই সাধ্য। সেই সুখসাধনের জন্য আমরা কত কত উদ্যম করি, এবং কত উৎসাহে উত্তেজিত হই। এই উৎসাহ ও উদ্যম থাকিয়া যায়; কিন্তু পরে নিজের সুখ আর লক্ষ্য না হইয়া জগতের সুখই লক্ষ্য হয়। সেই জগতের সুখ-সাধন জন্য নিজের এক নির্দ্দিষ্ট অধিকার থাকে। সেই অধিকার শাস্ত্রমতে স্বধর্ম্ম। এই স্বধর্ম্ম সাধ্য হইয়া জীবকে স্বার্থত্যাগে ব্রতী করে এবং অদম্য উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত জীব জগতের জন্য, যজ্ঞের জন্য আত্মসমর্পণ করে। তখন "যজ্ঞোবৈ বিষ্ণুঃ"—এই শ্রুতিবাক্য সার্থক করিবার জন্য, ভগবান্ সন্নিহিত হইয়া সাধ্যের স্থান অধিকার করেন। তখন আর জগতের জন্য নহে, যজ্ঞের জন্য নহে—ভগবানের জন্যই ভগবানে আত্ম-সমর্পণ ও সর্ব্বসমর্পণ করা হয়। ভগবান্‌ই জগৎ, ভগবান্‌ই যজ্ঞ। তখন আমরা যাহা করি, তাহাই ভগবানের কার্য্য। আমরা যাহা করি, তাহাই সৃষ্টি, স্থিতি কিংবা লয়। ভগবানের যখন যাহা কার্য্য, আমাদের তখন তাহাই কার্য্য। আজ ভগবান্ বিষ্ণু জগতের স্থিতি সাধন করিতেছেন; আমরাও তাঁহার দাস হইয়া সেই কার্য্যে সহকারী

হইব। কিন্তু এই দাসত্ব করিবার জন্য জ্ঞান চাই। অজ্ঞানী ভক্ত ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম করিবে, জীবের উপর অত্যাচার করিবে, কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া পরচিত্ত ব্যথিত করিবে, জীবের হিংসা করিবে এবং অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবে। এই জন্য জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির প্রয়োজন। তখন জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই সাধ্য।

যখন ব্রহ্মবিদ্যার উপলব্ধি হয়, শাস্ত্রজ্ঞান সহজ ও স্বাভাবিক হয় ও জ্ঞানের পিপাসা মিটিয়া যায়, তখন শুদ্ধাভক্তি আসিয়া ভক্তের হৃদয় অধিকার করে। ভক্ত তখন ভগবৎ-প্রেমে বিহ্বল হয়। স্বধর্ম্ম ও জ্ঞান তখন সেই প্রেমে ভাসিয়া যায়। ভাগবতের নির্গুণ অকৈতব ভক্তি, গোপীদিগের বিশুদ্ধ অনুরাগ আসিয়া তখন বিধির বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেয়। প্রেমের সেই অকূল পাথারে, রসের সেই মধুর তরঙ্গে, প্রেম-নটবর, রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য কাণ্ডারী হইয়া দণ্ডায়মান হন্। রামানন্দ সেই প্রেমে ভাসিতেছেন, আর চৈতন্যদেব কাণ্ডারী হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ভক্তের হৃদয়ে প্রেমের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া যুগান্ত-বিস্তীর্ণ মধুর সৌরভে জগৎ আমোদিত করিল। গোদাবরী পবিত্র হৃদয়ে সেই পবিত্র কাহিনী বহন করিয়া অকূল সমুদ্রে মিশাইয়া দিল।

"প্রভু স্নানকৃত্য করি আছেন বসিয়া।
এক ভৃত্য সঙ্গে রায় মিলিল আসিয়া॥
দণ্ডবৎ কৈলা রায় প্রভু কৈল আলিঙ্গনে।
দুই জন কথা কন বসি সেই স্থানে॥
প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥

চৈ, চ, মধ্য, ৮।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৩৮৮)

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যঃ তৎ তোষকারণম্॥

বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে নিষ্কাম ভাবে স্বধর্ম্ম আচরণ করিলে, চিত্তের নির্ম্মলতা হয়। চিত্তের নির্ম্মলতা হইলে বিষ্ণুভক্তির উদয় হয়। এই জন্য স্বধর্ম্মাচরণ প্রথম সাধ্য। কিন্তু অনেক হিন্দুর কাছে, ইহাই শেষ সাধ্য। তাঁহাদের মতে এই সোপান ত্যাগ করিতে কাহারও অধিকার নাই। তুমি যতই ঊর্দ্ধে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করনা কেন, এই সোপানে অধিরূঢ় হইয়া তোমাকে চিরকাল থাকিতেই হইবে। বৃথা নারদ ঋষি ব্যাসকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক বা ভদ্রমভূদমুস্য কিং
কোবার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥

ভাঃ পুঃ ১—৫—১৭।

বৃথা রামানন্দ কবীরকে শিষ্য করিয়াছিলেন। বৃথা কবীর সাম্যের জ্বলন্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন। বৃথা নানক উপনয়নের জন্য পিতার সহিত বিরোধ করিয়াছিলেন। বৃথা চৈতন্যদেব হরিদাসের মৃতদেহ স্কন্ধে বহন করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। বৃথা রামানন্দ রায় বলিয়াছিলেন, ভক্তি-বিদ্যালয়ে স্বধর্ম্মাচরণ নিম্নতম শ্রেণী।

চৈতন্যদেব হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, এ ত এখনও বহিরঙ্গ ভক্তি।

"প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সর্ব্বসাধ্য সার॥"

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৯—২৭)

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

প্রথমে যজ্ঞের জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম। পরে যখন নির্ম্মল অন্তঃকরণে ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি হয়, তখন সে কর্ম্ম আর যজ্ঞের জন্য নয়, স্বধর্ম্মের জন্য নয়, তখন সে কর্ম্ম ভগবানের জন্য ভগবানে অর্পিত। ভগবানের কর্ম্মে ত বর্ণভেদ নাই।

কপিল দেবহূতিকে বলিয়াছিলেন—

তস্মান্ময্যর্পিতাশেষ ক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ।
ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্ম্মণঃ।
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্ত্তুঃ সমদর্শনাৎ ॥ ৩৩
মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥ ৩৪

ভা, পু, ৩—২৯।

ঈশ্বর কলা-রূপে সকল জীবে প্রবিষ্ট আছেন। প্রতি জীব ঈশ্বরের জীবিত প্রতিমা। এই প্রতিমায় প্রাণের অধিষ্ঠান করাইতে হয় না। আমি এই প্রতিমার মধ্যে কাহাকে ব্রাহ্মণ বলিব, কাহাকে শূদ্র বলিব, কাহাকে যবন বলিব, কাহাকে খৃষ্টান বলিব।

"মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ম্।"

আমি ভগবান্ কপিল-দেবের উপদেশ অনুসারে সকলকেই প্রণাম করিব। মনে মনে সকলকেই যথেষ্ট আদর করিব। তবে আর স্বধর্ম্ম থাকিল কোথায়? তবে কি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিব?

"প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্ম-ত্যাগ এই সাধ্য সার ॥"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১-১১-৩২)

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।

ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥

যদি অজ্ঞান-বশতঃ বা নাস্তিক-বুদ্ধির অনুসরণে কেহ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে, তবে তাহা দোষাবহ হয়। কিন্তু বেদ-মার্গে আদিষ্ট গুণ ও দোষ সম্পূর্ণরূপে জানিয়া, যখন ভক্ত সেই আদেশের মর্ম্ম পালনের জন্য আর স্বধর্ম্মের অপেক্ষা রাখেন না, যখন তাঁহার ভক্তি এতদূর দৃঢ় হয় যে, স্বধর্ম্মাচরণ তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক কপটতা হইয়া উঠে, তখন ভক্ত স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা করিবেন।

তথাহি ভগবদ্গীতায়াম্ (১৮-৬৭)—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

এদিকে সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব, অন্যদিকে ভগবান্‌কে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতে না পারিলে, শেষে কি অধর্ম্মের পঙ্কে পতিত হইব? ভগবান্‌কে সর্ব্বতোভাবে কিরূপে আশ্রয় করিব তাহাওত জানা চাই। ভগবানের কোন্ কার্য্য কিরূপে করিতে হইবে, তাহা জানিতে পারিলে ভগবান্‌কে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিতে পারা যায়।

"প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।

রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার॥"

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১৮-৫৪)

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

সেই জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সর্ব্বত্র সম-দর্শন হয়। তখন আর শোক থাকে না, আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

শান্তিরসে তখন জ্ঞানী আপ্লুত হন্। তাঁহার গ্রন্থিসকল ছিন্ন হয়। আত্মারাম মুনি ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হন্। এই কি তবে শেষসাধ্য ?

"প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞান-শূন্য ভক্তি সাধ্য-সার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০-১৪-৩)—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসিতৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

যখন শান্তচিত্ত আত্মারাম মুনি, শান্তিরসে নিমগ্ন হন্, তখন সাধ্য সাধনায় তাঁহার এক সন্ধিস্থল আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি জ্ঞানই তাঁহার তখন পর্য্যন্ত নিত্য সাধন হইয়া দাঁড়ায়, এবং শান্তিই যদি তাঁহার একমাত্র সাধ্য হয়, তাহা হইলে তিনি নির্গুণ ব্রহ্মভাবে মগ্ন হইয়া শান্তির ক্রোড়েই চির-বিরাজিত থাকিবেন ; সেই শান্তিদেবী সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তখন তাঁহাকে নির্ম্মল, নির্গুণ ব্রহ্মানন্দে চিরমগ্ন রাখিবেন।

আর যদি সেই সময়ে জ্ঞানী জ্ঞানের প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে তখন ভগবান্ মধুর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার নির্ম্মল চিত্তকে আকুল করেন। সেই আকুলতা দৃঢ় হইলেই প্রেমের সঞ্চার হয়।

ব্রহ্মা কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, যাঁহারা জ্ঞানের পক্ষে কিছুমাত্র প্রয়াস না রাখিয়া আপন আপন স্থানে অবস্থিত হইয়া নিত্য-প্রকটিত ভবদীয় বার্ত্তা সাধুমুখে শ্রবণমাত্র কায়মনোবাক্যে আপনাকেই কেবলমাত্র ভক্তি-ভাবে স্মরণ করিতে করিতে জীবন ধারণ করেন, তাঁহারা ত্রৈলোক্য মধ্যে আপনি অজিত হইলেও আপনাকে জয় করেন।

এইবার চৈতন্যদেব নির্গুণ ভক্তির আভাস পাইলেন। আর তিনি "এহো বাহ্য" বলিতে পারিলেন না। তবে এখনও ত প্রেমের কথা রামানন্দ বলিলেন না। তিনি ত প্রেম-ধর্ম্ম প্রচার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রেমের আভাস লইয়াই তাঁহার কায চলিবে না। প্রেম লইয়াই তাঁহার কায।

"প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেম-ভক্তি সর্ব্বসাধ্য-সার॥"

তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

নানোপাচারকৃতপূজন মার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জঠরা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো নন্নু ভক্ষ্যপেয়ে॥

যতদিন পর্য্যন্ত তুমি সংসার-পীড়ায় আর্ত্ত থাক, ততদিন পর্য্যন্ত সগুণ ভক্তির ক্ষেত্রে নানাবিধ উপচার দ্বারা আর্ত্তবন্ধু ভগবানের পূজা কর। যতদিন জঠরে ক্ষুধা থাকে, এবং বলবতী পিপাসা তোমাকে যতদিন পীড়া দেয়, ততদিনই তোমাকে ভক্ষ্য পেয় ভাল লাগে। যখন ভক্তের সংসার-জনিত আর্ত্তি থাকে না, যখন তাহার কোন কামনা, অভিলাষ বা প্রয়োজন থাকে না, যে জন্য সে ভগবানের আরাধনা করিবে, যখন বিনা-কারণে, বিনা-বিচ্ছেদে, ভক্তের মনের গতি ভগবানের দিকে প্রবাহিত হয়, তখন একমাত্র প্রেমই ভক্তের হৃদয় আনন্দ-প্লাবিত করে।

তত্রৈব—

কৃষ্ণভক্তি-রস-ভাবিতা মতিঃ
ক্রিয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।

তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥

কৃষ্ণ-ভক্তিরস-ভাবিতা মতি, যদি কোথা হইতেও লাভ করিতে পারা যায়, তবে ক্রয় কর। কোটি জন্মের পুণ্যদ্বারা সেই মতি লাভ করিতে পারা যায় না। কেবল একমাত্র লোলতা, ব্যাকুলতা ও প্রবল অনুরাগই তাহার মূল্য।

সেই অনুরাগ নির্ম্মল ভক্ত-হৃদয়ে একবার উত্থিত হইলে, মধুর ভগবান্ পূর্ণ শশধর রূপে উদিত হইয়া প্রেমরসে হৃদয় আপ্লুত করিয়া দেন।

উৎফুল্ল চিত্তে মহাপ্রভু বলিলেন, ইহা সত্য। কিন্তু ভাব-বৈচিত্র্যে প্রেমের বিচিত্রতা আছে। তাহা কি তুমি জান ?

"কহে প্রভু এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্য-প্রেম সর্ব্বসাধ্য-সার ॥
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য-সার ॥
প্রভু কহে এহো উত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য-প্রেম সর্ব্বসাধ্য-সার ॥
প্রভু কহে এহো উত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তাভাব সর্ব্বসাধ্য-সার ॥
কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণ-প্রাপ্তির তারতম্য বহু ত আছয় ॥
কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তারতম ॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাঢ়য় ॥

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্যে বাঢ়ে প্রতি রসে।
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ-প্রাপ্তি এই প্রেম হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজৈ তৈছে॥
এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে।
যদ্যপি কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধুর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তার বাঢ়য়ে মাধুর্য্য॥

প্রেমের সর্ব্বোত্তম ভাব কান্তাভাব। ব্রজদেবীগণ সেই ভাবে কৃষ্ণকে ভজনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণের মাধুর্য্যে মধুরতাময় হইয়াছিলেন। সেই মধুরতা আত্মবিসর্জ্জনময় ব্যাকুল প্রেমে মিশ্রিত হইয়া কৃষ্ণের মধুরতাকে অতিক্রম করিয়াছিল।

"প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥"

তখন বিচার করিয়া রামানন্দ রায় বলিতে লাগিলেন,—

"ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য-শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বাখানি॥
প্রভু কহে আগে কহ শুনি পাইয়ে সুখে।
অপূর্ব্ব অমৃত নদী বহে তোমার মুখে॥

চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে॥
রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ॥"

যদি রাধিকার প্রতি কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ থাকিবে, তবে চুরি করিয়া অন্য গোপীর মধ্যে হইতে তাঁহাকে লইয়া যাইবার কি প্রয়োজন ছিল? কেন, সাক্ষাৎকারে রাধার জন্য কৃষ্ণ কি গোপীদিগকে ত্যাগ করিতে পারিতেন না?

ভক্ত-হৃদয়ে চোট্ লাগিল। রামানন্দ ভক্তচূড়ামণি। তিনি চৈতন্য-দেবের প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন না।

"রায় কহে তাহা শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে নাহি রাধা-প্রেমের উপমা॥
গোপীগণের রাসনৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া॥"

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে —

ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকা
মনঙ্গবাণ-ব্রণখিন্ন মানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী
তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥
কংসারিরপি সংসার-বাসনা-বদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥
"এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি।
বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি॥

শত কোটি গোপীসঙ্গে রাস-বিলাস।
তা'র মধ্যে এক মূর্ত্তে রহে রাধাপাশ॥
সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা॥
ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হইল শ্রীহরি॥
সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা।
রাসলীলা বাঞ্ছাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥
তাহা বিনু রাসলীলা নাহি ভায় চিতে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥
ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করে কাম-বাণে খিন্ন হৈয়া॥
সাত কোটি গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপন।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥"

রামানন্দ রায় হেলায় চৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। গীত-গোবিন্দে "অনঙ্গবাণ-ব্রণখিন্ন-মানসঃ"—কেবলমাত্র কবিতার বাক্য। শ্রীকৃষ্ণ "সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ।" তিনি আর কামবাণে খিন্ন হইবেন কেন? তবে মধুর কৃষ্ণকে মধুর ভক্তবৃন্দ লইয়া একটি ঘরকন্না করিতে হয়। প্রেমের রাজ্যে ভক্তগণ আপন আপন ভাব লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন। শ্রীকৃষ্ণকে সেই সেই ভাব লইয়া আবার সেই ভক্তগণকে ভজনা করিতে হয়।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"।

এইজন্য প্রেমের রাজ্যে শ্রীকৃষ্ণের একটি বৃহৎ সংসার। কিন্তু এই সংসারের বন্ধন সেই মহাভাব-স্বরূপা হ্লাদিনী-শক্তি শ্রীরাধিকা। "রাসলীলা

বাঞ্ছাতে রাধিকা শৃঙ্খলা”। এইজন্য গোপীগণ শক্তিরূপিণী হইলেও শ্রীরাধিকা পরা শক্তি।

“প্রভু কহে যে লাগি আইলাঙ তোমা স্থানে।
সেই সব রসবস্তু তত্ত্ব হৈল জ্ঞানে॥
এবে জানিল সেব্য সাধ্যের নির্ণয়।
আগে কিছু আমার শুনিতে চিত্ত হয়॥”

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল। রামানন্দের সহিত অমৃতনিষ্যন্দী মধুর আলাপের শেষ হইল না। সেব্য সাধ্য নির্ণয় হইল। জানা গেল, রাধাকৃষ্ণ পরম সেব্য। কেন পরম সেব্য, তাহা এখনও জানা গেল না। পরম সেব্য হইলে, তাঁহাদের পরম সেবা কি, তাহাও জানা গেল না।

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা আবার রামানন্দ-বার্ত্তার অনুশীলন করিব।

রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ও রাধাকৃষ্ণ-সেবা।

কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধিকা স্বরূপ।
রস কোন্ তত্ত্ব প্রেম কোন্ তত্ত্বরূপ ॥
কৃপা করি এই তত্ত্ব কহত আমারে।
তোমা বিনে ইহা কেহ নিরূপিতে নারে ॥
রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি।
যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী ॥
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকের পাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট ॥
প্রভু কহে মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি ॥
কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র সন্ন্যাসী কেনে লয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥

মহাপ্রভুর প্রবল ইচ্ছায় রায় রামানন্দের মন টলমল হইল। তিনি তখন কৃষ্ণতত্ত্ব বলিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণতত্ত্ব—

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্
সর্ব্ব-অবতারী সর্ব্ব-কারণ প্রধান ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার ॥

ব্যাপী বৈকুণ্ঠলোক এক। কিন্তু সেই অখণ্ড বৈকুণ্ঠ মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কেন্দ্র উদ্ভূত হয়। এই জন্য অনন্ত বৈকুণ্ঠ বলা হইয়াছে।

সচ্চিদানন্দ-তনু শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরসপূর্ণ॥
বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কাম-গায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥

অপ্রাকৃত মদন, অপ্রাকৃত কাম। এ কাম স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর অনুরাগ নহে। এ মদন পার্থিব মনোবিকারের প্রেরক নহে।

পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥

এ মদন মদনেরও মদন—স্ত্রী পুরুষ, স্থাবর জঙ্গম, সকলেরই আকর্ষক। এই অপ্রাকৃত ভাব লইয়াই কৃষ্ণপ্রেম। যেখানে প্রাকৃতভাব, সেখানে কৃষ্ণপ্রেমের অত্যন্ত অভাব।

নানাভক্তের নানামত রসামৃত হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়॥

যখন ভক্তের হৃদয়ে নানারসময় প্রেমভাব হয়, তখন যেই ভাবের প্রতিদান জন্য, প্রতিভজনা জন্য, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" এই প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য, সচ্চিদানন্দময় সগুণ ব্রহ্ম হইতে এক অখিলরসামৃত মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়। বৃন্দাবনে শ্যামরূপে সেই মূর্ত্তি প্রকটিত হন। সেই মূর্ত্তি ভক্তের রসভাবনার বিষয় ও আশ্রয়।

শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর॥

কেবল চিত্তহারক হইলে ত প্রাকৃত হইল। আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত-হর, এজন্য অপ্রাকৃত। শৃঙ্গারও অপ্রাকৃত, রসও অপ্রাকৃত। কেবল কথার অভাবে, শৃঙ্গার শব্দের প্রয়োগ।

লক্ষ্মীকান্ত আদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মীআদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥

কৃষ্ণ জগতের দেবদেবী সকলেরই আকর্ষক। এমন কি—

আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥
সংক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের স্বরূপ।
এবে সংক্ষেপে কহি শুন রাধাতত্ত্ব রূপ॥

রাধাতত্ত্ব—

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম॥

"চিচ্ছক্তি"—সচ্চিদানন্দ-শক্তি, অন্তরঙ্গ-শক্তি, স্বরূপ-শক্তি, বিষ্ণুর পরা-শক্তি।

"মায়াশক্তি"—অবিদ্যাশক্তি, জীবের কর্ম্ম অনুযায়ী স্বভাবের বিকার-শক্তি, বহিরঙ্গ-শক্তি। ঘাত-প্রতিঘাতে খণ্ড শক্তিকে সবল ও প্রস্ফুটিত করিবার শক্তি।

"জীবশক্তি"—খণ্ডক্ষেত্রে সচ্চিদানন্দের খণ্ডিত শক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি, ব্যষ্টি অজ্ঞানে সঙ্কীর্ণ চিৎশক্তি, 'যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ' শক্তি। না অন্তরঙ্গ না বহিরঙ্গ, তটস্থ শক্তি।

অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি সবার উপরে॥

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রো । ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ॥
অবিদ্যা কর্ম্ম সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ বিষ্ণুপুরাণ ৬-৭-৬০
সৎ-চিৎ-আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী ।
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥
হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে ।
হ্লাদ-তাপ-করী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥ বিষ্ণুপুরাণ ১-১২-৪৮

সেই অখণ্ড সত্তা আছে বলিয়া, আমাদের খণ্ডিত সত্তা, খণ্ডিত জগৎ। অখণ্ড চৈতন্য আছে বলিয়াই, খণ্ডিত জ্ঞান। অখণ্ড আনন্দ আছে বলিয়াই, হ্লাদ-তাপকরী জীবের মিশ্র আনন্দ। শক্তিদ্বারে, সৎ, চিৎ ও আনন্দের প্রবল হইতে প্রবলতর ঢেউ আসিয়া জীবের পরিচ্ছিন্নশক্তির পরিচ্ছিন্নতা নষ্ট করে।

আনন্দের জন্যই আমাদের ধর্ম্মভাব। আনন্দের জন্য রাজসিক চেষ্টা ও তামসিক ভাবের দমন। উৎকৃষ্ট, নির্ম্মল বিশুদ্ধ আনন্দের জন্য সাত্ত্বিক ভাবের প্রয়াস। তাপত্রয়ের নাশের জন্য আমাদের সাংখ্যজ্ঞান। পরমানন্দ-প্রাপ্তির জন্য বেদান্ত-জ্ঞান। মধুর কৃষ্ণকে মধুর ভাবে ভজনই আনন্দের পরাকাষ্ঠা। সেই প্রেমানন্দ ভক্ত-হৃদয়ে পরিপুষ্ট করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের যে শক্তি, তাহাই হ্লাদিনী শক্তি।

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ॥

এই হ্লাদিনী শক্তি কৃষ্ণকে আনন্দিত করিবার জন্য প্রথমে ভক্তহৃদয়ে আবির্ভূত হয়। পরে একমাত্র কৃষ্ণকে অনন্যভাবে আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণাত্মিকা কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তিতে পরিণত হয়। তখন কৃষ্ণশক্তি কৃষ্ণভক্তের হৃদয়ে প্রতিচালিত হয়। সেই শক্তিবলে ভক্তের হৃদয় অতিশয় উৎফুল্ল হয়, এবং কৃষ্ণময় হইয়া কৃষ্ণপ্রেমে প্লাবিত হয়। এইজন্য "সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন। ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।"

হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ-চিন্ময়-রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরমসার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব-রূপা রাধাঠাকুরাণী॥

মহাভাব কি, তাহা সনাতনের শিক্ষায় জানিতে পারিয়াছি। অতএব মহাভাব-রূপা শ্রীমতী রাধিকা হ্লাদিনী-শক্তির পরাকাষ্ঠা।

প্রেমের স্বরূপদেহ প্রেমে বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি-সার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার॥
মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী যার কায়ব্যূহরূপ॥
রাধাপ্রতি কৃষ্ণ-'স্নেহ' সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বলবরণ॥
কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান মধ্যম॥
লাবণ্যামৃত-ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজলজ্জা শ্যাম পট্টশাড়ী পরিধান॥

কৃষ্ণ-'অনুরাগে' রক্ত দ্বিতীয় বসন।
'প্রণয়'-'মান' কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন॥
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখীপ্রণয় চন্দন।
স্মিতকান্তি কর্প্পূর তিনে অঙ্গ বিলেপন॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর॥
প্রচ্ছন্ন মান কম্য ধম্মিল্ল বিন্যাস।
ধীরাধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পট্টবাস॥
'রাগ' তাম্বুল-রাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেমকৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল॥
সুদীপ্ত সাত্ত্বিক 'ভাব' হর্ষাদি সঞ্চারী।
এই সব ভাব ভূষণ প্রতি অঙ্গে ভরি॥
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব-বিংশতি ভূষিত।
গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত॥
সৌভাগ্যতিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেম-বৈচিত্র্য-রত্ন হৃদয়ে তরল॥
মধ্যবয়ঃস্থিতা সখী স্কন্ধে কর ন্যাস।
কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী-আশ-পাশ॥
নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্ক।
তাতে বসিয়াছে সদা চিন্তে কৃষ্ণ সঙ্গ॥
কৃষ্ণনাম গুণ যশ অবতংস কাণে।
কৃষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে॥
কৃষ্ণকে করায় সোমরস মধুপান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥

কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম গুণগণে পূর্ণ কলেবর॥
যাহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যার ঠাঞি কলা-বিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যার সৌন্দর্য্যাদিগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।
যার পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যার সদ্‌গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার॥
তার গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার।
প্রভু কহে জানিল কৃষ্ণ-রাধা-প্রেমতত্ত্ব।
শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব॥

স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাবের বিচিত্র লহরীতে বিচিত্ররূপে রঞ্জিতা, রসরাজের আনন্দচিন্ময়-রস প্রতিভাবিতা আনন্দময়ী আনন্দদায়িনী, পরাশক্তিরূপিণী রাধাবিনোদিনীর এই চিত্তবিনোদন চিত্র জীবের চির আদর্শ হইয়া জগতে চির বিরাজিত হউক।

রাধাকৃষ্ণ-বিলাস—

রায় কহে কৃষ্ণ হয়ে ধীরললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া যাহার চরিত॥

কামক্রীড়া অর্থে নিরন্তর প্রেম ও প্রেমের অপ্রাকৃত প্রতিদান বুঝিতে হইবে।

রাত্রিদিনে কুঞ্জক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে॥
প্রভু কহে এই হয় আগে কহ আর।
রায় কহে আর বুদ্ধিগতি নাহিক আমার॥

যেবা প্রেম বিলাস বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়॥

রামানন্দ মনে করিলেন, আমি ত তত্ত্বের অবধি বলিলাম। ইহাতেও যখন সন্ন্যাসীর মন উঠিল না, তখন হয়ত ইনি বিবর্ত্তবাদী। আমি আর বিবর্ত্ত কথা কি বলিব? তবে প্রেম বিলাসের বিবর্ত্ত বলি' দেখি।

এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥
পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি॥
এ সখি সে সব প্রেমকাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন।
দুঁহুকেরি মিলনে মধত পাঁচবাণ॥
অবশোই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমক ঐ ছন রীতি॥

উজ্জ্বল নীলমণিরসে, এই ভাবে একটি শ্লোক আছে।

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্
যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূতভেদ-ভ্রমম্।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োভি র্নবরাগহিঙ্গুল-ভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী॥

হে গোবর্দ্ধন-গিরি-নিকুঞ্জবাসী কুঞ্জরপতে! শ্রীমতী রাধিকা ও তোমার চিত্তরূপ লাক্ষাকে স্বেদ দ্বারা দ্রবীভূত করিয়া উভয়ের ভেদভ্রম অপসারণ

করতঃ শৃঙ্গার-শাস্ত্র-বিশারদ বিধি ব্রহ্মাণ্ডরূপ অট্টালিকাভ্যন্তরে নবরাগরূপ হিঙ্গুলদ্বারা স্বয়ং জগতের বিস্ময় বৰ্দ্ধনার্থ অনুরঞ্জিত করিয়াছেন।

ক্রমে অদ্বৈতবাদের দ্বারে উপস্থিত হওয়া গেল। অদ্বৈতবাদে যে প্রেমের রস শুকাইয়া যাইবে। দূর হইতেই অদ্বৈতবাদ ভাল। এত নিকটে প্রেমের রস না শুকাইয়া যায়! মহাপ্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্বহস্তে রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিলেন।

প্রভু কহে সাধ্য বস্তু অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥
সাধ্য বস্তু সাধন বিনু কেহ নাহি পায়।
কৃপা করি কহ ইহা পাবার উপায়॥

সাধন বা সেবাতত্ত্ব—

এই প্রেম-ধৰ্ম্ম প্রচারের বীজ ভাগবত-পুরাণ। কিন্তু ঐ ধৰ্ম্মের সাধন-শাস্ত্র মহাপ্রভুর জীবন। সেই জীবনের অন্তরঙ্গ সহচর রামানন্দরায় ও স্বরূপ দামোদর। রামানন্দের মুখে আজি সেই সাধনের বর্ণনা শুনি।

মোর মুখে বক্তা তুমি তুমি হও শ্রোতা।
অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা॥
রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্য ভাবের না হয় গোচর॥

যেখানে দাস-ভাব ও পিতৃ-মাতৃ-ভাব, সেখানে শৃঙ্গার-রসের সঙ্কোচ। রাধাকৃষ্ণের মিলন এক সখী ভাবে দেখাই সম্ভব।

সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়।
সখী-লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥

সখী বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি।
সখীভাবে তাহা যেই করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

যে কোন ব্রজভাব লইয়া ভজনা করিলে নিত্য বৃন্দাবনে রাধারাণীর কৃপায় স্থান পাওয়া যায়। কিন্তু সকল ব্রজভাবে রাধা-কৃষ্ণের মিলন দেখা যায় না। সেই নিত্য বৃন্দাবনে কত গোপ ও কত গোপী। আবার রাগমার্গে মধুর কৃষ্ণকে ভজনা করিয়া কত ভক্ত নূতন গোপ ও নূতন গোপী হইয়া সেখানে অধিকার লাভ করিতেছেন। সেই গোপ-গোপীগণ জগতের শীর্ষস্থান লাভ করিতেছেন; জ্ঞানের সীমা, ব্রহ্মাণ্ডের সীমা, এমন কি বৈকুণ্ঠের সীমা তাঁহারা অতিক্রম করিতেছেন। তাঁহারা গোলোক-বিহারীর নিজজন হইতেছেন। প্রেম-ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য হইয়া তাঁহারা কত ব্রহ্মাণ্ডে, কত জগতে প্রেমরশ্মি বিকিরণ করিতেছেন। দেবযান-মার্গে দেবতারা তাঁহাদিগকে জানিতে পারেন না, ব্রহ্মবিদ্যা-বলে ব্রহ্মজ্ঞানীরা তাঁহাদের মহিমার ইয়ত্তা পান না। ঐশ্বর্য্য হইতে মাধুর্য্য যেমন ভগবানের অধিক অন্তরঙ্গ, সেইরূপ অনন্ত ঈশ্বর হইতেও তাঁহারা ভগবানের অধিকতর অন্তরঙ্গ। আনন্দচিন্ময়-রস-প্রতিভাবিত গোপ ও গোপী-জীবন জীবের চরম গতি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের চরম লক্ষ্য। ঐশ্বর্য্যমার্গে ভেদ লইয়া এবং জ্ঞানমার্গে অভেদ লইয়া অনন্ত জীব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত অধিকার লাভ করিবে। কিন্তু ভেদাভেদকে কৃষ্ণময় করিয়া মধুর গোপ ও মধুর গোপী মধুর কৃষ্ণের মধুর কিরণ হইয়া অনন্ত কালের জন্য অনন্ত জগৎ মাধুর্য্যে আপ্লুত করিবে। তাহাদের অপ্রাকৃত আনন্দে আমাদের প্রাকৃত আনন্দ, তাপ-বিহীন হইবে। "রুচীণাং বৈচিত্র্যাদ্ ঋজু-কুটিল নানা-পথজুষাং।" মনুষ্যদিগের মধ্যে

যাঁহারা এ পথ অবলম্বন করিবেন, তাঁহাদের জন্য শ্রীমতীর সখীগণ পরম গুরু।

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাতে কোটি সুখ পায়॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ-প্রেম কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥
কৃষ্ণ-লীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সুখ হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কাম ক্রীড়া সাম্যে তারে কহে কাম নাম॥
সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদ ধর্ম্ম সর্ব্ব ত্যজি সেই কৃষ্ণেরে ভজয়॥
রাগানুগা মার্গে তারে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণে পায় ব্রজে॥

সেই ভাবের উপযোগী দেহ পাইয়া নিত্য বৃন্দাবনে কৃষ্ণকে লাভ করে।

বিধি মার্গে নাহি পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র॥
অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন।
সখ্যভাবে পায় রাধা কৃষ্ণের চরণ॥

গোপী অনুগত বিনা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনে॥

বিধিমার্গ, ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান ত্যাগ করিতে হইবে। রাগমার্গে গোপীভাব গ্রহণ করিতে হইবে। গোপী-ভাবে নিজের এক সিদ্ধদেহ চিন্তা করিতে হইবে। সেই সিদ্ধদেহে কামের লেশ থাকিবে না। কেবল মাত্র অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেমের বিকলতা থাকিবে। সেই সিদ্ধদেহে রাধাকৃষ্ণ-বিহারের কালাকাল বিচার করিয়া তদনুযায়ী মানসিক সেবা করিতে হইবে। এই রূপ সেবায় মন নিত্য ব্যাপৃত থাকিলে, ভক্ত সেই ভাবে পূর্ণ হয় এবং "ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণে পায় ব্রজে"।

মহাপ্রভুর শিক্ষার এই চরম অন্তরঙ্গ সাধন। রামানন্দের মুখ দিয়া তিনি সমগ্র শিক্ষা প্রকটিত করিলেন। কৃষ্ণতত্ত্বে রসরাজ ও রাধাতত্ত্বে মহাভাবের আবিষ্কার করিলেন।

প্রগাঢ় চিত্তে এই নিগূঢ়-তত্ত্ব শুনিতে শুনিতে মহাপ্রভুর নিজের নিগূঢ় ভাব স্বতঃ প্রকটিত হইল।

পহিলে দেখিল তোমা সন্ন্যাসীস্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখ কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্তে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা॥
তাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন।
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন॥
এই মত তোমা দেখে হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার॥
প্রভুকহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়।

রায় কহে প্রভু মোরে ছাড় ভারি ভুরি।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি ॥
তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ ॥
দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিত।
ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে ॥
প্রভু তারে হস্তস্পর্শে করাইল চেতন।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন ॥
অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইয়ে, তর্কে হয় বহুদূর ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ'
যাহার সর্ব্বস্ব তারে মিলে এই ধন ॥
রামানন্দ রায়ে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার ॥
দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে।
রামানন্দ মিলন লীলা করিল প্রচারে ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

নিত্যলীলা।

আবহমানকাল হইতে প্রকৃতি-পুরুষের বিচিত্র অভিনয় লইয়া সৃষ্টি স্থিতি-লয়। এই অভিনয়ের এক অঙ্ক, স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সম্বন্ধ। এই অঙ্কের মধ্যে কত গর্ভাঙ্ক, তাহা কে বলিতে পারে? পূর্ব্বে দক্ষ-প্রজাপতি মন দ্বারাই সৃষ্টি করিতেন।

মনসৈবাসৃজৎ পূর্ব্বং প্রজাপতিরিমাঃ প্রজাঃ।
দেবাসুর-মনুষ্যাদীন্ নভঃস্থলজলৌকসঃ॥

ভা, পু, ৬-৪-১৯।

কিন্তু মানসিক সৃষ্টি জীব-প্রচারের জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী না হওয়ায়, প্রজাপতি অন্য উপায়ের জন্য বিষ্ণুর তপস্যা করিলেন। ভগবান্ আদেশ করিলেন,—

মিথুনব্যবায় ধর্ম্মস্ত্বং প্রজাসর্গমিমং পুনঃ।
মিথুনব্যবায় ধর্ম্মিণ্যাং ভূরিশো ভাবয়িষ্যসি॥
ত্বত্তোঽধস্তাৎ প্রজাঃ সর্ব্বা মিথুনীভূয় মায়য়া।
মদীয়য়া ভবিষ্যন্তি হরিষ্যন্তি চ মে বলিম্॥

'হে প্রজাপতি, তুমি মিথুন ব্যবায় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, প্রজা সৃষ্টি কর। তোমার সৃষ্ট প্রজা আমার মায়া কর্ত্তৃক চালিত হইয়া মৈথুন-ধর্ম্ম দ্বারা বংশবৃদ্ধি করিবে, এবং আমার জন্য বলি আহরণ করিবে।'

প্রবৃত্তি-মার্গে পত্নী সহধর্ম্মিণী। পত্নীর সাহায্য ব্যতিরিকে যজ্ঞ সম্পাদন হইতে পারে না। পত্নী-সংযোগের বিধান পাশব-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নহে। যজ্ঞ বংশগত করিবার জন্য ও ধর্ম্মসাধনের প্রণালী অক্ষুণ্ণ

রাখিবার জন্য সন্তানের প্রয়োজন। কেবল মাত্র সন্তান উৎপত্তির জন্য মৈথুন ধর্ম্মের আদেশ। কিন্তু কামের প্রবল উৎপীড়নে সে আদেশ মনুষ্যের মনে স্থান পায় না।

ক্রমে যখন সকাম ধর্ম্ম মনুষ্যকে কতকগুলি সদ্গুণে বিভূষিত করিয়া আর অগ্রসর হইতে সমর্থ না হয়, যখন শ্রুতি সকল নিষ্কাম ধর্ম্মের বীজ পবিত্র মানব-হৃদয়ে অঙ্কুরিত করে, যখন 'আমি' ও 'আমার বংশ' ভুলিয়া মানব সকল জীবকেই ঈশ্বরের অংশ বলিয়া অনুভব করে, যখন সর্ব্বগত আত্মা মানব-হৃদয়ে প্রবল স্থান অধিকার করে, তখন আর পুত্রের প্রয়োজন থাকে না, পত্নীর আবশ্যকতা হয় না। ভগবান্ মিথুন-ব্যবায়-ধর্ম্মরূপ যে মায়ায় আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছেন, ঊর্দ্ধরেতা না হইলে, সেই মায়া অতিক্রম করিতে পারা যায় না। মায়া অতিক্রম না করিলে ভগবানের সম্পূর্ণ সেবা করিতে পারা যায় না।

বিরক্ত বৈষ্ণব, বিরক্ত সন্ন্যাসী সকলেই ঊর্দ্ধরেতা হইতে চাহে। কিরূপে ঊর্দ্ধরেতা হইতে পারা যায়? এই জগতে ইহার দুই প্রকার সাধন আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এক সাধনে স্ত্রী সহকারিণী, অন্য সাধনে স্ত্রী সম্পূর্ণ পরিবর্জ্জিতা।

জয়দেব, চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধকগণ স্ত্রী-সহযোগে সিদ্ধ হইয়াছেন। সেই সাধনার বিকৃত আভাস কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ে এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে। বৈষ্ণব-দম্পতি পবিত্র ভাবে সেই সাধন অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধরেতা হইতে পারেন।

কিন্তু ভাগবত-সম্মত সাধন, স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন,—

> বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
> মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥ ভা, পু, ১১-১৪-২৭।

'বিষয় ধ্যান করিতে করিতে চিত্ত বিষয়েতেই বিলগ্ন হয়। আমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিতে করিতে চিত্ত আমাতেই লীন হয়।'

তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথম্।
হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনো মদ্ভাবভাবিতম্॥ ১১-১৪-২৮

'সেই জন্য অসৎ-বিষয়-ধ্যান স্বপ্ন-মনোরথের ন্যায় ত্যাগ করিয়া, মদ্ভাব-ভাবিত চিত্ত আমাতে সমাহিত কর।'

স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্।
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ॥

১১-১৪-২৯।

'স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। নির্জ্জন পবিত্র স্থানে আত্মসংযত হইয়া অতন্দ্রিত ভাবে আমাকে চিন্তা করিবে।'

ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চাস্য প্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎ সঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥

১১-১৪-৩০।

'পুরুষের অন্য বিষয়-প্রসঙ্গে ততদূর ক্লেশ বা বন্ধন হয় না, যতদূর যোষিৎ-সঙ্গ ও যোষিৎ-সঙ্গীর সঙ্গ হইতে হয়।'

স্ত্রী যখন বিষয়স্থানীয় হয়, যখন স্ত্রী কেবল মাত্র কামভোগের সাধন হয়, তখনই স্ত্রী হইতে ক্লেশ ও বন্ধন হয়।

স্ত্রী যখন সৎসঙ্গের সহকারিণী হয়, ভগবচ্চিন্তার সহযোগিনী হয়, তখন সে স্ত্রী শ্লোকোক্ত স্ত্রী-শব্দে বাচ্য হইতে পারে না।

কিন্তু সাধারণ মনুষ্য ঐ শ্লোকোক্ত স্ত্রীরই সঙ্গ করিতে থাকে।

স্ত্রীর সঙ্গ পরিত্যাগ কেবল দোষ হইতে পলায়ন মাত্র! কিন্তু দোষের বীজ নষ্ট করিবার উপায় কি? কামরূপ দুরন্ত ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার জন্য ভাগবত-পুরাণ বলেন,—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভি রিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ। ১৩-৩০-৩৯।

'ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ করে ও অন্যের নিকটে বর্ণন করে, সে ভগবানে পরাভক্তি লাভ করে, এবং ধীরস্বভাব সেই ব্যক্তির কামরূপ হৃদয়-রোগ অচিরাৎ নষ্ট হয়।'

কেন এরূপ হয়? কাম-লীলায় কামের উদ্দীপন না হইয়া কামের বিসর্জ্জন কিরূপে হইতে পারে?

কাম যতদিন পৃথিবীর মধ্যে পার্থিব হইয়া থাকিবে, ততদিন উহা পার্থিব ভাবে মনুষ্যকে কলুষিত করিবে।

কামকে শ্রীকৃষ্ণ নিজহাতে উঠাইয়া লইয়া গোলোকে স্থাপিত করিলেন এবং মহাযোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ আত্মারাম হইয়া লীলাস্থলে কামকে আলিঙ্গন করিলেন। কাম তখন গোলোকের পদার্থ হইল, পবিত্র কৃষ্ণলীলার পবিত্র অঙ্গ হইল। যদি এইরূপ শ্রদ্ধা হৃদয়ে রাখিয়া কামের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় কাম তাহার কালিমা ছাড়িয়া পবিত্র 'প্রেম'-সংজ্ঞায় পরিণত হয়।

কামের ত এই প্রয়োজনই বটে। প্রেমময় ভগবানের প্রেম উপলব্ধি করিবার জন্য কাম প্রথম সোপান। কাম খোলস ত্যাগ করিলেই প্রেম।

যিনি জ্ঞানী, তিনি ঊর্দ্ধরেতা হইয়া, কামজয় পূর্ব্বক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন। ভক্ত কামের কলুষিত ভাব বর্জ্জন করিয়া, কামকে পবিত্র প্রেমে পরিণত করিয়া সেই প্রেম দ্বারা প্রেমময় ভগবান্‌কে আলিঙ্গন করেন। কামজয় উভয়েরই অবান্তর লক্ষ্য। চরম লক্ষ্য একের মুক্তি, অন্যের প্রেম।

উদ্ধব বলিলেন,—

বাতরশনা য ঋষয়ঃ শ্রমণা উর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ।
বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্ম্মবর্ত্মসু।
ত্বদ্বার্ত্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈ র্দুস্তরং তমঃ॥ ভা, পু, ১১-৬।

ভাগবতের শিক্ষা রাসলীলার অনুধ্যান ও কীর্ত্তন। সেটি নিত্যলীলা হইলে নিত্য সম্ভব। সেই নিত্যলীলায় যদি ভক্ত নিত্য রাধাকৃষ্ণের লীলা দেখিতে পান এবং সেবক বা সেবিকা হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইতে পারেন তবে তিনি হৃদয়ের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারেন। যদি সকল জীব শ্রীকৃষ্ণের অংশ বা প্রকৃতি হয়, তাহা হইলে সেই ভাবে সেবিকা হইয়াই দাঁড়ান কর্ত্তব্য।

তাই চৈতন্য মহাপ্রভু একদিকে স্ত্রী বর্জ্জনের উপদেশ, ও অন্য দিকে নিত্যলীলার শিক্ষা দিয়াছেন।

যতদিন বৈরাগ্য দৃঢ় না হয়, ততদিন ভিতরে বৈরাগ্য রাখিয়া গৃহকর্ম্ম করা চৈতন্যদেবের উপদেশ।

প্রভুর শিক্ষাতে তেঁহো নিজঘরে যায়।
মর্কট-বৈরাগ্য ছাড়ি হইলা বিষয়ী প্রায়॥
ভিতরে বৈরাগ্য বাহিরে করে সর্ব্বকর্ম্ম।
দেখিয়া ত মাতাপিতার আনন্দিত মন

নিত্যানন্দের কৃপাতে রঘুনাথের বৈরাগ্য দৃঢ় হইল।

সেই হৈতে অভ্যন্তরে না করে গমন।
বাহিরে দুর্গামণ্ডপে করেন শয়ন॥

যেমন যেমন ভিতরে বৈরাগ্য হইবে, তদনুরূপ বিষয় ত্যাগ করিবে। ভিতরে যথার্থ বৈরাগ্য না হইলে বিষয়ত্যাগ অনুচিত।

বিষয় ত্যাগ করিয়া, প্রকাশ্যে বৈরাগ্যের ধ্বজা তুলিয়া, বিষয়-ভোগের আভাসও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মাহিতীর ভগিনীর নাম মাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরম বৈষ্ণবী॥

সেই মাধবী দেবীর নিকট ছোট হরিদাস ভগবান্ আচার্য্যের প্রার্থনা অনুসারে একমন তণ্ডুল 'মাগিয়া' আনিয়াছিলেন।

আবিষ্ট হইয়া চৈতন্যদেব বলিলেন,—

·········বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রাবা নবিবিক্তাসনোভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয় গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥

সে দিন আবেশ দেখিয়া সকলে ভয় পাইলেন। অন্য দিন সকলে হরিদাসের জন্য অনুনয় করিলেন।

অল্প অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হইল না করিব অপরাধ॥
প্রভু কহে "কভু নহে বশ মোর মন।
প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥
নিজ কার্য্যে যাহ সবে ছাড় বৃথা কথা।
কহ যদি পুন আমা না দেখিবে হেথা॥ চৈ, চ, অন্ত্য ২।

তবে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া মন স্থির করিবার উপায় কি?

মহাপ্রভু বলেন,—

অমানী-মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥

এই মানসিক রাধাকৃষ্ণসেবা, ভাগবতের শিক্ষার ঢেউ, রাসলীলা-চিন্তার অনুকল্প। কিন্তু এই শিক্ষা চৈতন্যদেবের নিজ শিক্ষা। এই শিক্ষা বঙ্গে বৈষ্ণব-সমাজের প্রাণ হইতে অধিক। এই শিক্ষায় ভাগবত আছে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ আছে, নারদ পঞ্চরাত্র আছে, পদ্মপুরাণ আছে, জয়দেব আছে, চণ্ডীদাস আছে। কিন্তু এই সকলের সঙ্গে মহাপ্রভুর নিজভাব আছে। তাঁহার রাধাভাব আছে, তাঁহার গোপীভাব আছে। তাঁহার নিত্য মধুর ভাবে বিরাজিত নিত্য বৃন্দাবন আছে। সেই নিত্য বৃন্দাবন তাঁহার ভক্তের মানসিক ধ্যানে নিত্য হাসিতেছে। ভক্ত আত্মহারা হইয়া রাসেশ্বরীর, ব্রজেশ্বরীর কটাক্ষ কামনা করিতেছে। সেই কনক-কুণ্ডল-মণ্ডিতা বৃষভানুদুহিতার কৃপা হইলেই, ভক্ত নিত্য বৃন্দাবনে স্থান পাইবেন।

সনাতন গোস্বামী গভীর পাণ্ডিত্যের সহিত বৃহৎ ভাগবতামৃত লিখিলেন, তিনি এই নিত্যলীলার সেবককে সকলের প্রধান করিলেন। সরূপ নিত্য বৃন্দাবনে স্থান পাইয়াছেন। মাথুর ব্রাহ্মণ সেই লীলার নূতন অধিকারী হইয়াছেন। সরূপ ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া বলিতেছেন,—

স্বয়ং শ্রীরাধিকাদেবী প্রাতরত্যাদিদেশ মাং।
সরূপায়াতি মৎকুঞ্জে মদ্ভক্তো মাথুরো দ্বিজঃ॥
তত্রৈকাকী ত্বমত্যাদৌ গত্বা সদুপদেশতঃ।
প্রবোধ্যাশ্বাস্য তং কৃষ্ণপ্রসাদং প্রাপয় দ্রুতম্॥
অস্মাত্তস্যাঃ সমাদেশাচ্ছীঘ্রমত্রাহমাগতঃ।
ন প্রহর্ষাদপেক্ষে স্ম কৃষ্ণসঙ্গসুখঞ্চ তৎ॥ বৃহদ্ভাগবতামৃত ২—৭।

'অগ্য প্রাতঃকালে স্বয়ং রাধিকাদেবী আমাকে আদেশ করিলেন, "হে সরূপ! আমার কুঞ্জে আমার ভক্ত মাথুর ব্রাহ্মণ আসিতেছে। তুমি অদ্যই প্রথমে একাকী তাহার নিকট গমন কর এবং সদুপদেশ বাক্যে তাহাকে প্রবোধিত ও আশ্বাসিত কর, তাহাকে শীঘ্র কৃষ্ণের অনুগ্রহ লাভ করাও। তাঁহার আদেশ অনুসারে আমি শীঘ্রই এখানে আসিয়াছি। সেই আদেশ পালনের জন্য আমি কৃষ্ণসঙ্গ-সুখেরও অপেক্ষা না করিয়া এখানে আনন্দিত চিত্তে আসিয়াছি।"

মানসিক রাধাকৃষ্ণ-সেবা ও নিত্যলীলানুশীলনের ফল কেবল কাম-বিজয় নহে। তাহার চরম ফল নিত্য-বৃন্দাবন-প্রাপ্তি। দয়াময়ী রাধাঠাকুরাণী প্রত্যেক ভক্তের জন্য ব্যগ্র থাকেন। সময় হইলে প্রত্যেক ভক্তকে নিত্য-বৃন্দাবনের অধিকারী করেন।

তাই রূপ-গোস্বামী বিদগ্ধ-মাধবে রাধাকৃষ্ণ-লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, তাই গোবিন্দ-লীলামৃত বৈষ্ণবের প্রাণধন, তাই নরোত্তম দাস স্মরণ-মঙ্গলে রাধা-কৃষ্ণ-লীলা সকল কালের জন্য সকল বৈষ্ণবের স্মরণীয় করিয়াছেন।

মহাপ্রভু অধিকারী অনুসারে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সাধনের শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রবণাদি বহিরঙ্গ। মানসিক রাধাকৃষ্ণসেবা ও নিত্য-বৃন্দাবনের অনুধ্যান অন্তরঙ্গ। অন্তরঙ্গ-সাধনের প্রেমই প্রাধান অঙ্গ। সেই প্রেম-বলে নিত্য-বৃন্দাবনে অধিকার লাভ করা যায়। ইহাই চরম।

প্রেম-ভক্তি ও যোগ।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের মুখে গোপীদিগকে যোগ শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, গোপীগণ তাঁহাকে চিত্তে ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গম লাভ করিবে। আবার কুরুক্ষেত্রে যখন গোগীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্মিলন হয়, তখনও তিনি যোগের কথা বলিয়াছিলেন।

অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ।

তদনুস্মরণ-ধ্বস্ত-জীবকোষাস্তমধ্যগন্॥ ভা, পু, ১০-৮৩-৪৭।

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শিক্ষিত অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা তাঁহাকে অনুসরণ করিতে করিতে "ধ্বস্ত-জীব-কোষ" হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীধর স্বামী বলেন, জীবকোষ অর্থে লিঙ্গদেহ। গোপীদের লিঙ্গদেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

জীবগোস্বামী বলেন,—"ধ্বস্তো জীবভাবো যাসাম্। এতাস্ত মুনিরূপা ইতি বোদ্ধব্যম্।" গোপীগণের জীবভাব তিরোহিত হইয়া তাঁহারা মুনি-রূপা হইয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন,—"জীবকোষো লিঙ্গদেহ ইতি ব্যাখ্যাতুং ন সঙ্গচ্ছতে নিত্যসিদ্ধানাং সতাং লিঙ্গদেহাভাবাৎ; সাধনসিদ্ধানামপি তাসাং কৃষ্ণসম্ভুক্তানামেতাবৎকালপর্য্যন্তং প্রাকৃতলিঙ্গদেহসত্তানভ্যুপগমাৎ।"

'জীবকোষকে লিঙ্গদেহ বলিয়া ব্যাখ্যান করা সঙ্গত হয় না। নিত্য-সিদ্ধ সাধুদিগের লিঙ্গদেহ থাকে না। সাধন-সিদ্ধ গোপীরাও কৃষ্ণসম্ভুক্ত। তাঁহাদের প্রাকৃত লিঙ্গ-দেহ স্বীকার করা যায় না।'

লিঙ্গদেহ অর্থে প্রাকৃত লিঙ্গদেহ বুঝিতে হইবে। যতদিন আত্মা কোষ-

সকলের দাস, ততদিন তিনি লিঙ্গদেহ-প্রবল। যখন তিনি কোষ-সকলের রাজা, তখন তিনি "ধ্বস্তজীবকোষ"; তখন তিনি মুনি; তখন তাঁহার সিদ্ধ দেহ। নিত্য বৃন্দাবনে অধিকার লাভের জন্য এই সিদ্ধ দেহের প্রয়োজন। এই সিদ্ধদেহ-প্রাপ্তিই বৈষ্ণবের প্রধান সাধন।

যাহাতে গোপীরা এই সিদ্ধ দেহ লাভ করেন, এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব-মুখে গোপীদিগকে বলিয়াছিলেন,—

ময্যাবেশ্য মনঃ কৃৎস্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ।
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ॥

'অশেষ মনোবৃত্তি হইতে বিমুক্ত হইয়া, মন সম্যক্‌রূপে আমাতে আবিষ্ট করিয়া, আমাকে নিত্য অনুস্মরণ করিবে।'

এটি যোগীর ব্যবহার। আজও আমাদের মধ্যে কৃষ্ণ-সঙ্গম লাভের জন্য অনেকে এই যোগ-পথ অবলম্বন করিবেন।

কিন্তু গোপারা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈ র্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধ-বোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥ ভা, পু, ১০-৮২-৪৮।

'হে পদ্মনাভ! অগাধ-বোধ-সম্পন্ন যোগেশ্বরেরা হৃদয় মধ্যে আপনার পদারবিন্দ ধ্যান করিবেন। যাঁহারা সংসার-কূপে পতিত, তাঁহাদের উত্তরণের জন্য আপনার ধ্যানগ্রাহ্য পদারবিন্দই একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু আমরা গৃহসেবী হইলেও আমাদের মনে আপনার পদারবিন্দ সর্ব্বদা উদিত হউক।'

গোপীদিগের মধ্যেও শ্রেণী-বিভাগ ছিল। কতকগুলি গোপী প্রারব্ধ-জনিত স্থূল শরীর লইয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা

সেই শরীর লইয়া সিদ্ধদেহ লাভ করিতে পারিতেন না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চরণ হৃদয়ে ধ্যান করিয়া সিদ্ধদেহ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। "কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্ন্মীলিতলোচনাঃ।"

কতকগুলি গোপীকে শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলীতে একবার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রাসসঙ্গমের পরেও শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব-মুখে সকল গোপীদিগকে যোগ-শিক্ষা দিয়াছিলেন।

কিন্তু এই কুরুক্ষেত্র-মিলনে, গোপীরা কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত। তাঁহাদের পক্ষে আসন করিয়া যোগাভ্যাস হাস্যের কথা। তাঁহাদের প্রেমভক্তির কাছে যোগ কোথায় লাগে? তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট পুনঃ পুনঃ যোগ-শিক্ষা শুনিয়া অধীর চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমভক্তির শিক্ষা দিলেন। গোপীরা প্রেমভক্তির গুরু। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরও গুরু। এইজন্য 'কানু কহে রাই, কহিতে ডরাই"।

গোপীদিগের প্রবর্ত্তিত এই প্রেমধর্ম্মপ্রচারই মহাপ্রভুর চরম উদ্দেশ্য।

তিনি জগন্নাথের রথযাত্রায় নাচিতে নাচিতে "আহুশ্চ তে নলিনলাভ পদারবিন্দং" শ্লোকটি পাঠ করিতে লাগিলেন। স্বরূপ দামোদর ও রূপ গোস্বামীর অনুগ্রহে, বৈষ্ণবমণ্ডলী ঐ শ্লোকের প্রকৃত অর্থ জানিতে পারিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মধুর ভাষায় গাহিয়াছেন,—

অন্যের হৃদয় মন, আমার মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥
প্রাণনাথ শুন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রজ আমার সদন, তাহাতে তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন॥

পূর্ব্বে উদ্ধব দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে,
যোগজ্ঞানে কহিলে উপায়।
তুমি বিদগ্ধ কৃপাময়, জান আমার হৃদয়,
আমারে ঐছে করিতে না যুয়ায়॥
চিত্ত কাড়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি নারি কাড়িবারে।
তারে ধ্যান শিক্ষা কর, লোক হাসাইয়া মার,
স্থানাস্থান না কর বিচারে॥
নহে গোপী যোগেশ্বর, তোমার পদকমল,
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ।
তোমার বাক্য পরিপাটী, তার মধ্যে কুটি-নাটি,
শুনি গোপীর বাঢ়ে আর রোষ॥
দেহ স্মৃতি নাহি যার, সংসার-কূপ কাঁহা তার,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ সমুদ্র জলে কাম তিমিঙ্গিলে গিলে,
গোপীগণে লহ তার পার॥ চৈ, চ, মধ্যলীলা ১৩।

ভাগবতে যোগমার্গ ও প্রেমমার্গ দুই আছে। যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ যোগমার্গের পরম গুরু। প্রধানা গোপী শ্রীমতী রাধিকা প্রেমমার্গের পরম গুরু। শ্রীকৃষ্ণকেও রাধিকার নিকট প্রেম শিক্ষা করিতে হইয়াছে।

কিন্তু এই দুর্লভ গোপীপ্রেম সহজে পাওয়া যায় না। সে প্রেম উদিত হইলে দেহস্মৃতি থাকে না বটে এবং প্রেমে নিমগ্ন ভক্ত সংসার-কূপেও পতিত হয় না সত্য; কিন্তু তাহার সাধন কি? যাঁহারা সংসারে অনুরক্ত, তাঁহাদের জন্য মহাপ্রভু নবধা ভক্তির ব্যবস্থা করেন। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন।

মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারেই এখনও অনেক গৃহস্থের ঘরে রাধাকৃষ্ণের সেবা আছে। কিন্তু মহাপ্রভু যে অর্চ্চন বা সেবার কথা বলিয়াছেন, সে সেবা এখন হয় কি না সন্দেহ। বেতন-ভোগী ব্রাহ্মণ দ্বারা সেবা নবধা ভক্তির অঙ্গ হইতে পারে না। যে অর্চ্চনায় ভক্ত বিগ্রহ-স্পর্শে আত্মহারা হইবেন, দর দর করিয়া তাঁহার নয়ন হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইবে, শরীর রোমাঞ্চিত হইবে, সেই অর্চ্চনাই প্রহ্লাদের অভিপ্রেত, মহাপ্রভুর অভিপ্রেত। ভক্ত যদি নিজে সেবা না করিল, তবে সে সেবা নিরর্থক! এ সেবা রাজসিক সেবা। এ সেবার অর্থ ধনীর পক্ষে স্বাদু প্রসাদ, দরিদ্রের পক্ষে গলগ্রহ। আজ কাল ব্রাহ্মণ-সমাজে যে সঙ্কীর্ণতার ঢেউ চলিতেছে, তাহাতে নানাপ্রকার সেবা-বিভ্রাটও ঘটিতেছে। এ সেবা নির্গুণ ভক্তির পথপ্রদর্শক নহে। নির্গুণ ভক্তি লইয়াই মহাপ্রভুর অবতারত্ব-গ্রহণ।

ভাগবত পুরাণাদিতে ভগবানের কথা শ্রবণ, ভগবানের নিত্য নাম সঙ্কীর্ত্তন, ভগবানকে নিত্য স্মরণ করা, ভগবৎ-সেবার পরিচর্য্যা, তদ্গতচিত্ত হইয়া ভগবানের পূজা, ভগবানের স্তোত্র-পাঠাদিরূপ বন্দনা, ভগবানে সর্ব্ব-কর্ম্মার্পণ এবং জীবদ্বারে ভগবানের সেবা করিয়া ভগবানের দাসত্ব, অবশেষে ভগবানের সহিত সখ্যভাব এবং ভগবান্‌কে দেহসমর্পণ, এই সকল সাধন সংসারে অনুরক্ত ব্যক্তিদের জন্য উক্ত হইয়াছে।

যখন তাঁহারা সংসার হইতে বিরক্ত হইবেন, তখন তাঁহাদের অন্তরঙ্গ সাধন ;—

গ্রাম্য কথা না কহিবে গ্রাম্য কথা না শুনিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী-মানদ কৃষ্ণ-নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥

মহাপ্রভু নির্দ্দিষ্ট ইহাই অন্তরঙ্গ-সাধন। মনে মনে রাধাকৃষ্ণ-সেবা করিতে

করিতে ভক্তের প্রবল প্রেমভাব আসিয়া উদিত হয়। তখন শ্রীমতী রাধিকা সেই ভক্তের উপর অনুগ্রহ করেন। সেই অনুগ্রহে নিত্য বৃন্দাবনে ভক্তের অধিকার-লাভ হয়।

এই প্রেমমার্গে ভক্ত আত্মহারা। যোগমার্গে ভক্ত প্রতি-কোষের পরিপূর্ত্তি ও বিশুদ্ধি লইয়া ব্যস্ত। প্রেমে ভক্ত আপনাকে ভগবান্‌সমুদ্রে ভাসাইয়া দেন। যোগে ভক্ত আত্মাকে কোষ-সকলের রাজা করিয়া মায়াধীশ আত্মাকে ঈশ্বরের সহকারী করেন। যোগী সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের প্রতি-অবান্তর-ভাগে, প্রতি-কার্য্যে, প্রতি-কেন্দ্রে, প্রতি-লোকে, ভগবানের সহকারী হয়েন। তাঁহারা সকলে ক্ষুদ্র ঈশ্বর। প্রেমিক ভক্ত ভগবৎ-প্রেমে নিত্য মগ্ন। তাঁহার কোনরূপ স্বতন্ত্রতা থাকে না। তিনি কেবল মাত্র ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির নিত্য পরিপোষক। আর তাঁহা দ্বারা ভগবান্ নিত্য ভক্ত-হৃদয়ে প্রেম ঢালেন। প্রেমময় ভক্ত প্রেম-মার্গে প্রেম বিতরণের নিত্য সহকারী।

তবে কি যোগী প্রেমলাভ করিতে পারেন না? যোগী কি তবে ঈশ্বর-প্রেমে বঞ্চিত? যোগী ও প্রেমীর ভগবৎসেবা সাধারণ লক্ষ্য। তাঁহাদের দু-জনের মধ্যে কেহই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না। নিজের বন্ধন মুক্তি শুনিলেই দু-জনে চমকিয়া উঠেন। অবশ্য আমি ভাগবত-মার্গে ভাগবত-পুরাণ-সঙ্গত যোগী ও প্রেমীর কথা বলিতেছি। যে যোগীকে শ্লেষ করিয়া উদ্ধব নিম্নলিখিত শ্লোক বলিয়াছিলেন, আমি সে যোগীর কথা বলিতেছি না।

বাতরশনা য ঋষয়ঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥
বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্ম্মবর্ত্মসু।
ত্বদ্বার্ত্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈ র্দুস্তরং তমঃ॥

এ যোগী—জ্ঞানী ও সন্ন্যাসী। এই সন্ন্যাসী যোগী, উদ্ধব ও গোপী—দু'য়েরই চক্ষুঃশূল। উদ্ধব বলেন, 'আমি কর্ম্মমার্গে সেবা করিয়া ভগবৎ প্রসঙ্গ করিব।' গোপীরা বলেন "গেহং জুষামপি নঃ'।

আমি যে যোগের কথা বলিতেছি সে যোগের শিক্ষা শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে দিয়াছিলেন, সে যোগের শিক্ষা তিনি গোপীদিগকে দিয়াছিলেন। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে প্রথম প্রেম-ভক্তির কথা বলিয়াছিলেন, পরে যোগের কথা বলিয়াছেন।

এই যোগে ও প্রেমে মেশামিশি আছে। মহাপ্রভু নিজ ভাব লইয়া সেই মেশামিশির রূপক বর্ণনা করিয়াছিলেন।

একদিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন।
কৃষ্ণ রাসলীলা করে দেখিলা স্বপন॥
দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইনু এই জ্ঞান হৈলা॥

গোবিন্দ মহাপ্রভুকে জাগরিত করিলেন। তিনি দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করিয়া জগন্নাথ দর্শনে গেলেন। জগন্নাথ দর্শন করিয়াও "স্বপ্নের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হইল মন।" তিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দনকেই দেখিতে লাগিলেন। এক উড়িয়া স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাইয়া, তাঁহার স্কন্ধে পদ দিয়া দর্শন করিতে লাগিল। গোবিন্দ ভৎর্সনা করাতে সেই স্ত্রী নীচে নামিল। স্ত্রীকে দেখিয়া প্রভুর বাহ্য হইল। তখন তিনি ব্রজেন্দ্রনন্দনকে না দেখিয়া, জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামকে দেখিতে লাগিলেন। তখন তিনি বিরহে উন্মত্ত হইলেন। রাত্রি হইলে তিনি স্বরূপ ও রামানন্দের নিকট মনের ভাব উদ্‌ঘাটিত করিতে লাগিলেন।

প্রাপ্ত প্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা
যযৌ বিষাদোজ্‌ঝিতদেহগেহঃ।

গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকো মে
বৃন্দাবনং স্বেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ ॥

কৃষ্ণরত্নকে প্রাপ্ত হইয়া আবার হারাইয়া, আমার আত্মা বিষাদে দেহরূপ গৃহত্যাগ করিয়া, যোগীর ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে এবং দশ ইন্দ্রিয়কে শিষ্য-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনে গিয়াছে।

প্রাপ্ত রত্ন হারাইয়া, তার গুণ স্মরিয়া,
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে হাহা হরি হরি,
ধৈর্য্য গেল হইল চপল ॥
শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী।
যার লোভে মোর মন, ছাড়িলেক বেদধর্ম্ম,
যোগী হঞা হইল ভিখারী ॥
দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি, মহাবাউল নাম ধরি,
শিষ্য লঞা করিনু গমন।
মোর দেহ স্বসদন, বিষয় ভোগ মহাধন,
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন ॥
শূন্য কুঞ্জমণ্ডপ কোণে, যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে,
তাহা রহে লঞা শিষ্যগণ।
কৃষ্ণ-আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ ॥
মন কৃষ্ণ-বিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী,
সে বিয়োগে দশদশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মন গেলা পলাইয়া,
শূন্য মোর শরীর আলয় ॥ চৈ, চ, অন্ত্য, ১৪।

এ গেল প্রেম হইতে যোগের আবির্ভাব। সেইরূপ আবার যোগ হইতে প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে।

যোগ ও প্রেম দু'য়েরই লক্ষ্য ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ। তখন যোগ প্রেমে পরিণত হইবে এবং প্রেম যোগে পরিণত হইবে, তাহার বিচিত্রতা কি? যখন তুমি ধ্যানে মগ্ন, তখন তুমি যোগী, যখন তুমি প্রেমে বিহ্বল, তখন তুমি প্রেমী। তথাপি যোগমার্গ ও ভক্তিমার্গ স্বতন্ত্র। যোগমার্গেও কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান আছে; ভক্তিমার্গেও কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান আছে। যোগে সেবাই অধিকতর লক্ষ্য। ভক্তিতে প্রেমই অধিকতর লক্ষ্য। যোগে মায়াবশ জীব মায়াধীশ হইবার জন্য সতত গুরু-উপদেশের অপেক্ষা রাখে। ভক্তিতে জীব গুরুর ইঙ্গিতমাত্রে ভগবানে গা ঢালিয়া দেয়। যোগী পায়ের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে চাহে। ভক্ত পায়ে না চলিয়া ভাসিয়া যাইতে চাহে।

চৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমভক্তিরই শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি চব্বিশ বৎসর গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন, এবং আবিষ্ট হইবার পর সঙ্কীর্ত্তন লইয়াই প্রথমে জীবকে প্রেমের অধিকারী করিয়াছিলেন। নবধা ভক্তির মধ্যে চৈতন্যদেব সঙ্কীর্ত্তনকেই মুখ্য সাধন বলিতেন।

সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর তিনি ছয় বৎসর কাল নানা স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তাহার পর আঠার বৎসর তিনি নীলাচলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

"তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইল নৃত্য গীত রঙ্গে॥
শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহলীলা প্রভুর অন্তর॥

নিরন্তর রাত্রিদিন বিরহ উন্মাদে।
হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিষাদে॥
শ্রীরাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
উদ্‌ঘূর্ণা প্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রিদিনে॥" চৈ, চ, মধ্য ১।

মহাপ্রভু যোগের শিক্ষা দেন নাই। তথাপি যোগমার্গ ভাগবত-সঙ্গত।

মানসিক সেবা ও সঙ্কীর্ত্তন।

মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহে গোপীভাব যোগের সাধন না হইলেও যোগের চরম। যেখানে দিবারাত্রি কৃষ্ণলালসা ও বিরহোন্মাদ, সেখানে বিষয়ের গন্ধও থাকিতে পারে না। চিত্ত-বৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ না হইলে এই অধি-রূঢ় মহাভাব অসম্ভব।

কিন্তু এ-গোপীভাব সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব নহে। এইজন্য মহা-প্রভু ভক্তের অন্তরঙ্গ সাধন জন্য রাধাকৃষ্ণের মানসিক সেবা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সর্ব্বদা সেই সেবায় মনকে ব্যাপৃত রাখা এক প্রকার যোগ। যতদিন প্রেমের অধিরূঢ় ভাব না হয়, ততদিন এই সেবা ভক্তের প্রধান অন্তরঙ্গ সাধন। প্রেমভক্তির মার্গে ইহাই যোগাভ্যাসের অনুকল্প। এই সাধন হইতে এককালে চিত্তবৃত্তির নিরোধ ও প্রেমের পরিপুষ্টি হয়।

মহাপ্রভুর শিক্ষা কিরূপ ফলপ্রদ, রঘুনাথ গোস্বামীর জীবন তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অতুল ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত হইয়াও রঘুনাথ মহাপ্রভুর শিক্ষাকেই একমাত্র সম্বল করিয়াছিলেন।

রূপ গোসাঞির সভায় করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আলায় তার মন॥
অশ্রু কম্প গদ্‌গদ্ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্ররোধ করে বাষ্প না পারে পড়িতে॥
পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যবে পড়ে শুনে।
প্রেমে বিহ্বল হয় তবে কিছুই না জানে।

গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা পূজাদিতে অষ্ট প্রহর যায়॥
বৈষ্ণবের নিন্দা কর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণভজন করে এই মাত্র জানে॥
মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম অনর্গল।
এই ত কহিল তাতে চৈতন্য কৃপাবল॥ চৈ, চ, অন্ত্য, ১৩।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বহিরঙ্গ-সাধনের মধ্যে সঙ্কীর্ত্তনকেই মহাপ্রভু মুখ্য সাধন বলিতেন।

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

চৈ, চ, অন্ত্য, ৪।

কেন মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছিলেন?

ভক্তেরা মুক্তি বা ঐশ্বর্য্য 'আকাঙ্ক্ষা করে না। তাহারা কেবল মাত্র সেবা আকাঙ্ক্ষা করে।

ভগবদ্গীতায় যজ্ঞের জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম করাই বিষ্ণুর সেবা। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ"। কিন্তু ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম্মে স্বধর্ম্ম আছে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আছে। পাঁচ হাজার বৎসরের অধিক হইল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কামভাবে স্বধর্ম্মাচরণ করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তখন স্বধর্ম্মেরই অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। তখন স্বর্গলাভ-কামনায় মনুষ্য সকাম ভাবে স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিত। শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম ভাবে স্বধর্ম্মের আচরণ করিতে বলিয়া, ভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফলাভিসন্ধান-বর্জ্জিত কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ভগবানে অর্পিত হইলে কর্ম্ম আর স্বধর্ম্মের

ধার ধারে না। তখন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের জ্ঞান ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসে। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র তাঁহাকেই আশ্রয় করিতে বলিয়াছিলেন। কাজে কিন্তু সে শিক্ষা ফলপ্রদ হয় নাই। পাঁচ হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল, লোক এখনও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের লৌহময় নিগড়ে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর আবদ্ধ। গীতার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ভেদ-মূলক নহে। সেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ভিত্তিতে অভেদ। সে ধর্ম্ম বন্ধনের জন্য নহে, মুক্তির জন্য। কিন্তু লোকে যাহাকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বলে, তাহা সম্পূর্ণ ভেদমূলক। সেই ধর্ম্মে মস্ত মস্ত অভিমানী পণ্ডিত, বড় বড় গর্ব্বিত ধনী, এবং বিবাহ কালে প্রজ্বলিত-তেজঃসম্পন্ন, তেজস্বী কুলীন। সেই ধর্ম্মে এখনও নানা জরাসন্ধ, এখনও নানা দুর্য্যোধন। সেই ধর্ম্মে স্মৃতির অপলাপ ও ব্যবস্থার বিতণ্ডা। সেই ধর্ম্মে অর্থের প্রভূত সম্মান ও দারিদ্র্যের বিষম নির্য্যাতন। সেই ধর্ম্মে মনুষ্যের দৃষ্টিতে আহার অশুদ্ধ হইয়া যায়। সেই ধর্ম্মে ঈশ্বরের জীবন্ত প্রতিমা মনুষ্য, স্বদেশ মধ্যে নীচজাতি হইলে, তাহার স্পর্শে কলুষিত হইতে হয়। কিন্তু ম্লেচ্ছ বিদেশীর পদাঘাত আদরে বহন করিলে কোন হানি হয় না। সে ধর্ম্মে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বেদের উচ্চারণ করিলে ও বেদ পাঠ করিলে মহা ধর্ম্ম-বিভ্রাট হয় এবং বিদেশী ম্লেচ্ছ সেই কাজ করিলে ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি হয়। সে ধর্ম্মে মিথ্যাকথন, প্রবঞ্চনা, পরস্বাপহরণ, নির্দ্দয়তা, হৃদয়-শূন্যতা বিশেষ দোষের কথা নহে; কিন্তু যবনের সহিত আহার করিলেই মনুষ্য ধর্ম্ম হইতে পতিত হয়। ভেদ লইয়াই এ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। ভেদ-জ্ঞান বর্দ্ধিত ও চির-প্রচলিত করিবার জন্যই এই সকাম ধর্ম্মে সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের সঙ্কীর্ণ উদ্যম, স্বার্থপরতার যথেচ্ছ বিলাস।

তাই ভাগবত পুরাণ স্বধর্ম্মের উপর খড়্গহস্ত। তাই নারদ স্বধর্ম্মের কথা ত্যাগ করিয়া ভাগবত ধর্ম্মের উপদেশ করিবার জন্য ব্যাসকে আদেশ করেন। নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন,—

বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ॥ ভা, পু, ৭-১১-৩২

'যাহার যেমন স্বাভাবিক বৃত্তি, সেই বৃত্তি অনুসারে যে কর্ম্ম করে, তাহাকেই স্বকর্ম্মকৃৎ বলে। কিন্তু এই স্বভাবজ কর্ম্মও ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করিয়া নির্গুণতা লাভ করিবে।' স্বধর্ম্ম, স্বধর্ম্ম করিয়া মূর্খের ন্যায় কলহ করিবে না। বিচারশীল হইয়া এই সগুণ ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করিয়া নির্গুণ ধর্ম্মের অধিকারী হইতে চেষ্টা করিবে।

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসোবর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দিশেৎ॥

ভা, পু, ৭-১১-৩৫

'পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এইটী ব্রাহ্মণের লক্ষণ, এইটী ক্ষত্রিয়ের, এইটী বৈশ্যের, এইটী শূদ্রের। যদি কেহ জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য কি শূদ্র না হয়, কিন্তু কোন বিশেষ বর্ণের লক্ষণ তাহাতে দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাকে সেই বর্ণের লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।' এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী বলেন, "ব্রাহ্মণাদিব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতি মাত্রাৎ"। ব্রাহ্মণাদির ব্যবহারই মুখ্য। কেবল জন্ম দ্বারাই ব্রাহ্মণাদি হয় না। "তদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ নতু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ।" যদি অন্য বর্ণে অন্য বর্ণের লক্ষণ দেখা যায়, তাহা হইলে লক্ষণ অনুসারে বর্ণের নির্দ্দেশ করিবে, জন্ম অনুসারে জাতির নির্দ্দেশ করিবে না। ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম হইলেই ব্রাহ্মণ হয় না, শূদ্র কুলে জন্ম হইলেই শূদ্র হয় না।

গীতার স্বধর্ম্মাচরণ ও ভাগবতের স্বধর্ম্মাচরণ এক নহে। ভাগবত অনুসারে, যাহার যেরূপ প্রকৃতি-গত ভাব, সেই ভাব অনুযায়ী সে কর্ম্ম করিবে। কিন্তু সে কর্ম্মে সে চিরস্থায়ী থাকিবে না। স্বধর্ম্মাচরণ করিতে

আরম্ভ করিয়া পরে স্বধর্ম্ম ত্যাগই লক্ষ্য রাখিবে। নির্গুণ ভক্তিই জীবের পরম সাধন। ইহা নানা জন্মের কথা নহে। এক জন্মেরই কথা।

মহাপ্রভু সনাতনকে বলিয়াছিলেন—

নীচজাতি নহে ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥ চৈ, চ, অন্ত্য, ৪
আর এক স্বভাব গৌরের শুন ভক্তগণ।
ঐশ্বর্য্য স্বভাব গূঢ় করে প্রকটন॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে সর্ব্বনাশ।
নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ॥
ভক্তি তত্ত্ব প্রেম কহে রায়ে করি বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র সহ হয় শ্রোতা॥
হরিদাস দ্বারা নাম মাহাত্ম্য প্রকাশ।
সনাতন দ্বারা ভক্তি সিদ্ধান্ত বিলাস॥
শ্রীরূপ দ্বারা ব্রজের রস প্রেম লীলা।
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা॥ চৈ, চ, অন্ত্য, ৫

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব বাড়াইয়া ও শূদ্রের শূদ্রত্ব বাড়াইয়া জীবের সেবা করা চৈতন্যদেবের অভিপ্রেত নহে। তবে জীবের সেবা, ভগবানের সেবা কিরূপে করা যাইতে পারে? ক্ষুধিতকে অন্নদান, ব্যাধিগ্রস্তকে ঔষধদান, পার্থিব কর্ম্মের নিরাকরণ জন্য সাধ্য মত চেষ্টা সকলেই করিবেন। "পরোপকারায় সতাং হি জীবনম্।" কিন্তু উপকারের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার

জীবকে ভগবৎপ্রমুখীন করা, স্থাবর জঙ্গমে সত্ত্বগুণ প্রবর্দ্ধিত করা, অধিকারী-বিশেষে ভগবৎপ্রেম অর্পণ করা। সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা এই সেবা-কার্য্য সম্যক্ রূপে সাধিত হয়। এইজন্যই অকৃষ্ণ কৃষ্ণের আদেশ অনুসারে কলিকালে পণ্ডিতগণ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায় যজ্ঞদ্বারা ভগবানের সেবা করিবেন।

চৈতন্যদেব ভঙ্গী করিয়া যবনশ্রেষ্ঠ সাধুশ্রেষ্ঠ হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম।
ইহা সবার কি প্রকারে হইবে মোচন॥
হরিদাস কহে "প্রভু সে কৃপা তোমার।
স্থাবর জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার॥
তুমি যে করিয়াছ উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তন।
স্থাবর জঙ্গমের সেই হয়ত শ্রবণ॥

নবধা ভক্তিতে শ্রবণ ও কীর্ত্তনের কথা বলা হয়। সঙ্কীর্ত্তন একাধারে শ্রবণ ও কীর্ত্তন। সঙ্কীর্ত্তনে নামের শ্রবণ হয় ও নামের কীর্ত্তন হয়।

শুনিয়া জঙ্গমের হয় সংসার ক্ষয়।
স্থাবরের শব্দ লাগে প্রতিধ্বনি হয়॥
প্রতিধ্বনি নহে সেই করয়ে কীর্ত্তন।
তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন॥
সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
শুনিয়া প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম॥ চৈ, চ, অন্ত্য, ৩

সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া চেতন জীব ভগবৎপ্রেমের অধিকারী হয়। কীর্ত্তনের ধ্বনি অচেতন স্থাবরকেও এরূপ ভাবে আক্রমণ করে যে, তাহাতে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হয়। যেমন শ্রীকৃষ্ণের মধুর বংশীনাদে বৃন্দাবনের প্রতি-ভূমি, প্রতি-বৃক্ষ, প্রতি-লতা এক মধুর সাত্ত্বিক ভাব ধারণ করিয়াছিল, চৈতন্যদেবের

উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে সেইরূপ বঙ্গভূমি পবিত্রতার এক অপরূপ আধার হইয়াছে। এই সঙ্কীর্ত্তন-সিক্ত পবিত্র ভূমিতে কত কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর ও ভাববীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং অবশেষে চৈতন্যের কৃপায় কি জানি কি মহাভাব এই বিচিত্র ভূমিতে বিকশিত হইয়া জগৎ আমোদিত করিবে এবং বঙ্গের নাম জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করিবে।

এই সঙ্কীর্ত্তনে চৈতন্যের ভক্তগণ চৈতন্যের সহিত যোগ দিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে তাঁহারা অপূর্ব্ব তেজ ধারণ করিয়াছিলেন।

রাজা কহে দেখি আমার হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবে ঐছে তেজ নাহি দেখি আর॥
কোটি সূর্য্য সম সবার উজ্জ্বল বরণ।
কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্ত্তন॥
ঐছে প্রেম ঐছে নৃত্য ঐছে হরিধ্বনি।
কাঁহা নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি॥
ভট্টাচার্য্য কহে তোমার মধুর বচন।
চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেম-সঙ্কীর্ত্তন॥
অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম্ম প্রচারণ।
কলিকালের ধর্ম্ম কৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥

বঙ্গের কি সৌভাগ্য যে, চৈতন্যদেব এই সুবর্ণ ভূমিতে নিজের সুবর্ণ বর্ণ মিশ্রিত করিয়াছেন! বঙ্গের কি গৌরব যে, দেবের দুর্ল্লভ গোপীর প্রেম, ঋষিদিগের সহস্র জন্মের সাধনার ধন গোপী-প্রেম,—যে প্রেম স্বর্গে নাই, ব্রহ্মলোকে নাই,—যে প্রেম বেদের বিধাতা জানেন না,—যে দুর্ল্লভ প্রেম লাভ করিবার জন্য লক্ষ্মীঠাকুরাণী কাঙ্গালিনী,—মহাপ্রভু সেই অলৌকিক, অপার্থিব প্রেম বঙ্গের ঘরে ঘরে বিলাইয়া গিয়াছেন!

আজ আমরা কি দুর্ভাগ্য, সেই চৈতন্যদেবের চরণ-দর্শনে বঞ্চিত। আবার

কি বঙ্গের সেই সৌভাগ্য হইবে? আবার কি ভারতে প্রেমগুরু প্রেম-নটবরের আবির্ভাব হইবে? আবার কি প্রেমের অমৃত-লহরী শত সহস্র ধারে প্রবাহিত হইয়া জগৎ প্লাবিত করিবে? আবার কি চৈতন্যদেব আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন?

আরো দুই জন্ম এই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥ চৈ, ভা, মধ্য ২৬

শচীমাতাকে তিনি যে এই ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছিলেন, তাহা কি তিনি পূর্ণ করিবেন?

সকল বৈষ্ণবের চরণধূলি মস্তকে করিয়া আজ "শ্রীশ্রীচৈতন্য কথা" সমাপ্ত করিলাম। সকল বৈষ্ণবের চরণে শতকোটি প্রণাম।

সম্পূর্ণ